রসেবশে

প্রথম পর্ব

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

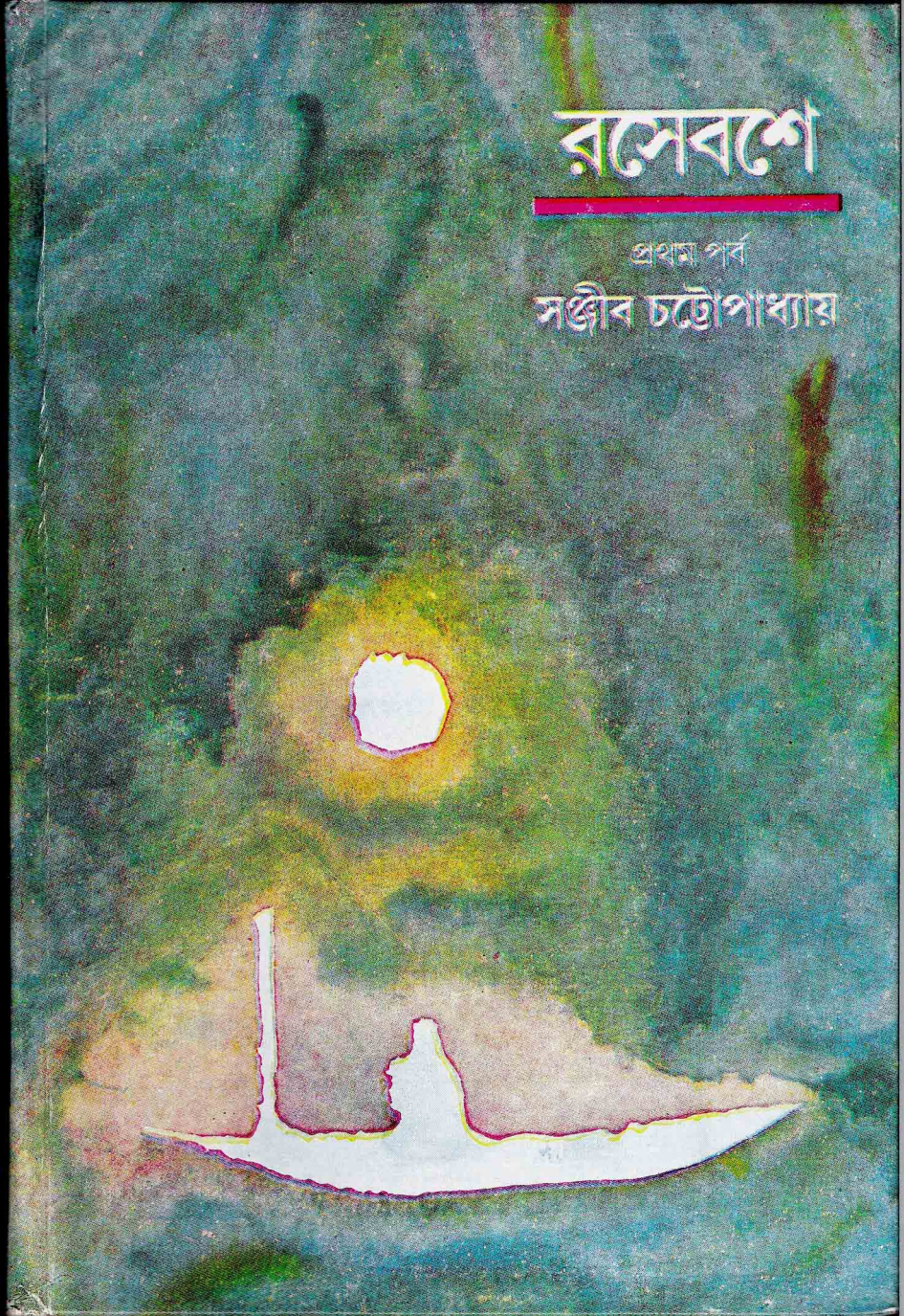

এই লেখকের অন্যান্য বই

অগ্নিসংকেত
অচেনা আকাশ
একে একে
কপাল
কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই
কামিনী কাঞ্চন
ক্যানসার
ঝাড়ফুঁক
তুমি আর আমি
তৃতীয় ব্যক্তি
দুটি চেয়ার
দুটি দরজা
পায়রা
পার্বতী
পেয়ালা পিরিচ
ফিরে ফিরে আসি
বসবাস
ভয়
ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ
মুখোমুখি
মুখোশের চোখে জল
রাখিস মা রসেবশে
লোটাকম্বল (১ম-২য় পর্ব)
শঙ্খচিল
শাখা প্রশাখা
শ্বেতপাথরের টেবিল
সাধের ময়না
সোফা কাম বেড
হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ

pathagar.net

পোষ মানাতে জানলেই জীবন পরম সুখের। পশুকে পোষ মানাবার কথা বলছি না। আমরা তো সার্কাসের রিংমাস্টার নই যে রোজ বিকেলে ডোরাকাটা প্যান্ট আর মড়ার মাথার খুলি আঁকা গেঞ্জি পরে আগুনের গোল রিংয়ের মধ্যে দিয়ে ধুমসো একটা বাঘকে এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ করাতে হবে। আমরা সংসারে থাকি, পোষ মানাতে হবে মানুষকে।

প্রথমে পরিবার, তারপর পরিবারের বাইরের মানুষ। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম।

আগেকার দিনের কর্তাদের বেশ একটা ভারিক্কি চাল ছিল। দেখলেই বোঝা যেত, ইনি কর্তাব্যক্তি মানুষ, স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে সংসার করেন। একমেবা দ্বিতীয়মের সন্ধান পেয়ে গেছেন। উড়ু উড়ু, প্রেমিক প্রেমিক ভাব আর নেই। যা পেয়েছি প্রথম দিনে, তাই যেন পাই শেষে। যার মুখ দেখে এতকাল ঘুম ভাঙছে, সেই মুখটিই যেন খাবি খাবার সময় ঝাপসা ঝুলে থাকে, মৃত্যুপথযাত্রীর চোখে। চললুম ডার্লিং, হুলো রইল, রোজগার করে খাওয়াবে। একটি ভাল ছেলে দেখে বুঁচীটার বিয়ে দিও। আহা সমুখে শান্তির পারাবার।

কর্তাদের মেকআপ, সাজপোশাকও বিশেষ ধরনের ছিল। তখনকার চুলের একটা কাট ছিল, যাকে বলা হত কম্যাণ্ডার কাট। ক্লিপ নামক একটি বস্তু ছিল। সেই চিমটিকাটা যন্ত্র 'লন মোয়ারের' মত, ঘাড়ের পেছন দিক থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত, মাথার দক্ষিণ গোলার্ধের শাঁস বের করে ছেড়ে দিত। ঝুলপির বালাই রাখা হত না। নরসুন্দরের জিম্মায় মাথাটি একবার ফেলে দিতে পারলে, তিন মাসের মত ঠাণ্ডা। এখনকার মত সেলুনের বেঞ্চিতে হুতো দিয়ে পড়ে থাকতে হত না। প্রেমিকের দলে অপ্রেমিক বয়স্ক। 'কেষ্টকাটে' সময়ও বেশি লাগে। নাইনটি পার্সেন্ট কাঁচির বাদ্য, টেন পার্সেন্ট কর্তন। পমেরেরিয়ানের কায়দায় ড্রেসিং এক একজনকে নামাতে এক ঘণ্টা। 'নিউ ফ্যাশানের' কারিগর হেসে বলবেন, একটু রাতের দিকে এলে সুবিধে হয় জ্যাঠামশাই। কত রাত ? বারোটা

নাগাদ আসুন। বিকেলের পর থেকে যুবকরা একটু অন্যভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময়টায়, একটু ফাঁকায় ফাঁকায়, 'ভিনটেজ কাট' জমে ভাল। এখন তো চুলকাটার পর চানের রেওয়াজ উঠে গেছে। পাউডার মেরে বউদিকে বলবেন ফুলঝাড়ু দিয়ে ঝেঁটিয়ে দিতে। এক কাজে দু কাজই হবে।

তখনকার কালের কর্তাদের গোঁফও ছিল সাদাসিধে। ছোট কাঁচিতেই কায়দা করা যেত। এখনকার মত ভার্নিয়ার, ক্যালিপার ফেলার দরকার হত না। এখন এক সুতো এদিকওদিক হওয়া মানেই লাশ পড়ে যাওয়া। তখনকার গোঁফ হত ট্রাঙ্করোডের মত। এখনকার গোঁফ, অভিসারিণীর পায়ে চলা পথ। আলতো, মৃদু, হাইলাইটে ধরা পড়ে। ডিমলাইটে বড় ড্রিমি। ওই গোঁফে মুচকি হাসি আর তিরছি নজর বড় খোলে। খোঁচা খোঁচা চওড়া গোঁফের একটা সুবিধে ছিল। ভাবসম্প্রসারণ সহজেই ধরা যেত। ন্যাজের মত গোঁফও ফোলে, খাড়াখাড়া হয়। ওই চুল, ওই গোঁফ, পাটকরা ধুতি লুঙ্গির মত পরা, হাফ হাতা জালি গেঞ্জি, সব মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ কর্তা সংসারের ওপর চেপে বসে আছেন, সীসের পেঁপারওয়েটের মত। এঁদের মেজাজ যেমন ছিল, দায়িত্ববোধও ছিল। নাচাতেন কিন্তু ফেলে দিতেন না। সংসারে ঘুরে বেড়াতেন বাংলার বাঘের মত। আদুরে কুকুরের মত নয়। যেই গৃহপ্রবেশ করলেন, সবাই চুপ, সংসার ফিউজ। বড় ছেলে সিনেমার গান ধরেছিল, হৃদয়ে হৃদয় রাখি, নয়নে নয়ন ধরি, কবরীতে···বাপস্, বাবা। তি, তস, অস্তি, সি, থস, থ। মি, বস, মস।

গিন্নি সবে একটু প্রাণখুলে আইবুড়ো বেলার খিলখিলে হাসি হাসতে চেয়েছিলেন, বলতে লাগলেন ফুলি ডেকচিটা নিয়ে আয়।

এইসব ভারিজাতের কর্তারা, ওজন, ব্যক্তিত্ব আর চরিত্র দিয়ে পোষ মানাতেন। এর উল্টোটা হলেই কর্তার জাত যেত। লোকে বলত মেনিমুখো। জাত হুলো না হলে সংসার করা যায় না। মাও না করলে ম্যাও সামলান যায় না।

মাঝেমধ্যে নিয়ম করে রেগে যেতেন। বশ মানানর জন্যে এই দক্ষযজ্ঞের খুব প্রয়োজন হত। ঝুলঝাড়ার মত পরিবার ঝাড়া। কর্তা রেগে গিয়ে বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ছেন। মহাভারতের মত রাগেরও পর্ব আছে। প্রথম পর্বে আস্ফালন। বাঘের পটাস পটাস ন্যাজ নাড়ার মত। তারপর অব্যক্ত ওঁকার ধ্বনি। দাঁতে দাঁত চেপে শব্দ নির্গত করা। দ্বিতীয় পর্বে হুম্বিতম্বি। এপাশ থেকে ওপাশ পদচারণা। পায়ের কাছে কিছু থাকলে মূল্য বুঝে মোলায়েম লাথি। সধারণত গেলাস, পাপোস অথবা পাদুকা থাকাই স্বাভাবিক। পাদুকা থাকলে জোরে নিক্ষেপ এবং সেটি গিয়ে পড়বে খোকার খালি দোলনায়, কিংবা স্ত্রীর কোলে। এরপর কুরুক্ষেত্র পর্ব। কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্র নির্বাচনে কর্তার হিসেবে ভুল হত না।

BanglaBook.org

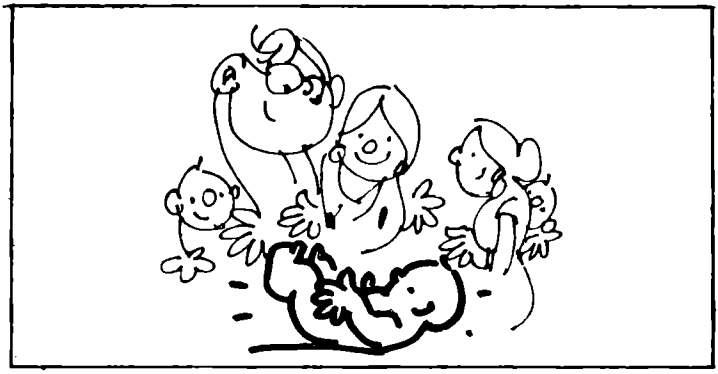

রান্নাঘর কিংবা ভাঁড়ার ঘরই সবচেয়ে ভাল জায়গা। ঘায়েল যোগ্য অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ঠাসা। রংচটা মশলার কৌটো, ডালের কৌটো, কানা ভাঙা কাপ ডিশ, হাতা, খুন্তি, জলের কুঁজো। ভাল ভাল সব ছোঁড়ার জিনিস। হোমিওপ্যাথিকের মত ডোজ আর একটু চড়াতে চাইলে উনুনে মারো এক লাথি। ঘটোৎকচ বধ করে শান্তিপর্বের শুরু। স্ত্রী সোহাগ করে বলবেন, আজকাল তুমি বড় রেগে যাও। একটুতেই অত রাগ ভাল নয়। তখন কর্তা ছাড়বেন শেষ হুঙ্কার—রাগবোও না। তোমাদের সঙ্গে সংসার কোনও ভদ্দরলোকে করতে পারে!

একটি রাগের কথা বলে প্রসঙ্গে ইতি টানি। রাত দশটা নাগাদ বাঘের ডাক শুনে চমকে উঠলুম। পাড়ায় সার্কাস এসেছিল, বুড়ো বাঘটাকে ফেলে রেখে চলে গেল নাকি! জানা গেল বাঘ নয়, গোপালবাবুর রাগের গর্জন। প্রায় মাঝরাত অবদি তিনি গজরালেন। ভোরবেলা শুরু হল অ্যাকসান। সামনের মাঠে প্রথমে এসে পড়ল চায়ের কাপ, তারপর এলো ডিশ, এলো খুন্তি, হাতা, থালা, ঘটি, বাটি। দুম করে এসে পড়ল একটা বেড়াল। বাড়ির প্রায় সব জিনিসই মাঠে চলে এল। শেষ উড়ে এল জ্বলন্ত তোলা উনুন। রাস্তায় লোক জমে গেছে, তাঁরা হাততালি দিলেন। সব শেষে টালির চালের একটা অংশ উড়ে গেল। সেই রাতেই আবার অন্য দৃশ্য। চাঁদিনী রাত, গোপালবাবু চালে উঠে হামা দিচ্ছেন। মই বেয়ে উঠেছেন স্ত্রী, হাতে লণ্ঠন। স্ত্রীর সাহায্যে স্বামী টালি মেরামত করছেন। গান শোনা যাচ্ছে, নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—আমাকে রসেবশে রাখিস মা।

ডুমুরভাজা

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল বলে শুরু করা যাক। হায়রে কবে কেটে গেছে ডাকাবুকো কর্তাদের কাল। এখন সব চিকেন হার্টেড। মুরগীসদৃশ ক্ষুদ্র হৃদয়ের অধিকারী এক ধরনের বসন্ত-বাতাস মার্কা মানুষ সংসারটাকে এমন স্যাকরার ঠুকঠাক জাতীয় ব্যাপার করে তুলেছেন, যাকে বলা চলে ক্রনিক সংসার ব্যাধি। সারেও না সরেও না। আজীবন ঘষটে যাও। তখনকার কালে হয় রমরম করে চলত, না হয় চুরমার হয়ে যেত ? এখনকার মত এমন দুমড়ে মুচড়ে, অষ্টাবক্র মুনির মত হয়ে থাকত না।

এক কর্তার কাহিনী শোনাই। যৌথ পরিবার চালাতেন সার্কাসের কায়দায়। সার্কাসের রিংমাস্টার কি করেন ! বাঘিনীকে প্রথমে বলেন, দুপায়ে টুলে উঠে দাঁড়াও। দাঁড়াল ভাল, ফ্যাঁস করলেই ব্যাটারি চার্জ। আমার দেখা এই কর্তারও সেই কায়দা ছিল ? আমার তালে তাল দাও, আমাকে মেজাজে রাখ, তোমাদের আমি ভোগে রাখব। অনেকটা আমাকে রক্ত দাও, তোমাদের আমি স্বাধীনতা দোব গোছের সৎ ও সাহসী প্রস্তাব।

বাঘের দাঁত পড়ে গেলে, জঙ্গলের দুর্বল পশুরা ভাবে, মামার আর কি আছে, সামনে গিয়ে একটু নর্তনকুর্দন করে আসি। বাঘ মিটি মিটি দেখে, তারপর একদিন ফোকলা দাঁতেই সবচেয়ে কাছেরটির ঘাড় কামড়ে ধরে। তখন শিক্ষা হয়, বুড়ো বাঘও বাঘ।

তখনকার দিনে মানুষের ছেলেমেয়েতে এখনকার মত লজ্জা ছিল না। এখন যেমন বিয়ের বছর না ঘুরতেই কেউ পিতা হলে, কেমন যেন অপরাধীর মত মুখ করে বলতে থাকেন, কি করব হয়ে গেল। যেন পেটরোগা মানুষ—কি করব করে ফেলেছি ! একাধিক হলে, পাড়া ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথা ভাবেন। ছি ছি, লোকে বড় অসংযমী ভাববে, দায়দায়িত্বহীন, দেশ-শত্রু ভাববে। তখনকার কালে, ষাট বছরে পিতা হলে, বাড়ির লাল রকে, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে, হাতের বাইসেপ, ট্রাইসেপ দেখাতে দেখাতে, গর্ব ভরে বলতেন—হ্যা হ্যা, এখনও ক্ষমতা রাখিরে ব্যাটা ? সব যেন ওনাসিসের বংশধর। সে এক ঘটনা আছে, একটু কেচ্ছার মত, পরে বলব। আগে এটা সেরে নি।

এই কর্তার অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। পুরুষের দিকে আড়ে আড়ে তাকাবার আগেই মেয়েদের পার করে দিয়েছিলেন। ছেলেরা টিনের চালে ঢিল ছোঁড়ার আগেই বউমাদের আঁচলে বেঁধে দিয়েছিলেন। নাও, ন্যাজ নাড়তে হয়, তো যে যার ঘরে বসে নাড়।

বুড়ো আর বুড়ি চকমেলান বাড়ির দোতলায় থাকতেন, মনের আনন্দে। বকম

pathagar.net

বকম করতেন। ছ্যাঁচা পান খেতেন, পাগলে পাগলে। মুড়ি খেতেন গুঁড়ো করে ঝোলা গুড় মেখে। বলে রাখি, তখনকার কর্তাদের ডায়াবিটিস ছিল না, ব্লাডসুগার ছিল না, প্রেসার ছিল না, এনলার্জড কিম্বা কার্ডিয়াক হার্ট ছিল না। খাজা কাঁঠাল খেতে পারতেন না, রসখাজা চলত। বার্ধক্যে একটা জিনিসই বাড়ত, সেটা রাগ। ছেলেমানুষের মত কথায় কথায় রাগ। বুড়োতে বুড়িতে সারাদিনে হাজারবার ঝটপটি হচ্ছে, আবার ভাব হচ্ছে।

কত্তা বললেন—তু তুমি চুপ কর। কিত্যু জান না।

দাঁত না থাকায় সমস্ত কথাতেই উচ্চারণের বেশ একটা মজা আসত।

বুড়ি বললেন—তুমি সব জান।

কত্তা বললেন—পাঁঠী।

বুড়ি বললেন—তুমি তা হলে উল্টোটা।

ব্যাস্ আড়ি হয়ে গেল। নিকেল ডাঁটির গোল চশমা পরে কত্তা ভাগবত খুলে বসলেন। ঘণ্টাখানেক পরে বুড়ি এলেন। ডিশে দুটি রসমুণ্ডি। কি খাবে নাকি ?

নোয়াঃ।

খুব ভাল, মধু ময়রার দোকানের।

নোয়াঃ।

একটা খেলুম। এখনো মুখে লেগে আছে।

নোয়াঃ।

উঁ, বাবুর রাগ হয়েছে। রাতে রাবড়ী খাওয়াব। নাও, খুব হয়েছে। চোখ বুজিয়ে হাঁ করো, মুখে ফেলে দি।

ভাব হয়ে গেল।

সেই কত্তা একদিন খেপলেন। একেবারে সেই যৌবনের রাগ! বড় ডুমুরভাজা খাবার সাধ হয়েছিল। প্রথমে বড় বউকে বললেন। তিনি ভুলে মেরে দিলেন। দোষ নেই, তাঁর আষ্টেপৃষ্ঠে ছেলেমেয়ে। পরের দিন মেজকে বললেন। তিনি স্বামীর সোহাগে শ্বশুরের কথা ভুলে গেলেন। তৃতীয় দিনে সেজো। সেজোর রাগের পর্ব চলেছে। তিনি নিজেই তিনদিন অনশনে। চিঁচি করছেন।

চতুর্থ দিনে কত্তা পাতে বসেই লাফিয়ে উঠলেন—তবে, রে শালা!

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে, জয়েণ্ট ফ্যামিলির দিকে তাক করে নিচের উঠনের দিকে ছুঁড়তে লাগলেন—প্রথমেই একটা বালতি পড়ল—জয়েণ্ট ফ্যামিলির ডুমুরভাজা।

নেমে এল গাড়ু—জয়েণ্ট ফ্যামিলি ডুমুরভাজা।

নেমে এল কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি—জয়েণ্ট ফ্যামিলি ডুমুরভাজা।

নেশায় পেয়ে গেল। দোতলার সব জিনিস নিচের উঠনে সঙ্গে স্লোগান।

শেষে সব জিনিস যখন ফুরিয়ে গেল, তখন হাঁকলেন, জয়েণ্ট ফ্যামিলি ডুমুরভাজা, এবার আমি।

বড় ছেলে কপ করে চেপে ধরলেন। বৃদ্ধ ঝুলতে লাগলেন, দুলতে লাগলেন।

দর্শকদের তখন, হাততালি দেবার ধুম পড়ে গেল। বুড়ি ছুটলেন বাগানে। সরাদিন ধরে ডুমুর তুললেন পুটুস পুটুস করে।

সরে শোও

গল্পে শোনা।

সেকালের এক কর্তার, বিছানায় এঁকে বেঁকে শোয়ার অভ্যাস ছিল। যখন শুলেন তখন বেশ সভ্যভব্য। চিৎ। পরিপাটি বালিশে মাথা। দুটি হাত বুকের দুপাশ বেয়ে উঠে বুকের মাঝখানে আঙুলে আঙুল নিয়ে ভগবৎ চিন্তায় ব্যস্ত তখনকার কালের নিয়মই ছিল, সারাদিন যা পার অপকর্ম করে নাও। শোবার সময় মন তোমার স্থির করতেই হবে। ইস্টদেবীকে চোখের সামনে রেখে, নাম করতে করতে নিদ্রার কোলে ঢুলে পড়। হাই উঠলে হাঁ করা মুখের সামনে ঠাস্ ঠাস্ করে তুড়ি বাজাও।

এই তুড়ি বাজানর একটা বৈজ্ঞানিক, শব্দটা মনে হয় ঠিক হল না, ব্যবহারিক দিক আছে। তখনকার মানুষ যা করতেন, সবই করতেন বেশ প্রাণ খুলে, মেজাজ দিয়ে। যেমন হাঁচি। বার-বাড়িতে কর্তা অ্যায়সা জোরে হাঁচলেন, প্যাঁট করে কাপড়ের কষি ফেঁসে গেল। গিন্নি কোলের বাচ্চাকে দাওয়ার রোদ থেকে খাটে তুলে শোয়াতে যাচ্ছিলেন, হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। বড় বউ সাঁড়াশি দিয়ে ধরে উনুন থেকে এক ডেকচি দুধ নামাচ্ছিলেন, হাত আলগা হয়ে পড়ে গেল। কর্তার কর্তা গেলাসের জলে ফোঁটা ফোঁটা করে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ঢালছিলেন, ধ্যার ধ্যার করে সবটাই জলে নেমে এল। গোয়ালে গরুর দুধ দোয়া হচ্ছিল, বাঁট ছুঁড়ে, বালতি উল্টে, দড়ি ছিঁড়ে, খোঁটা উপড়ে, গরু দৌড়তে লাগল মাঠ ভেঙে। ছাদের বোমায় এক ঝাঁক পায়রা বসেছিল। ফড় ফড় করে উড়ে গেল আকাশের দিকে। সেখানে লাট খাচ্ছে, ডিগবাজি মারছে। রকের পাশে বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল কুকুর। লাফিয়ে উঠে দু হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাজ গুটিয়ে। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। কর্তা আবার হাঁচবেন, তারই প্রস্তুতি চলছে। মুখ ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে। চাঁদমারীর কামানের মত। মেজর হাঁচি শুনে বড় বললেন, নাক নয় ত, গাদা বন্দুক। ফোর্টে যেন তোপ দাগছে! হাঁচির আবার

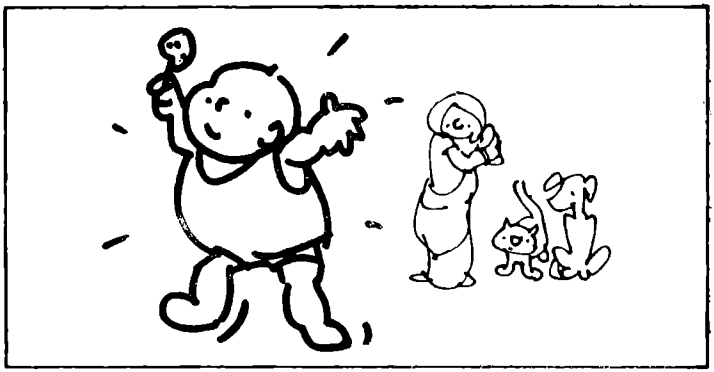

টেলপিস থাকত। শেষের দিকটা এক একজন, এক এক ভাবে খেলাতেন। অন্যে সেটা উপভোগ করতেন। এখনকার কালে এ সবই হল গ্রাম্য-অসভ্যতা। একালের শিক্ষিত শহুরে অসভ্যতা আবার অন্যরকম। সে কথা পরে বলা যাবে।

হাঁচির মত হাইও ছিল মারাত্মক। হাওয়ার টানে হাঁ খুলছে। যাকে বলে মুখ-ব্যাদন। যেন তিমির হাঁ। হাঁচি যেমন ঝটাস করে হয়ে যায়, হাই তা হয় না। দীর্ঘমেয়াদী প্রলম্বিত ব্যাপার। ওই জন্যে• বলে, হাই উঠছে। উঠবে এবং নামবে। তখনকার কালে মশামাছির উপদ্রব এখনকার কালের মত না থাকলেও, ছিল। একালে অবশ্য খুবই বেড়েছে। বৃদ্ধি মানেই প্রগতি। একটা কিছু অন্তত বাড়ুক। মশা বাড়ুক, মাছি বাড়ুক, ডাকাত বাড়ুক, ডাকাতি বাড়ুক, শান্তি না বাড়ুক অশান্তি বাড়ুক। ওই হাঁ মুখে যাতে মশামাছি না ঢোকে সেই জন্যেই সিংহ দরজার প্রবেশ পথে টুসকি মারার বিধান চালু ছিল।

এই হাই প্রসঙ্গটাকে আর একটু টানা যাক। মনেই যখন পড়েছে তখন যতটা পারা যায় বলে দেওয়াই ভাল। হাই হল শরীরের এক ধরনের আক্ষেপ। হাই তোলার নানারকম শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গী জীবজগতে চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। যেমন কান্না। শব্দ হবেই। তবে চেষ্টা করলে রেগুলেট করা যায়। শিশু কেঁদে বাড়ি মাথায় করে ঠিকই, তবে যত বয়েস বাড়ে কান্নার তাড়স, তড়কা, আক্ষেপ বিক্ষেপ কমতে থাকে। বয়েসে মানুষ শুকিয়ে যায়। পড়ে থাকে সামান্য ফোঁপানি, দু ফোঁটা চোখের জল। বুড়োমদ্দ কখনও শিশুর আবেগে ঠ্যাং ছড়িয়ে, মাথা দুলিয়ে হাঁউ হাঁউ করে কাঁদবে না। কাঁদতে পারবে না। মহিলারা (অবশ্যই সেকালের) শেষ পুতুল ভাঙা কান্না শৈশব পেরিয়ে আর একবারই কাঁদতেন মৃত স্বামীর বুকে মাথা রেখে। শেষ বর্ষণ। তারপরই ত শুরু হয়ে যেত ক্ষরার দিন।

সেকালের হিন্দু বিধবার জীবনে ত ছায়া ছিল না !

হাই আর হাঁচির দাপট কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঙড়ায় হয়ে ওঠে। হাওয়ার খেলা তো। হাঁচি ছাড়ছে। হাই টানছে। হাঁচির গতিবেগ আর পাইপগান থেকে ছোঁড়া গুলির গতিবেগ প্রায় সমান।

শুয়ে শুয়ে কর্তার হাই তোলার কথা বলতে গিয়ে হাঁচি, কাশি, হাই, কান্না কত কি এসে গেল। এই হল বাঙালীর দোষ। ধান ভানতে শিবের গীত গাইবেই। মাঘ থেকে শীত, শীত থেকে বসন্ত, বসন্ত থেকে জলবসন্ত, সেখান থেকে মাগ, ছেলে, লিভার, পীলে। বাঙালী বক্তার বক্তৃতা এই ভাবেই এগোয়। আমার কথা নয়, রসিক উপেন্দ্রনাথের নিরীক্ষা।

আমার গল্পের এই কর্তাটির হাই আর হাঁচি, দুটোই খুব মারাত্মক। ইনি যখন দাঁড়িয়ে হাই তুলতেন তখন হাত দুটো ধীরে ধীরে মাথার ওপর উঠে যেত। শরীর টান টান হয়ে নর্তকের শরীরের মত ডাইনে বামে দুলত। মুখে এক ধরনের উঁয়া, উঁয়া শব্দ হত। এই হাত তোলার ফলে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে যেত। একবার ডাক্তারখানায় বসে এমন হাই তুললেন, মাথার অনেক ওপরের র‍্যাক থেকে যাবতীয় সিরাপ মিরাপ, ভিটামিন ফিটামিন সব পড়ে গেল। গিয়েছিলেন পেটের দাওয়াইয়ের জন্যে, ফিরে এলেন মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে। আর একবার এমন হাই তুললেন শিকে থেকে উল্টে পড়ে গেল ইলিশমাছের কড়া। শেষ হাই তুলেছিলেন ভায়রাভাইয়ের বাড়িতে। সেবার হাসপাতাল যেতে হয়েছিল। পাখার ঘূর্ণায়মান ব্লেডে হাত লেগে আঙুল ছেতরে গেল। সেই থেকেই ভারি সচেতন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই কর্মটি কদাচিৎ করেন। এখন হয় বসে, না হয় শুয়ে।

ঘুম আসার আগে গোটা দুই আদুরে হাই ওঠে। মুখের কাছে আলতো টুস্‌কি মারেন, আর জড়ানো গলায় বলতে থাকেন, কই গো, তোমার হল। দূরে চলে যাওয়া রেলগাড়ির শব্দের মত কইগো, তোমার হল কথাটি অস্পষ্ট হতে হতে, শেষে ফুড়ুত ফুড়ুত নাক ডাকায় মিলিয়ে গেল। এইবার শুরু হল কর্তার খেল। তিনি কখনও ডাঁয়ে, কখনও বামে বেঁকতে লাগলেন, খেলতে লাগলেন, স্বপ্নে দ্যাখা ফুটবলে লাথি হাঁকড়াতে লাগলেন, কখনও কখনও গাছের নিচু ডাল থেকে আম পাড়তে লাগলেন, পুকুরে ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন। শয্যায় তাঁর সেই দাপটে শয্যাসঙ্গিনী প্রায়শই খাট থেকে দুম করে মেঝেতে পড়ে যেতেন।

একদিন তিনি সাহস করে স্বামীকে ঠেলা মেরে বললেন, ওগো, শুনচো, একটু সরে শোও। বাস, আর যায় কোথায় ! সে যুগের মানুষের রাগেও একটা আদর্শ ছিল। রাগের একটা ইজ্জত ছিল। সতীত্ব ছিল।

রাত ঝিম ঝিম। কর্তা বিছানা থেকে নামলেন। গায়ে জামা চড়ালেন। কি

হতে চলেছে বোঝার আগেই, কর্তা দরজা খুলে একেবারে রাস্তায়। সারাদিনের খাটুনির ক্লান্তি, স্ত্রী ঘুমজড়ান চোখে শুনতে লাগলেন, একপাল কুকুর ডাকতে ডাকতে বহু দূরে চলে যাচ্ছে।

পনের দিন পরে একটি পোস্টকার্ড এলো, পাঞ্জাব অব্দি সরেছি, আর কি সরতে হবে ? কে উত্তর দেবে ? যাকে এই প্রশ্ন, সে তখন শোকে ভাবনায় এত দূরে চলে গেছে যেখানে পৃথিবীর ডাক পৌঁছয় না।

হাড়ে দুব্বো

এ কালে, যে যার সে তার। সেকালে এমনটি ছিল না। এখন যেমন আমি আমারটা বুঝি তুমি তোমারটা বোঝ, এ নীতি সেকালে চালাতে গেলে বেশ ঝামেলায় পড়তে হত। গোটা পাড়া নিয়ে তৈরি হত একটি পরিবার। যা খুশি তাই করে যাবে, সে উপায় ছিল না। সংসার তো চেপে ধরবেই, সেই সঙ্গে তেড়ে আসবে পাড়া। চালাকি পেয়েচো ! এ কি তোমার মামার বাড়ি। আদালত বসে গেল।

ছোট কত্তার বিচার হয়ে গেল।

ছোট কত্তা চিরকালই একটু রগচটা মানুষ। সকলেই বলেন দীনু আমাদের মানুষ ভাল। কেবল একটাই দোষ রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় দেশ শাসন করত ইংরেজ। বাকি আমরা সবাই ছিলুম ভারতীয়। এখন ঠিক তার উল্টো। শাসন করছেন ভারতীয়রা, আমরা সবাই সায়েব। বিশ্বাসে, আচারে, আচরণে, পোশাকে, আহারে বিহারে।

ছোট কত্তার স্ত্রী বড় ভাল মানুষ। বড় ঘরের মেয়ে। তখনকার কালে এইরকমই বলা হত। সুধাবালা বড় ঘরের মেয়ে। তখন দেখা হত ঘর। এখন দেখা হয় ছাপ। কটা পাশ। কাগজে আবার বিজ্ঞাপন পড়ে, উপার্জনরতা পাত্রী চাই, হাইট চার ফুট ন' ইঞ্চি। পাত্র ব্যাঙ্কের চাকুরে।

বধূদের সে যুগে কেমন যেন একটা জড়ভরত, জড়ভরত ভাব ছিল। যে ভাবটা কাটত সেই চল্লিশে চালসে ধরার পর। সংসারে তখন ছেলের বউরা এসে গেছে। যতক্ষণ বধূ ততক্ষণ ইঁট চাপা ঘাসের মত, জীবন বিবর্ণ। তখন ববও ছিল না, বয়কাট ছিল না, প্লাক করা ভুরু ছিল না। কোমর ছিল বুকের তলায়। এখন ম্যাকনামারা লাইন সরতে সরতে কাশ্মীর ছেড়ে প্রায় কন্যাকুমারী অবধি চলে গেছে। আর দু কদম গেলেই ভারত মহাসাগর। তখন একটা আকৃতি ছিল, এখন সবই অ্যানাটমির খেলা।

ছোট কত্তা হম্বিতম্বি করলে, ছোট বউ ঘোমটার আড়াল থেকে ফিসফিস করে বলত, আঃ রাগছ কেন ? সবই তো হাতের কাছে গুছিয়ে রেখেছি ! সে যুগের কত্তারা বড় স্ত্রীপোষ্য আয়েসী মানুষ ছিলেন। নিজের কোনও কিছুরই খবর রাখতেন না। আমার নস্যির ডিবে। আমার নস্যির ডিবে। ধেই ধেই নৃত্য। স্ত্রী এসে ট্যাঁক থেকে ডিবে খুলে কত্তার হাতে দিয়ে বললেন, ডিবে তো তোমার ট্যাঁকেই ছিল।

যে সব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সংসারে ঝড় বইত, তার পয়লা নম্বরে ছিল, গামছা। হাতের কাছে সময়ে যে বাড়িতে একটা গামছা পাওয়া যেত, সে বাড়িকে লোকে বলত শান্তির সংসার। আহা ! সব ছবির মত সাজান। নইলে দৃশ্যটা হবে এই রকম, পায়ে এক ঘটি জল ঢেলে, হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কত্তা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে মৃদু গলায়, কই গো একটা গামছা দাও। তারপর গলা আর এক ধাপ উঠল, ভালবাসার অ্যাভজাংক্ট 'গো' বাদ চলে গিয়ে, গামছা কি হল ? যেন হিন্দুস্থানী গোয়ালা হাঁকছে—দুধ লিয়ে যান। এরপর দাঁতে দাঁত লাগিয়ে, গামছা কি হল ? কালটা যদি শীতকাল হয়, উত্তুরে হাওয়া দেবে। জলসিক্ত পা বরফের মত ঠাণ্ডা হবে। কর্তা এবার তেড়ে হাঁকলেন—কি হল, মরে ভূত হয়ে গেলে না কি ? শেষে একেবারে কাঁচা মূর্তি, আরে মড়া, গামছার কি হল। ওদিকে গামছার খোঁজে বেচারা গৃহবধূ বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছেন। পাবেন কি করে ! কত্তা সেটিকে কাঁধে ফেলে, বাগানে সুপুরি পাড়তে গিয়েছিলেন। কলকে গাছের নিচু ডালে সেই গামছাটিকে ঝুলিয়ে রেখে চলে এসেছেন। ভুল করলেন তিনি। স্ত্রী সম্বোধিত হলেন 'মড়া' সম্বোধনে। সাবেক কালের নারীরা সর্বংসহা ছিলেন।

দ্বিতীয় যে বস্তুটি আগুন-জ্বালা ছিল, সেটি হল চিরুনি। চিরুনি আর বেড়াল কখনও এক জায়গায় থাকে না। কত্তা সেরেস্তায় যাবেন। চান করে এসেছেন। তখনকার কালে হাঁটু ভাঙা ড্রেসিং টেবল ছিল না। পমেটম, পাউডার মাখার রেওয়াজ ছিল না। আগাপাশতলা তেল মেখে স্নান। স্নানের পর ভিজে গামছা পরে, কুলুঙ্গির সামনে দাঁড়িয়ে হাফ আয়নায় চুল আঁচড়ান। সেই ঘুলঘুলিটাই নারী-যত্নে পরিপাটি। ভাঁজ করে কাগজপাতা। সিঁদুর কৌটো, চুলের ফিতে, শিশু থাকলে একটি কাজল লতা। মাথার কাঁটা। সব থাকবে, থাকবে না চিরুনি। সে বস্তুটি হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যে চলে যাবে।

আহারের আয়োজন চলেছে। কর্তা হুঙ্কার ছাড়ছেন, চিরুনি। কোথায় চিরুনি ! গৃহস্বামী ডিক্লেয়ার করলেন, তোমাদের সঙ্গে চুল নিয়ে আর সংসার করা যাবে না। কালই আমি ন্যাড়া হয়ে আসব। চিরুনি নিয়ে তিনিই বসেছিলেন পূবের বারান্দায় গোঁফ ছাঁটতে।

চশমা একটা স্বীকৃত হারাবার জিনিস। ও হারাবেই। ব্রাহ্মণের পৈতেও অনুরূপ একটি জিনিস। গেঞ্জির সঙ্গে খুলে চলে গেল।

ছোট কত্তার হাত পা ছাড়া প্রায় সব জিনিসই হারাত। স্ত্রী যতটা সম্ভব সামলে সামলে রাখতেন। শেষে একদিন তিনি স্ত্রীটিকেও হারিয়ে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ফিরে এলেন। ফিরে এসেও খেয়াল নেই। বড় বউদি যখন জিজ্ঞেস করলেন, সুষমা কি বাপের বাড়িতে রয়ে গেল ঠাকুর পো।

কে সুষমা ?

আরে তোমার বউ। বউয়ের নাম ভুলে গেলে ?

কেন সে আসেনি !

তুমি তো একাই এলে ?

এই যাঃ !

ছোট কত্তার কীর্তি, শোনার মতো। পেছনে লেডিজ সিটে স্ত্রীকে বসিয়ে, ছোটবাবু বাসের সামনের আসনে বসেছেন। দুটো টিকিটও কেটেছেন। বলেছেন, লেডিজ, পেছনের সিটে। তারপর বাসের দুলুনিতে গভীর নিদ্রা। ঘুম চোখেই একসময় শুনলেন, কণ্ডাক্টার হাঁকছে, হাটতলা, হাটতলা। ছোটবাবু বউ ভুলে সোজা নেমে গেলেন।

বিচারসভা বললেন, হাড়ে দুব্বো না গজান পর্যন্ত এর মনেই হবে না যে বিবাহিত। যতদিন শেকড় না নামছে, ততদিন দু'জনে কোথাও বেরলেই গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়াই বিধেয়।

পালঙ্কে বাঘ

বছর কয়েক আগে পালঙ্ক থেকে পড়ে গিয়ে সুধীরবাবু এই আশি বছরে কোমর ভাঙলেন। তা না হলে বয়েসের তুলনায় বেশ ঋজুই ছিলেন। সত্তরে সহধর্মিণীকে হারিয়ে জীবনটাকে মোটামুটি বেশ একতারায় বেঁধে ফেলেছিলেন। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় দুটি সম্বল স্ত্রী আর কোমর। কোমর কমজোর হয়ে পড়ায়, সুধীরবাবু ইদানীং বড় অসহায় হয়ে পড়েছেন।

খাট আর পালঙ্কে মনে হয় অনেক তফাৎ। খাট হল নেহাতই একটা শয়নোপযোগী পাটাতন। চারটে পায়া, মাথার দিকে উচ্চতায় সামান্য বড় একটা বোর্ড, পায়ের দিকে ওর চেয়ে খাটো একটি বোর্ড বা প্যানেল লাগান। অনেকটা কেঠো দম্পত্তির মত। মাথার দিকে স্বামী, উচ্চতায় সামান্য বড়, পদতলে স্ত্রী, মাপে কিঞ্চিৎ খাটো। মধ্যে একটি সমতল বিচরণ ভূমি। সেই ভূমিতে একটি

ছোবড়ার গদি, গদির ওপর একটি তোশক, তোশকের ওপর একটি চাদর। চাদরে কিছু ফুল পাতা থাকতে পারে। সেই উপত্যকায় কখনো হরিণ হরিণী, কখনো বাঘ বাঘিনী। যখন যেমন মেজাজ, তার ওপর নির্ভর করছে সম্পর্ক। তবে সবই সীমায় ঘেরা, রাগ করে সরে শুতে হলেও সেই চার ফুটের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে। ঠ্যাং ছুঁড়তে হলেও মেপে, বিঘত ব্যবধানে খাটের সীমানা। ক্রোধের পরিমাণ বেশি হলে খাটও চাঁটের বদলায় চাঁট ছুঁড়বে।

খাটের দুটো মাথা যে কোনও সময় হাতুড়ি ঠুকে খুলে ফেলা যায়। পাশের ঠ্যাঙা কাঠ দুটো খোলার সময় সাবধান না হলেই পায়ের আঙুলে পড়ে নখ থেঁতো করে 'লিভ উইদাউট পে' করে দিতে পারে। ঘাটে ঘাটে বসানো থাকে ফালা ফালা কাঠের দুটো চালি। খাট খোলার আগে ও দুটোকে টেনে তুলতে হয়। একদিকে তুললে আর একদিকে ঠোঁট কামড়ে থাকে। একা টেনে তোলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। হাত চিমটে রক্ত জমে যেতে পারে। সভ্য মানুষও গালাগাল দিতে পারেন সংযম হারিয়ে। খাট সেন্ট পারসেন্ট একটা দিশি ব্যাপার। হাতুড়ে বিজ্ঞানে তৈরি। জুড়তেও হাতুড়ি লাগে, খুলতেও হাতুড়ি লাগে।

খাটে অনেক ভেজাল থাকে। শালের পায়ায় সেগুনের প্যানেল। একালের কাষ্ঠ বিজ্ঞানীরা ব্লো-ল্যাম্প আর চক-পালিশের কেরামতিতে যে কোনও খোলো কাঠে সেগুনের শোভা এনে অনভিজ্ঞ ক্রেতার গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে পারেন। আমি জনৈক যথোচিত শেয়ানা ক্রেতার তৈরি-খাট কেনার কায়দা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। সঙ্গে প্রমাণ মাপের একটি হুলোসহ নিউবেঙ্গল ফার্নিচার শপে প্রবেশ করলেন। মাল খেয়ে মোটা মালদার হাবুবাবু এগিয়ে এলেন। বলুন স্যার, কি ডিজাইনের খাট চাই? ইংলিশ চাই না বেঙ্গলী চাই।

সায়েন্সের যুগ। আজকাল খাটের উচ্চতা শয়নকারীর হার্টের কণ্ডিসান দেখে ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রিপসানে লিখে দিয়ে থাকেন। এত ফুট হাইট। নট মোর দ্যান দ্যাট।

হাবুবাবু বললেন, দ্যাটস নো প্রবলেম। পছন্দ করুন। উঁচু হলে করাত মেরে নামিয়ে দোব। এখানে যা দেখছেন, সব একনম্বর টিক।

ক্রেতা কোল থেকে হুলো নামালেন। দুধে জল মাপা যন্ত্র নামাবার মত। নে হুলো আঁচড়া। এক অ্যাঁচড়েই হলদিকাঠ বেরিয়ে পড়ল। হাবুবাবু দেড় হাজার হেঁকেছিলেন। মিউ মিউ করে বললেন, কাঠ হল স্যার মেয়েদের জাত, বিয়ে না করলে নেচার বোঝা যায় না। একমাত্র হুলোতেই ধরতে পারে।

তা এমন সাবধানী ক্রেতা আর ক'জন আছেন? তাছাড়া শয়নের খাট আর মরণের খাট দুটোই নিজেকে কিনতে হয় না। একটি আসে স্ত্রীর সঙ্গে, আর অন্যটি কেউ না কেউ কিনে আনেন দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে। ব্যাচেলারদের কথা

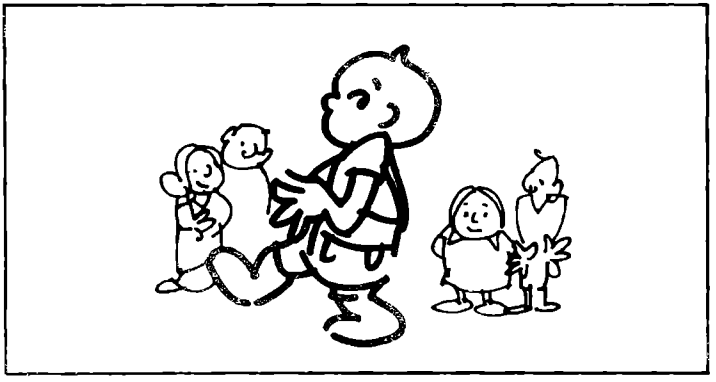

অবশ্য আলাদা।

এ যুগে অধিকাংশ মানুষই ভাড়াটে। বাড়িঅলা হবার সৌভাগ্য হয় ক'জনের। ভাড়াটে মানেই যাযাবর। আজ বেহালায় তো কাল বাগুইআটিতে। খাট খোলো আর খাট জোড়ো। তখনই বোঝা যায়, খাট কত ছোটলোক! খাটিয়ার চেয়েও নীচ স্বভাবের।

আকার-আকৃতি দেখলে মানুষের স্বভাবচরিত্র নাকি বোঝা যায়। এই শাস্ত্রটিকে বলা হয় অবয়ব বিজ্ঞান, ফ্রেনোলজি। আকৃতি দিয়েই বোঝা যায়, খাট বস্তুটিও কি স্বভাবের। চরিত্রে পরম দার্শনিক! কারণ খাটের বর্গভূমিতেই মানুষের শৈশবের প্রক্ষালন, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। এই ছোবড়া ভূমিতেই বাজে প্রেমের বাঁশরী, আবার রণদামামা, সব শেষে, শেষ-আর্তনাদ—এবার তবে আসিরে খেঁদি, ঠ্যাং ধরে চাতালে নামা। পকেটে শেষ পঞ্চাশ, খাটিয়া আনা। খাট দার্শনিক হবে না তো কি মানুষ হবে।

চারপাশে চারটে লগবগে ছতরি। ছতরি-বিজ্ঞান এক অতি কুচুটে বিজ্ঞান। খুললে লাগে না, লাগালে খোলে না। বিকল দাম্পত্য জীবনের মত। জোড় লেগে গেলে চলল কেরানী থেকে অফিসার। অফিসার থেকে সিনিয়ার অফিসার। ডাল ভাত, মাছের ঝোল ভাত। মুরগীর ঝোল ভাত। অবসর, পেনসান। আবার ডাল ভাত। অবশেষে ছাড়াছাড়ি। ছতরি চলল নেচে নেচে, বলো হরি, হরিবোল। স্ত্রী একবার সেঁটে গেলে, দাঁতের মত। মোক্ষম টানে উৎপাটন না করলে, সঙ্গের বিশ্বস্ত সাথী। মাঝেসাঝে একটু ট্রাবল দিতে পারে। ওষুধও আছে, গাম কিওর।

আর যদি চিড় খেল তো ওই ছতরির মতই। হিঞ্জে ঢোকাতে যাও, এমনই

কল, অবিকল গ্যাঁড়াকল। ছেঁচড়ে ঢোকাতে হবে। ওপর থেকে নিচে। ড্রেনপাইপ ধরে চোর নামার কায়দায় ছতরি নামবে গা ঘেঁষে। একবারের চেষ্টায় ঘাটে ঘাটে কিছুতেই মিলবে না।

যে দুটো বিমের ওপর চালি ঝোলে, সে দুটো খুব দুঃসাহসী না হলে ফিট করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। মেল ফিমেল কব্জা। চোয়ালে চোয়ালে ঢোকার কায়দায় একটার বুক বেয়ে আর একটায় প্রবেশ। রবাট ব্রুসের ধৈর্য চাই। ভাগ্যে থাকলে ঢুকবে নয়তো ফসকাবে। ফসকান মানেই ভারি কাঠ মেঝেতে পড়বেই। হাত পা ছড়বে। রক্তারক্তি হবেই। যত ফসকাবে তত জুয়াড়ির মত গোঁ চেপে যাবে। হয় এসপার, নয় খাট ঘাড়ে পড়ে আর পালঙ্ক থেকে মানুষ পড়ে। এই হল পালঙ্কের বৈশিষ্ট্য। সুধীরবাবুর পালঙ্কের বর্ণনা পরে হবে। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পড়লে কি করে।

হেসে বললেন, প্রাণের মায়া আছে তো ভাই!

সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তার মানে? ভাই বাঘে তাড়া করলে, তোমরা কি করতে?

বাঘের পাশে ফেউ

পালঙ্কের একটা আলাদা আভিজাত্য। তাকালেই স্তম্ভিত হতে হয়। হাল্কা, পাতলা চেহারার মানুষ পালঙ্কে শুলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'রুগী কোথায়' বলে কবিরাজমশাই হাতড়াতে লাগলেন। নাড়ি না টিপলে রোগ ধরা অসম্ভব। পালঙ্কের যুগে অ্যালোপ্যাথি এখনকার মত মোড়ে মোড়ে পাড়া আলো করে, রুগীর পঙ্গপাল নিয়ে শোভা পেত না। কবিরাজখানায় নিবু নিবু আলো জ্বলছে। চৌকিতে আধময়লা ফরাসের ওপর তাকিয়া হেলান দিয়ে ঠ্যাং তুলে বসে আছেন কবিরাজ। চারপাশে বয়াম আর কাঁচের জার। কোনও কোনও জারে কালোজামের মত রসা রসা গুলি। পরিপুষ্ট আরশোলা নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। কবিরাজ বিধান দিচ্ছেন, দারু হরিদ্রার সঙ্গে, পুটপাক লৌহ এক চামচ মধু দিয়ে মেড়ে খাও। ঘুম হচ্ছে না? চোখ বুজলেই, ভেসে উঠছে মধু উকিলের চেহারা! ভায়ে ভায়ে মামলা চলছে। জটা মাংসীর জল খাও।

কবরেজমশায়ের বয়েস হয়েছে। পালঙ্কে ওঠার ক্ষমতা নেই। তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে। পালঙ্কের পায়া ধরে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল। নাড়ির লাফালাফি বিদ্যুৎ প্রবাহের মত পালঙ্কের পায়া বেয়ে নেমে আসছে। তাইতেই ধরা পড়ে গেল, সান্নিপাতিকের নাড়ি। ধরেছেন

ঠিক, তবে এক ঘুমের পর। কবরেজমশাইকে ঠেলেঠুলে তুলতে হল। তা হল। দেড় পোয়া নস্যি নিয়ে বিধান দিলেন, জল এক্ষেত্রে অচল। তৃষ্ণা পেলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষবে। নেয়াপাতি ডাবের সাত ফোঁটা জলের সঙ্গে তিনগুলি লোহার ফুটকড়াই মেড়ে খাওয়াতে হবে।

পালঙ্ক যে যুগের জিনিস, সে যুগে কর্তারা একটু গভীর রাতে অসমান পায়ে বাড়ি ফিরতেন। সেই সময় কথা বলতেন একটু জড়িয়ে জড়িয়ে। মই বেয়ে পালঙ্কে উঠে হাতড়ে হাতড়ে স্ত্রীকে খুঁজতেন। আমার ঊর্মিমালা, তুমি কোথায় ? স্ত্রী অভিমান করে পুব কোণে শুয়ে আছেন চ্যুত মালিকার মত। তখনকার কালের উপন্যাসে এই ধরনের ভাষাই লেখা হত।

কর্তা হাত বাড়িয়ে খুঁজতে লাগলেন। তুমি এক হাতের মধ্যে নেই, তুমি দু'হাতের মধ্যে নেই। জলে নেই, স্থলে নেই, অন্তরীক্ষে নেই, ত্রিসীমানায় নেই। সংসারের মাথায় মারি লাথ। বিরহী যক্ষের পেনাল্টি কিকে, ঊর্মিমালা ছ'ফুট ওপর থেকে টসকে নিচে পড়লেন। সেখানে ছিল পিতলের পিলসুজ। ঠিকরে পড়ল। কর্তা চো, চো বলতে বলতে ভিরমি গেলেন। সে যুগের মানুষ খুব সাহসী ছিলেন। গোটা কতক জিনিসকে বড় ভয় পেতেন। তার মধ্যে একটি হল চোর। দ্বিতীয় ভূত। তৃতীয় পেয়াদা। এই নিয়ে চোরেরা ভীষণ হাসাহাসি করত। ঘরে সত্যি সত্যি চোর ঢুকেছে। ঘরের কোণে গৃহস্বামী গাড়ু হয়ে বসে রইলেন। চোর যাবার সময় মেরে গেল এক লাথি। কর্তা কাত হয়ে পড়ে সারা রাত বগ্‌বগ্‌ করতে লাগলেন। ভোর বেলা প্রতিবেশীরা এসে খাড়া করে বসালেন। এ কি ব্যাপার ? কর্তা বললেন, আমি গাড়ু হয়েছিলুম।

আর এক কর্তা বললেন, মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে দেখছি, ব্যাটা একটা চাদর পেতে সব বাঁধাছাঁদা করছে। আমি একেবারে চুপ। টুঁ শব্দটি করিনি। পাছে জানতে পারে আমি জেগে আছি। বাঁধাছাঁদা হল। সব দেখছি আমি শুয়ে শুয়ে। দরজা খুলে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে চোর মাঠে নামল। আমিও পেছনে পেছনে চলেছি। দেখি ব্যাটা কি করে ! হনহন করে হাঁটছে। আমি দূরে দূরে নজর রাখছি। বলা যায় না, ব্যাটা টের পেয়ে যেতে পারে ! পেলেই চমকে উঠবে। কেউ চমকে উঠলে, নিজের ভীষণ চমক লাগে। বুক ধড়ফড় করতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকালে মানুষ যেমন চমকে ওঠে। এই বুঝি বাজ পড়ল কড়কড়িয়ে। চোর ব্যাটা মাঠ ছেড়ে রাস্তায় পড়ল। তখন বুঝলুম চলে যাচ্ছে। চলেই যখন যাচ্ছে, তখন মনে মনে বললুম, যা ব্যাটা চলেই যা

এই ছিল পালঙ্কের যুগ।

লাল বনাতের মত চকচকে মেঝেতে বাঘের মত চারটে থাবা ফেলে বসে আছে বৃদ্ধ পালঙ্ক। দু পাশের বাজুতে খোদাই করা চোখ জুড়ানো ডিজাইন।

লতাপাতার মাঝখানে মুখব্যাদ'ন করে আছে একটি বাঘ। পায়ের দিকে মৎস্যকুমারী, হাতে মালা। চার পায়ের চারটে থাবা দেখলে মনে হবে, রেগে গেলে পালঙ্ক নখ বের করবে।

সুধীরবাবু এমনই একটি বাহারী বস্তু থেকে ভূপাতিত। পড়লেন কি করে ?

আরে ভাই মাঝ রাতে বাঘে তাড়া করল। প্রাণের ভয়ে সরতে সরতে ধপাস্ করে মাটিতে। এখন এই খাটিয়ায় শেষ শয্যা পেতেছি। জাহাজের পাশে ছোট বোট। দিন ফুরোলেই, কাঁধে তুলে, জীবন পারাবারের তীরে ফেলে দিয়ে আসবে।

ছেলেরা মুখিয়ে আছে। কর্তা একবার সিন থেকে সরে গেলেই হয়। ঘরের কোণে কোণে হারোয়া লাঠি রেডি হয়ে আছে। বলো হরি বলে মুখাগ্নি সেরে এসেই, লাগিয়ে দেবে ধুন্দুমার। গলায় কাছা, বুকে দুলছে ন্যাকড়ার ফালিতে বাঁধা পুরনো চাবি। পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মা স্পর্শের প্রতিষেধক। সেই অবস্থাতেই বড় পড়বে, মেজোর ঘাড়ে, সেজো চাপবে বড়র ঘাড়ে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী লড়াই। এ বলবে দক্ষিণের অংশটা আমার ও বলবে আমার। শেষে ডিক্রি জারি। শ্রাদ্ধ হবে তিন খণ্ডে। জমি ভাগের সঙ্গে সঙ্গে, কোর্টের লোক পালঙ্কে ফিতে ফেলবে। ভাগের ইলিশ কেনার মত, পালঙ্ক তিন ভাগ হবে। চারটে পায়া আর আমি তখন ভূত হয়ে আড় কাঠে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে, নাকি সুরে গান ধরব, ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ। কেউ ধরতে পারবে না ? ভাববে, এ কালের কোনও শিল্পী আকাশ বাণী থেকে আধুনিক গান গাইছে।

হিসেবের খাতা

সেকালের মানুষ ভীষণ হিসেবী ছিলেন। অর্থের ব্যাপারে সামান্যতম অনর্থ তারা সহ্য করতেন না। সব একেবারে আটঘাট বাঁধা। মনে মনে বলতেন, এ তো ছেলের হাতের মোয়া নয়, যে খাবে তুমি ভোগা দিয়ে !

বেহিসেবী উড়নচণ্ডে দু একজন ছিলেন, তবে সংখ্যায় খুবই কম। আমি একজনের কথা আমাদের পরিবারে শুনেছি, যিনি পয়লা তারিখের মাইনের টাকা আসার পথেই অর্ধেক শেষ করে ফেলতেন। তাঁর কিঞ্চিৎ জলপথে যাতায়াত ছিল। বাকি অর্ধেক দু তারিখেই শেষ। তিন তারিখ সকালে দেখা যেত, বাড়ির চৌকাঠে মাথায় পাগড়ি বেঁধে তিনি বসে আছেন। সামনে দিয়ে যিনিই যাচ্ছেন তাঁকেই বলছেন, মহারাজকে কিছু প্রণামী দিয়ে যাও।

মাঝে মধ্যেই, অনেকে প্রাণের দায়ে তাঁকে উপদেশ দিতেন, ওহে, শেষ

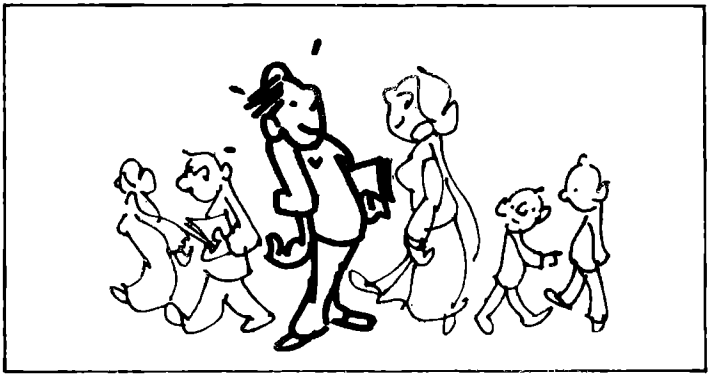

জীবনে তোমাকে ভিক্ষে করতে হবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, সেই জন্যে এখন থেকেই ত সড়গড় করে রাখছি ভাই। তারপরই মোলায়েম গলায় বলতেন, কিছু থাকে ত রেখে যাও। নিজে হাতে নোব না, ওই থালায় ফেলে দাও। ওটা মানদার নামে উৎসর্গ করা। যা পড়বে তাই দিয়ে চিকিৎসা হবে। মেয়েটার ন্যাবা হয়েছে।

তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে বলতেন, শেষের সেদিন বড় ভয়ঙ্কর। তিনি বুক ফুলিয়ে বলতেন, আরে যা যা, শেষের সে দিন দ্যাখার জন্যে কোন'—বসে থাকবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি একবার সপরিবারে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। আসমুদ্র হিমাচল বিনাপয়সায় ঘুরে এলেন। ভাড়া চাইলেই, কি টিকিট দ্যাখাতে বললেই তেড়ে ওঠেন, আমি একটা বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার, টিকিট কিসের, টিকিট চাও কোন সাহসে।

'বোনাফাইড' কি জিনিসরে বাবা! চেকার আর ঘাঁটাতে সাহস পান না। এক বোনাফাইড শব্দের জোরে তিনি সারা ভারত ঘুরে এলেন। তাঁর সাহস ছিল। সকলের ত আর সে সাহস থাকে না।

তিনি একবার পুলিসকে পুলিস ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কলকাতায় পাঁচ আইন চালু ছিল। এক বেচারা পুলিস বেগ ধারণ করতে না পেরে, একটি দেয়ালে কুকুর কর্ম করছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক অ্যাঙলো সার্জেন্টকে ধরে এনে বললেন, ইসকো পাকড়ো। পুলিসে পুলিসে মুখ শোঁকাশুঁকি থাকবেই।

তিনি বললেন, আমি সাক্ষী, তুমি যদি না ধরো, আমি এই চল্লুম গভার্নরের কাছে। জানো আমি কে?

তাঁকে অসাধারণ সুন্দর দেখতেছিল। সায়েব কোম্পানিতে কাজ করতেন।

pathagar.net

চোস্ত ইংরিজি বলতেন। সার্জেন্ট ভয় পেয়ে গেলেন।

পকেটে সেদিন নেশার পয়সা ছিল না। শেষে রফা হল কু-কর্মকারী পুলিস তাঁকে পাঁচটি টাকা দিলে, তিনি আর চিৎকার করে লোক জড় করবেন না।

জানো, আমি কে ? বলে তিনি সারা জীবন অনেক অসাধ্য সাধন করে গেছেন। কেউ কখনও চ্যালেঞ্জ করেনি, বলো তুমি কে ?

পরবর্তীকালে আমি আর একজনকে দেখেছিলাম, যিনি, 'আমি বলছি' বলে বাজি মাত করে দিয়েছিলেন। ফোন তুলেই গম্ভীর গলায় বলতেন, অমুককে পাঠাচ্ছি, একটু দেখো। ওপাশের ভদ্রলোক গদগদ হয়ে নিশ্চয়ই বলতেন, পাঠান স্যার, পাঠিয়ে দিন স্যার। যাকে পাঠাতেন, তাকে শিখিয়ে দিতেন, তুমি শুধু বলবে, উনি পাঠালেন, আর কিছু বলবে না।

সাহসী, বেহিসেবী মানুষের কথা থাক। সংসারী মানুষকে ভবিষ্যৎ ভেবেই কাজ করতে হবে। আগেকার দিনের অধিকাংশ মানুষ তাই ছিলেন। আয় বুঝে ব্যয় করতেন। মুদীর দোকানে থাকত, খেরো বাঁধান তিন পাট খাতা। দোয়াতে কালো কালি। সরকার মশাইয়ের চোখে ভাঁটি ভাঙা চশমা। গায়ে টুইলের ফুল হাতা, ময়লা ময়লা শার্ট। সারা জীবন কাঠের ক্যাশ বাক্সের ওপর খাতা রেখে, সামনে ঝুঁকে হিসেব লিখে লিখে কোল কুঁজো। এখন আর এঁদের দেখা যাবে না। অত কম মাইনেতে কেউ আর সরকার হবেন না, এ যুগে। কাঠের হাতলে সরু নিব। এ যুগে সে জিনিস আর মিলবে না। সেই কাঠের হাতল আর বাদামের আকৃতির সাদা সাদা নিব। সরকার মশাইদের হাতের লেখা বড় সুন্দর ছিল। শেষ অক্ষরটি লিখতেন বিশাল এক টান মেরে। হয় তো পড়া যেত না, কিন্তু দেখাত সুন্দর। খাঃ মসুর লিখেছেন, না খাঃ মাগুর লিখেছেন, বলা সহজ ছিল না। বাকির খাতার হস্তাক্ষরে ইচ্ছাকৃত কিছু দুর্বোধ্যতা থাকত। যে ক্রেতা ধারে সারা মাস খান আর পয়লা এলে, আজ না কাল, কাল না পরশু করেন, তাঁর একশোকে দেড়শো, কি দুশোয় তুলতে ত হবেই। তা না হলে ধেরো ক্রেতার সদ্বুদ্ধি আসে কি করে !

বাড়িতে বড় কর্তাদের কাছে যে হিসেবের খাতা থাকত তার আকার হত ছোট, অনেকটা নোট বুকের মত। লেখারকায়দা প্রায় একই রকম, জমা আর খরচ। সে একেবারে চুলচেরা হিসেব। বাজার তিন টাকা লিখলে চলবে না। লিখতে হবে, আলু এক সের, পটল, ঢেঁড়স, কুমড়ো ইত্যাদি। পুঁটির জলখাবার (সকালের), মুড়ি মুড়কি, দু পয়সা। সৌদামিনীর একটি লাল পাড় শাড়ি। বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের জন্যে, এক বাণ্ডিল লাল সুতোর বিড়ি। আমার ক্ষৌর কর্ম। স্ফূর্তি বাবদ। কি ধরনের স্ফূর্তি, তার কোনও বিবরণ লেখা নেই। থাকলে বোঝা যেত ১৯১৯ সালে পাঁচ সিকাতে কি আনন্দ সম্ভব হয়েছিল। মটকি ঘি এক

BanglaBook.net

টিন। বিধুশেখরের বধূ দর্শন, এক টাকা। তখনকার দিনে কর্তার হাত থেকে টাকা নিয়ে খরচ করতে আতঙ্ক হত। শেষ পর্যন্ত পাই পয়সার হিসেব মেলান যাবে ত!

একালে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এ চাকরি করতেন। দিনের শেষে দু পয়সার হিসেব আর মিলছে না। পাণ্ডবসভার মত পাঁচ জন পাঁচ দিকে বসেছেন। রাত আটটা বাজল, নটা বাজল। দু পয়সার গরমিল কিছুতেই মেলে না। রাত বারোটার সময় আমার সেই বন্ধু বললে, দুটো পয়সা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আরে, সে ত আমরাও দিতে পারি। রাত দেড়টার সময় একজন চিৎকার করে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি। পাঁচজন আর্কিমিড়িস মাঝরাতে নাচতে লাগলেন, ইউরেকা, ইউরেকা।

হ্যাণ্ডস আপ

একটা সময় ছিল যে সময় শীত এলেই বাঙালীরা দলে দলে, সপরিবারে সাঁওতাল পরগণায় বায়ু পরিবর্তনে ছুটত। মধুপুর, গিরিডী, কারমাটার, সিমুলতলা, জামতাড়া, হাজারিবাগ। দুটো কি তিনটে মাস ওই সব অঞ্চল একেবারে গম গম করত। সে ছিল বাঙালীর স্বর্ণযুগ। দাপটও ছিল তেমনি, আমরা বুদ্ধিজীবী বাঙালী।

বাঙালীবাবুদের জন্যে ট্রেনে তখন একটা ক্লাস ছিল, যেটাকে বলা হত ইণ্টার ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, ইণ্টার ক্লাস, থার্ড ক্লাস। কামরার রঙ লাল তার ওপর সাদা রোমান হরফে এক, দুই আর তিন লেখা। দেখলেই মনটা কেমন শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠত। দেশের অর্থনীতির পুরো ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠত। কারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর কারা সংখ্যালঘিষ্ঠ, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের কামরার দিকে তাকালেই স্পষ্ট ধরা পড়ে যেত। প্রথম শ্রেণীতে গুটি কয়েক বাঙালী মুখ। কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ধরা পড়ে যায়, হয় বিশাল সরকারী কর্মচারী, না হয় জীবিকায় উচ্চ প্রতিষ্ঠিত অথবা কোনও জমিদার। বাকি সব সায়েব, মেম সায়েব। শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাঙালী, অ্যাংলো প্রায় আধাআধি। ইণ্টার প্রায় পুরোটাই মধ্যবিত্ত বাঙালীর। আর তৃতীয়ে পড়ে আছে পুরো দেশ।

মানুষের বিলি ব্যবস্থা যাই হোক, সব আয়োজনই ছিল ছবির মত। ঝকঝকে তকতকে প্ল্যাটফর্ম। ট্রেন যেন সদ্য 'হামাম' থেকে বেরিয়ে এল। দুটো শব্দ যেন স্বপ্নের মত হুইলার আর কেলনার। ইনজিনেরও কি বাহার ছিল, যেন লোহার

ঘোড়া। পেটে তিনটে পেতলের ব্যাণ্ড। বেঁটে খাটো চেহারা। মুখের দিকটা রাগী রাগী। ধোঁয়া ছাড়ার খাটো চোঙের পাশে আর একটা সরু ব্যবস্থা, যেটা থেকে মাঝে মধ্যেই ভীষণ ফিশ্ শব্দে বাষ্প বেরিয়ে ঘোষণা করছে শক্তি। পাছে ইনজিনের পেট ফেটে যায় সেই ভয়ে কেউই কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। জগৎ সংসারের দিকে এমন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন যেন পৃথিবীকেই ঘোরাচ্ছেন তার অক্ষপথে। পাশে নীল জামা পরা ফায়ারম্যান, মাথায় নীল ফেট্টি। হুস হুস করে কয়লা ঠেলছেন, সামনের দিকে হাহা করে আগুন জ্বলছে। ড্রাইভারের মাথার কাছে বাঁদরের ন্যাজের মত কি একটা ঝুলছে, সেটা ধরে টানলেই ইনজিনের বেল্ট বাঁধা পেট থেকে সবেগে, সশব্দে বাষ্প বেরিয়ে চরাচর ঢেকে ফেলছে। অনেক সময় আর একটা ছোট ফুটো দিয়ে ঝিঁ ঝিঁ করে অনবরতই বাষ্প বেরতো। যার ভেতর দিয়ে তাকালে পৃথিবীকে কাঁপতে দেখা যেত। গরানহাটার সোনারূপোর কারবারী লাল শাড়ি পরা লাজুক লাজুক বধূটিকে বলছেন—ইস্টিম বেশি হয়েছে।

রেলের গা থেকে একটা রেল রেল গন্ধ বেরুচ্ছে। এখনকার ভাষায় ম্যাসকুলাইন সেন্ট। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর যে গন্ধটি যাত্রীদের গা থেকেও পাওয়া যেত। ইস্কুল বসার ঘণ্টার মত, একটা ঘণ্টা বেজে উঠত, একেবারে শেষপ্রান্তে একটি মানুষকে পতাকা নাড়তে দেখা যেত। পরনে সাদা প্যান্ট, নীল কোট। ইনজিন থেকে ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারও পতাকা নাড়ছেন। সাবধানী মানুষ চিৎকার করছেন, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, পাখা পড়েছে। হুইস্‌ল বাজল। প্ল্যাটফর্মের চালে, শূন্যে ঠোকা লেগে সেই শব্দ বলতে লাগল, দূরে দূরে। কামরার জানালায় একটি মুখ। ঠোঁটে বাটারফ্লাই অথচ চোখে জল। শিশুকোলে এক মহিলা প্ল্যাটফর্মে। ঘোমটা নেমে এসেছে খোঁপার ডগায়। বড় বড় চোখের পাতা জলে সপসপে। ছেলের বালাপরা কচি হাত নিজের হাতে ধরে বিদায়ের ভঙ্গীতে নাড়াতে নাড়াতে ধরা গলায় বলছেন, সাবধানে থেকো, গিয়েই চিঠি দিও, খাবারটা প্রথম রাতেই খেয়ে নিও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ছলছলে চোখে স্বামী বলছেন, আবার বড়দিনে আসব। ও হ্যাঁ, তুমি হরিকে একটা টাকা দিও, আসার সময় তাড়াহুড়োয় ভুলে গেছি। ইনজিন হঠাৎ দূরের ডাকে ডেকে উঠল। চাকার পাশ দিয়ে স্টিম বেরিয়ে সব দৃশ্য মুছে গেল। শুরু হল ভ্যাস ভ্যাস যাত্রা। লোকে বলে, সব ম্যাসাকার করে দিলে হে, এ যেন ভ্যাসাকার। কার হাত থেকে কার হাত খুলে গেল, কার চোখ থেকে কার চোখের সেতু পড়ে গেল। একজন বাবু তখনও জানলার পাশে পাশে দৌড়চ্ছেন, আর বলছেন, কিছু ভাববেন না স্যার, হ্যাঁ স্যার, সই করিয়ে স্যার। অ্যাটর্নি শিবশঙ্কর যাবার আগে, লাস্ট মিনিট সাজেসান দিয়ে যাচ্ছেন।

BanglaBook.org

সেজ গিন্নি বললেন, যাঃ ঠাকুর পো সর্বনাশ হয়ে গেল, বালতির মধ্যে তেলের বোতলটা উল্টে পড়ে গেছে। প্রাইমাস স্টোভ চলেছে, চাকি-বেলন চলেছে। পানের ডাবর, সঙ্গে সঙ্গে ছঁরকম জর্দা। গঙ্গার জল, তামার টাট, কোষাকুষি। বড় কর্তা জপাহ্নিক ছাড়া জল স্পর্শ করেন না। হারমোনিয়াম, এস্রাজ, বেহালা, বাঁয়া তবলা। কবিরাজী ওষুধ অনুপান সহ, হোমিওপ্যাথির বাক্স। উৎপাটিত সংসার, শেকড়-বাকড় সমেত চেঞ্জে চলেছে। সঙ্গে আহার্যের বিপুল আয়োজন। এক ধামা লুচি। এক বালতি আলু-মরিচ, জলভরা তালশাঁস, ভীমনাগের নরমপাক, কড়াপাক, ডালমুট, প্রথম শীতের কমলা লেবু। শেফিল্ডের ফলকাটা ছুরি, পেয়ারা, ন্যাসপাতি, এক বোতল অ্যাকোয়াটাইকোটিস। তাস আছে, দাবা আছে, মেয়েদের লুডো, ছেলেদের ফুটবল, ক্রিকেটের সাজসরঞ্জাম, এমন কি ঘুড়ি লাটাই। দেখতে দেখতে পুরো কামরা একান্নবর্তী পরিবার। শরৎচন্দ্র, শার্লক হোমসও চেঞ্জে চলেছেন।

আর এখন। প্ল্যাটফর্ম চোখেই পড়ল না। জনসমুদ্রের মাথার ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে বাক্স প্যাঁটরার সঙ্গে তালগোল পাকাতে পাকাতে, যাবজ্জনমং তাবৎ মরণং, তাবজ্জননী জঠরে শয়নম জপতে জপতে, আখমাড়াই কলে মাড়াই হতে হতে, ছ্যাঁচাই হতে হতে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারা পঙ্গপালের সওয়ারী দুম করে বিষণ্ণ চেহারার এক কাষ্ঠপ্রকোষ্ঠে এসে পড়া গেল। রিজার্ভেসান স্লিপ কোনও এক বুদ্ধিমান ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। সব রকমের ভাষায় খিস্তি খেউড় ছুটছে।

রাত বাড়ছে, ট্রেন দুলছে, ইষ্ট দেবীকে স্মরণ করা হচ্ছে। আসন ছেড়ে কেউ উঠলেই আতঙ্ক হচ্ছে—এই বুঝি আদেশ ভেসে আসে—হ্যাণ্ডস আপ। পতিতবাবু পাটনায় শ্বশুরবাড়ি পৌঁছলেন। জাঙ্গিয়া পরে—কাঁদো কাঁদো মুখে। শ্যালিকা তখন গান ধরেছেন, লজ্জা, এ কি লজ্জা, ছি ছি মরে যাই, এ কি লজ্জা ?

ভূত অথবা ভূতপূর্ব

pathagar.net

সাবেক আমলে অনেক ভূত দেখতে পাওয়া যেত।

ভূত অবশ্য সাধারণত দেখা যায় না। তাদের পরিচয় কাজে। ভৌতিক ক্রিয়া কর্মে ধরা পড়ে ভূত এসেছিল। ছেলেবেলায় আমাদের একটি কবিতা ছিল, আমাদের দেশে কবে সেই ছেলে হবে। কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। ভূতেদের সংসারে ছেলেপুলে আছে কি না জানি না। থাকলে এই কবিতা সেখানে অচল। কারণ ভূতেরা কথা বলে কম, কাজ করে বেশি।

একমাত্র ইলিশ মাছ দেখলে ভূতেদের মুখে খোনা খোনা বাক্যি ফোটে।

প্রায় শ'খানেক বছরেরও বেশি হয়ে গেল, আমার পূর্বপুরুষেরা গঙ্গার ধারের একটা অঞ্চলে আস্তানা গেড়েছিলেন। সেই থেকে সেইখানেই আমাদের ড়ালপালা বিস্তার। এক সময় ওই গঙ্গায় প্রচুর ইলিশ পড়ত। পূর্ববঙ্গের মাঝিরা চলে আসতেন এই বঙ্গে। সারি সারি নৌকো, যাকে বলা হত জেলে ডিঙ্গি, বাঁধা থাকত ঘাটের ধারে। গঙ্গা তখনও মজে আসেনি। প্রায় সব সময়েই কানায় কানায় জল টলটল করছে। সারি বাঁধা ডিঙ্গি ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। রাতের দিকে আলোর মালা পড়ে আছে সীতা হারের মত জলের কিনারায়। ছইয়ের মধ্যে লণ্ঠন জ্বলছে। তারই শোভা। ভাটিয়ালি গানের সুর, রান্নার শব্দ, দেবালয়ের আরতির ঘণ্টা ধ্বনি, সন্ধের দিকে এমন এক স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরি করত, যার টানে মানুষ মরেও মুক্তি পেত না। ভূত হয়ে ফিরে আসত। থাকার জায়গারও অভাব হত না। দু'ধারে সারি সারি বাগান বাড়ি। পিটুলি, পাকুড়, আসশ্যাওড়া গাছ। হয় বাগান বাড়িতে থাকো, না হয় পা ঝুলিয়ে বসে থাকো গাছে। ফুরফুরে হাওয়া খাও গঙ্গার।

ইলিশ ধরার নানা রকম সময় ছিল। স্রোত বুঝে পাকা মাছ-ধরিয়েরা নৌকো ছাড়তেন। যত দূর জানি ইলিশ চলে স্রোতের উল্টো দিকে। বড় আমুদে মাছ। তা না হলে শরীরে অত তেল হয়! স্রোতের ঘষা খেয়ে খেয়ে শরীরের কি বর্ণ! জল ছেড়ে উঠেছেন যেন রূপোর মাছ। দামের কোনও মা বাপ ছিল না। টাকায় পাঁচটা। দর দস্তুর করে কিনলে ছটাও হতে পারত।

ইলিশের গন্ধে পাড়া ম ম করত। সব বাড়ি থেকেই ইলিশের গন্ধ বেরোচ্ছে। টাটকা ইলিশ সুস্বাদু, অতি উপাদেয়। কিন্তু বাসী হলেই সাংঘাতিক। যাবার সময় বলে যায় স্মৃতিটুকু থাক। গেলাসে ইলিশ-গন্ধ, থালায় গন্ধ, বাটিতে গন্ধ, গামাছায় গন্ধ, মুখে গন্ধ, হাতে ভকভকে গন্ধ, চুলে গন্ধ। সর্বত্র কডলিভার। কর্তা চা খাচ্ছেন নাক টিপে। ইলিশ চা। নাক টিপে দুধ। ইলিশ দুধ। গেলাসের জলে তেল ভাসছে। স্বপ্নে রাধামাধব এসে দেখা দিলেন। বাবা চারু, আর যে আমি পারি না। ভোগে ইলিশের গন্ধ। ইলিশ পায়েস খাইয়ে খাইয়ে আমার বারোটা যে বাজিয়ে দিলি মানিক। এই দ্যাখ, আমার নাক সিঁটকে গেছে।

চড়াক করে চারুর ঘুম ভেঙে গেল। শেষ রাতে ঠাকুর ঘরে গিয়ে দ্যাখে, সত্যিই রাধামাধবের নাক সিঁটকে আছে। একশো টাকার ধূপ পোড়াবার পর সেই নাক সোজা হল। তখন কত সব অলৌকিক ব্যাপারও ঘটত!

কথায় বলে, ছেলে ভালো, ছেলের বায়না ভাল নয়। বউ ভালো যতক্ষণ না মুখ খোলে। সেই রকম ইলিশ ভালো, যতক্ষণ না গন্ধে বাড়ি ছাড়া করে। বড়বাবু ম্যাকিন্টশ সায়েবের সঙ্গে কথা বলছেন, দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে, মুখে

রুমাল চাপা দিয়ে।

দু'জনে ভাব ভালবাসার কথা হচ্ছে সম্মানজনক দূরত্বে দাঁড়িয়ে। চোখের ডাক্তার সামনে ঝুঁকে পড়েই বাপ বললেন। রুগী পেছনে মাথা সরিয়ে বললেন, আপনিও বাপ্ আমিও বাপ্। দু'জনেই ইলিশ। সখী পেছন থেকে সখার চোখ আঙুল দিয়ে চেপে ধরে বলছে, বলো তো আমি কে ? সখা বলছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

যাক, আসল কথায় আসা যাক। গোলাপের যেমন কাঁটা, ইলিশের তেমনি গন্ধ। কিছু করার নেই। ভূতের কথায় আসা যাক। সন্ধের মুখে পঞ্চাননবাবু প্রমাণ সাইজের একটি ইলিশ দড়িতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরছেন। চারপাশে বাগান বাড়ি। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে বাগান বাড়ি ছিল, বাড়ির মালিকদের অবস্থা কিন্তু কাহিল হয়ে এসেছে। ফুর্তি করার জন্যে বাগানে আসার তেল মরে গেছে। এ তো আর টাকায় ছটা ইলিশের তেল নয়।

পঞ্চাননবাবু ইলিশ ঝুলিয়ে আসছেন। ভাজা হবে, ভাপা হবে, দই ইলিশ হবে, কাঁচা ঝাল হবে, মুড়ো দিয়ে পুঁই দিয়ে একটা কেলেঙ্কারি হবে। ডানপাশের অন্ধকার অন্ধকার একটা বাড়ির ছাদের কার্নিস থেকে নাকি সুরে কে আবদার জানাল, পঁঞ্চা ইঁলিশটা দিয়ে যাঁ।

এক সঙ্গে অত চন্দ্রবিন্দুর ঘটা শুনেই পঞ্চাননবাবু, বুঝলেন, এ কোনও ভূতপূর্ব মনুষ্য, যিনি আপাতত ভূত। ইলিশ ফেলে কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে, পঞ্চুবাবু বাড়ি এলেন। সাতদিন বাক্য সরল না। ডাক্তার বললেন, ডাম্বফাউণ্ডেড।

পতিতপাবন চন্দ্রবিন্দুর জোরে এইভাবে অনেক ইলিশ খেয়েছিল।

এখন ভূত নেই, ভূতপূর্বরা আছেন। ভূতপূর্ব মানে, যিনি পূর্বে ভূত ছিলেন, এখন মানুষ হয়েছেন। ভূত অবস্থায় দেশবাসী তাঁদের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে অতিষ্ঠ। যেমন ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, ভূতপূর্ব সভাপতি, ভূতপূর্ব নেতা।

বিদ্যালয়ের এক সেক্রেটারী খুব ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ দেখাচ্ছিলেন। শ'খানেক বছরের স্কুলের ভিত টলে গেল। মিউনিসিপ্যালিটির এক চেয়ারম্যান খুব খেলা দেখাচ্ছেন। রাস্তায় পরিখা খনন করে আলো নিবিয়ে রেখে বলছেন, তোরা কে ভূত দেখবি আয় ! মাছের চাষের মত ভূতের চাষ। বুড়োরা আর বুড়িরা রিক্সার গুঁতো খেয়ে খানায় পড়ে মরবে। অপঘাত মানেই ভূত হওয়া।

এঁরা সব বিদায় নিয়ে নামের পাশে একদিন লিখবেন ভূতপূর্ব। মানুষ মাথা নুইয়ে তখন বলবে হ্যাঁ, সত্যিই তাই, পূর্বে আপনি ভূত ছিলেন। অতঃপর কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিবেন তিনি মরেন নাই। ছিলেন ভূত, মরেও ভূত।

যে তিমিরে সেই তিমিরে

শুধু এ দেশ কেন সব দেশেই স্বামী স্ত্রীর সংসার লীলা কখন কোন্ ধারায় চলবে বলা শক্ত। এই প্রেমে হাবুডুবু, পর মুহূর্তেই দক্ষযজ্ঞ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা কোনও কিছুই দম্পতির নিজস্ব ধারাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ব্যাক্তিত্বের ঠোকাঠুকি হবেই। আর ঠোকাঠুকিতেই মানুষ থেকে পশুর মুক্তি।

কিছুকাল আগে একটি রিপোর্টে দেখা গেল সুসভ্য ইংরেজরা সুযোগ পেলেই স্ত্রীদের বেধড়ক ঠ্যাঙাচ্ছেন। শুধু স্ত্রীকে নয় সন্তানকেও। উন্নত দেশের ঘর সংসারে মানুষের হাতের কাছে নানা রকমের উন্নত জিনিস থাকে ফলে ধোলাইটাও খুব উন্নতমানের হয়। এদেশের মানুষের হাতিয়ার অতি প্রাচীন। জুতো, ঝাঁটা, ছাতার বাঁট, তলতলে ঝুলঝাড়ু, ফেদার ডাস্টার। সম্প্রতি ফোল্ডিং ছাতা এসেছে। কাপড় জড়ান, নরম পাটার মত। বেশ হ্যাণ্ডি। চলবে ভালো, তবে প্যাডিং থাকায় লাগবে কম। আগেকার দিনের ছাতা ছিল পুরুষ, এখনকার কালের ছাতা স্ত্রীদের মত, নমনীয়, কমনীয়, চিকন হয়েছে। মারবো ছাতার বাড়ি বলার আগে ভাবতে হয়। এসেছে হাত ঘুরে ঘুরে হংকং থেকে। সংগৃহীত হয়েছে শিলিগুড়ি কি দার্জিলিং থেকে অথবা এসেছে নেপাল থেকে, স্ত্রীকে ধামসাতে গিয়ে খোলনলচে খুলে গেলে নিজেকেই ভিজে মরতে হবে।

ইংরিজি ধোলাইয়ে স্বামীরা সাংঘাতিক সাংঘাতিক জিনিস ব্যবহার করেন। সেদেশের স্ত্রীরা যেন ড্রাকুলার হরার হাউসে বাস করছেন ! হরেক রকমের বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের কখন কোনটা যে স্ত্রীর ওপর প্রযুক্ত হবে, স্বয়ং বিধাতাও অকুস্থলে উপস্থিত থাকলে বলতে পারবেন না। যেমন স্বামী আয়রনিং টেবিলে থার্মোস্ট্যাটিক ইস্ত্রি দিয়ে জামার কলারে মাঞ্জা মারছেন। মেমসায়েব হয় তো কিচেনে ইলেকট্রিক মিকসারে কিছু একটা করছেন। দুজনে চলেছে স্যাকরার ঠুকঠাক। সায়েব স্বামী হঠাৎ খেপে গিয়ে চড়িয়ে দিলেন, কামারের এক ঘা। গরম ইস্ত্রি চেপে ধরলেন মেমসায়েবের গোলাপী গালে। হয়ে গেল, ডেটিং, কোর্টিং, এনগেজমেণ্ট, ম্যারেজ, সব ভেসে বেরিয়ে গেল। বাবা, সায়েবদের মেজাজ বলে কথা। সাধে বাদামী বড় কর্তাদের সায়েব বলে। সায়েব মানে মেজাজ। তবে এদেশের বেশির ভাগ ডায়াবিটিক সায়েবরা বাড়িতে কেঁচোর মত। কতবার যে কানধরে ওঠ বোস করতে হয় শিশুর মত। মেট্রনলি স্ত্রীর শাসনে প্রাণে বেঁচে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ব্যামোর তো শেষ নেই। নিজের কুটোটি নাড়ারও ক্ষমতা নেই। বাঙালী মায়ের আদুরে সন্তান। তিনি সমস্ত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ্যাবিটস নষ্ট করে দিয়ে ছেলেকে দিয়ে গেছেন বউমার জিম্মায়। তিনি যেমন স্ত্রী তেমনি আবার কাস্টডিয়ান। জল ফুটিয়ে না

BanglaBook.org

দিলে পেটের ব্যামো হবে। স্নানের জলের উষ্ণতা ঠিক না করে দিলে রাতে অ্যাজমার টান বাড়বে, বাতের ব্যথায় কোমর নাড়াতে পারবেন না। ঠিক সময়ে হাত চেপে না ধরলে অ্যায়সা খাওয়া খেয়ে বসবেন তারপর তিনদিন নিম্বুপানি।

হোয়াইট সায়েবদের শরীর স্বাস্থ্য অনেক ভালো। তাঁরা স্বচ্ছন্দে যে কোনও আয়তনের স্ত্রীকে পাঁজাকোলা করে তুলে বাথটাবে চোবাতে পারেন, লনড্রোম্যাটে ঠেসে ধরতে পারেন, চিমনি দিয়ে ঠেলে ওপর দিকে তুলে দিতে পারেন। এদেশের একটাই ভালো দিক, ফিজিক্যাল টরচারের চেয়ে মেণ্টাল টরচারটাই চলে বেশি। কাটা কাটা জ্বালা ধরান বাক্যবাণ। শাশুড়ী পুত্রবধূকে, বধূ শাশুড়ীকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে। ননদে, জায়ে। বউয়ে বউয়ে। এই পরিবেশেই সব হয়ে চলেছে। ছেলেমেয়েরা লেখা পড়া করছে, সময়ে স্কুলে যাচ্ছে, ফিরে এসে টিফিন পাচ্ছে। রেডিও চলছে টি·ভি· চলছে। আত্মীয় স্বজন আসা যাওয়া করছেন। উৎসব হচ্ছে। সেজেগুজে উৎসবে যাওয়া হচ্ছে। সবই হচ্ছে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে বসে। কেউ বলতে পারবে না, আঃ বেশ সুখে আছি। আবার বলাও যাবে না, ভীষণ দুঃখে আছি। ওই জন্যে কেউ প্রশ্ন করলে, এদেশের প্রথাগত উত্তর, একরকম চলে যাচ্ছে। জাওলা মাছের মত অপরিসর মনের জলে খলবল করা। ফেটে যায়, খুলে পড়ে যায় না।

সম্প্রতি জানা গেল, আমেরিকার অবস্থাও শোচনীয়। ওয়াইফ বিটিং আর ওয়াইফ সোয়াপিং আমেরিকানের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাঁরা সবাই শিক্ষিত, উচ্চ পদাভিষিক্ত, বুদ্ধিজীবী। আমেরিকান মহিলারাও সুখ্যাতা। স্বামীজী নিজেই বলেছেন, 'আমেরিকান মহিলাদের কোনও তুলনা হয় না। এদের মেয়ে দেখিয়া আমার আক্কেলগুড়ুম ! আমাকে বাচ্চাটির মত ঘাটে মাঠে, দোকানে হাটে লইয়া যায়। সব কাজ করে—আমি তাহার সিকির সিকিও করিতে পারি না। ইহারা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, ইহারা সাক্ষাৎ জগদম্বা।' সেই আমেরিকায় পুরুষরা মহিলাদের কারণে অকারণে নির্যাতন করছেন। একটি অ্যাসোসিয়েসান স্থাপিত হয়েছে। স্বামীর ভয়ে অনেকে বাড়ি ছেড়ে সেই আশ্রমে এসে আশ্রয় নিচ্ছেন। এমন হবার কারণ ? প্রোফেসানাল টেনসান। জীবিকার চাপে আমেরিকানরা ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ধরে পেটাচ্ছেন, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, ঘর ভাঙছেন। কিছু করার নেই।

প্রাচীন ভারতের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, জীবন যখন যন্ত্র সভ্যতায় কাতর হয়ে পড়েনি, প্রাচুর্য ছিল, বিশ্বাস ছিল, সেই কালেও পুরুষরা স্ত্রীদের নানাভাবে পীড়ন করতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে সেকালের পুরুষের পরিষ্কার একটি চিত্র বেরিয়ে আসে

স্বামী স্ত্রীকে যে ভাষায় তিরস্কার করতে পারতেন, তা হল, হে অর্ধ্ব নগ্নে, হে

সম্পূর্ণ নগ্নে, হে অঙ্গহীনে, হে পিতৃরহিতে, হে মাতৃরহিতে। এই তিরস্কারে স্ত্রীর মতিগতির পরিবর্তন না হলে, গাছের ডাল দিয়ে, দড়ির ছপটি দিয়ে অথবা হাত দিয়ে প্রহার করা চলবে। কিন্তু মাত্র তিনবার। রাগের মাথায় ভাষায় বা প্রহারে মাত্রা ছাড়ালেই, বিধান ছিল স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে পেটাতে পারবেন। অবশ্য অর্ধমাত্রায়, মানে দেড় ঘা।

সেকালের পুরুষ একালের মতই মদ্যপ পরস্ত্রীগামী, ব্যভিচারী ছিলেন। স্ত্রীকে আঁচড়াতেন, কামড়াতেন। এইসব অপরাধ ছিল দণ্ডনীয়।

বিজ্ঞান এগিয়েছে, প্রযুক্তি এগিয়েছে, মানুষ কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই ভুড়ভুড়ি কাটছে।

প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম

সে যুগের মানুষ কত বিশাল মাপের ছিল এই কাহিনী থেকে বোঝা যাবে। দেহের মাপে নয়, মনের মাপে।

আমার এক আত্মীয়ের বিবাহ হবে। সে যুগের বিচারে অবশ্যই তিনি একজন বিশাল মানুষ ছিলেন। বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার। পাত্র হিসাবে যথেষ্ট দামী। এ যুগের মত 'সেলে' তুললে কম সে কম পঞ্চাশ হাজারে বিকোতেন। একটা গাড়ি, কি একটা বাড়ি শ্বশুরমশাইয়ের কাছ থেকে যৌতুক হিসেবে পাওয়াটা অসম্ভব হত না। মেয়ে অসুন্দরী হলে আরও কি যে দাবি করা যেত পাত্রপক্ষই জানবেন ভালো। এখন তো ফোর ফিগার ড্র করলেই পাত্রের পিতা গোঁফে চাড়া মেরে হাঁকতে থাকেন, ফ্রিজ লে আও, টিভি বোলাও, বিশ ভরি সোনার কমে আমি নেগোসিয়েসান ওপনই করব না। নগদের পরিমাণ শুনে পাত্রীর মা দাঁত কিড়মিড় করে, অনেক দুঃখে বলে ওঠেন, 'এ পোড়া দেশে কেন জন্মালি মুখপুড়ী।' এক পাত্রীর পিতার বুকে একটা 'পেসমেকার' বসান ছিল। নগদের টাকা যখন কিছুতেই জোগাড় হয় না, তখন প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বেচার মত আর তো কিছুই নেই, তোমারা বরং আমার বুক থেকে এটা খুলে নিয়ে বেচে দাও। নতুনের দাম হাজার এগারো, মাসখানেকও হয়নি। চেষ্টা করলে হাজার আটেক তো পাবেই। মরতে তো একদিন হবেই, মেয়েটার বিয়ে হোক। সেই মেয়ের কাছে অবশ্য নিজের বিয়ের চেয়ে পিতার জীবন অনেক বেশি মূল্যবান মনে হয়েছিল।

এখনকার কালে ছেলে আর মেয়ে বহু ক্ষেত্রেই নিজেরা যোগাযোগ করে বিয়ে করেন। সেই যোগাযোগের বিয়ে আবার দু ভাবে হয় অভিভাবকদের অমতে

দু'জনেই ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে চলে যান। সাক্ষী সাবুদ, সই, সংসার। আর একটি, ভাবে বড়ই বিভাব। ছেলে প্রথমে খেলাতে থাকেন। মাছ যেই চারে এলো, পুকুরপাড়ে অভিভাবককে এনে দাঁড় করালেন। তিনি এবার একটু একটু করে খেলান, আবার ফেলেন। প্রেমের পাখি তো আর বিনা দানাপানিতে শ্বশুরবাড়ির দাঁড়ে বসে গান শোনাতে পারে না। সোনার শিকলি চাই। মেয়ে তখন প্রেমে আচারের মত জরজর। মেয়ে শ্বশুরমশাইয়ের প্রতিনিধি হয়ে নিজের পিতা, কি বড় ভাইয়ের গলায় গামছা দিয়ে প্যাঁচ মারতে থাকে। তখন ঘরের শত্রু বিভীষণ। চুল চেরা হিসেব শুরু হল। দিদির বিয়েতে তোমরা কি করেছিলে মনে নেই! পিতার অবর্তমানে, দাদাকেই হয় তো বলে বসল, যা বাবা রেখে গেছেন তার হিসেব দাও। এ যুগের ছেলেমেয়েরা আর একটি অশালীন কথা শিখেছে, তবে জন্ম দিয়েছিলে কেন? এই সব কথা আধুনিক সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে এসেছে। আমরা প্রগতিশীল হয়েছি। আমাদের লড়াই এখন এশট্যাবলিশমেন্টের সঙ্গে। বাপ্ হুয়া তো কেয়া হুয়া। এখনকার গান, প্রেম করেছি, বেশ করেছি, করবই তো। এই গানটা আগে খুব শোনা যেত, ইদানীং প্রচার একটু কমেছে। সে সময় কত মানুষ যে উত্তরপুরুষের এই সোচ্চার ঘোষণায় গৃহত্যাগী হয়েছিলেন? পার্কে বসে পরস্পরে পরস্পরকে বলছেন, 'শুনেছন মশাই, শুনছেন, কোনও কালে এমন শুনেছেন, লজ্জায় কান লাল হয়ে উঠছে।'

'একটু অপেক্ষা করুন, শুনতে পাবেন, এর জবাব, ছি, ছি লজ্জা, মরে যাই হায়, এ কি লজ্জা।'

এই সব দেনা পাওনার কথা বলারও একটা আর্ট আছে। আর্টিস্টিক কশাইবৃত্তি। কিছু কিছু শোনার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। পাত্রপক্ষ ভীষণ উদার, প্রগতিশীল। আরে মশাই, ছেলেদের কি আমি বিয়ের হাটে বেচতে এসেছি! বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছি, একটা ফার্দিংও আমি নিই নি। অ্যাম আই এ বুচার। যা প্রাণ চায় তাই দেবেন। কিছু না পারলে স্রেফ শাঁখা আর সিঁদুর। তবে!

এই 'তবে'-টি এমন সম্ভাবনাপূর্ণ-বজ্রগর্ভ মেঘের মত। তবে, আপনারও তো একটা প্রেসটিজ আছে? আপনাকে কখনই আমি ছোট হতে দেব না বেয়াই মশাই। আপনার মেয়ে যেন কোনও সময়ে ভাবতে না পারে, বাবা, আমাকে ফাঁকি মেরেছে। মেয়েকে সাজিয়ে সালঙ্কারা করে পাঠাতে ইচ্ছে হলে, তাই পাঠাবেন। শাঁখা আর সিঁদুরে পাচার করতে ইচ্ছে হলে তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি গামছা নিঙড়ে মাল বের করতে চাই না। দ্যাট ইজ নট মাই প্রিনসিপল। তবে!

তবে ছেলের বন্ধুরা যখন বলবে দেখি ঘড়িটা শ্বশুরমশাই কেমন দিলেন!

pathagar.net

তখন সে যদি মুখ চুন করে বলে, এই দ্যাখ ভাই তিনশো টাকার একটা মাল ছেড়েছে, তখন অপমান তার নয়, অপমান আপনার। কন্যাদায় বলে বটে, ইচ্ছে করলেই দায়টাকে আনন্দ করে তোলা যায়। কন্যানন্দ। মাথা উঁচু করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। মেয়ের একবারই বিয়ে দেবেন! প্রাণ খুলে দেবেন। মনে হবে যেন কোষ্ঠ সাফ্ হল।

আজ্ঞে, মেয়ে তো একটি নয় বেয়াইমশাই, মাথায় মাথায় তিনটি।

দ্যাটস্ নট মাই ফল্ট। প্রথমটির পরই আপনার হল্ট করা উচিত ছিল। মার্চ করার সময় মনে ছিল না, আবার, আবার, সেই কামান গর্জন! আপনি আমার ছেলের বাজার দর জানেন। ইচ্ছে করলে, আমরা কি কি চাইতে পারি শুনবেন? আহা, চাইছি না, শুধু শুনে যান।

টিভি, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট নয়, কালার। ছেলে আমার কালারফুল। ফ্রিজ, এ নেসাসিটি। স্কুটার ইজ মবিলিটি। আপনারই মেয়েকে পেছনে চাপিয়ে আপনারই বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি খেতে যাবে। অ্যাট লিস্ট বিশ ভরি সোনা। সোনা হল সিকিউরিটি। মানুষের জীবনে কত রকম বিপদ আপদ আছে। শুধু প্রেজেন্ট দেখলে হয়, ফিউচারটাও ত দেখতে হবে। সাধে বলে সোনার সংসার! একটা স্টিল-লকার উইথ এ সিক্রেট চেম্বার। আমরা নিজেরা তো একেবারে হা-ঘরে নই। আত্মীয়স্বজন অনেক। চল্লিশখানা প্রণামী। ওর মধ্যে একটা গরদ।

মেয়ের বাবা ফিরে এসে মেয়ের মাকে বললেন, কর্তার আমার দয়ার শরীর, ঝুলোঝুলি করে প্রণামী তিনখানা কমিয়েছি হে!

চোরা না শোনে ধর্মের বাণী

সে যুগে মানুষের মন কত বড় ছিল, সেই কথা বলতে গিয়ে পণ-প্রথার কথা এসে পড়েছিল। পণপ্রথাবিরোধী কোনও আন্দোলনে নামার ইচ্ছে আমার নেই। তা ছাড়া একক আন্দোলন তেমন জোরদার হয় না। তাছাড়া, আন্দোলন করে বাইরে থেকে মানুষের মন পালটান যায় না। মানসিক পরিবর্তন আসে মানুষের ভেতর থেকে। একটা কথা ভাবতে খারাপ লাগে, হিন্দু সমাজে স্ত্রীর সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এমন একটা শারীরিক, আত্মিক বন্ধন, যে বন্ধন পৃথিবীর আর কারুর সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে না। একটা বয়েসে স্ত্রীর চেয়ে আপনার আর কেউ থাকে না। দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী। আটচালায় রাখলে আটচালায়, ইমারতে রাখলে ইমারতে। মাল খেয়ে পাঁক মেখে স্বামী মাঝরাতে

pathagar.net

গড়াতে গড়াতে বড়ি ফিরলেন। সবাই ঝ্যাঁটা পেটার জন্য প্রস্তুত, সেই বীরপুঙ্গবকে সাফা করে ঘরে তুললেন স্ত্রী। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সাপ্তাহিক দর্শনীর দিনে ব্রাত্যজনের কাছে কেউ আসেনি, এসেছে তাঁর স্ত্রী। ছেঁড়া, আধময়লা শাড়ি। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করছে, কেমন আছ ? খুব কষ্ট দিচ্ছে না ত ! স্বামী যেমনই হোক, স্বামীর মৃত্যুর পর আজীবন কষ্ট করতে হবে স্ত্রীকে। একেবারে শুদ্ধ ব্রতচারিণীর জীবন।

রামকৃষ্ণের জন্য যখন পাত্রী খোঁজা হচ্ছে, তখন তিনি বললেন, কোথায় খুঁজছ। জয়রামবাটিতে যাও, সেখানে আমার স্ত্রী কুটো বাঁধা আছে। যেন জন্ম-জন্মান্তরের ব্যাপার !

সেই স্ত্রীকে, সেই উৎপাটিত শিকড় একটি মেয়েকে, সামান্য দেনাপাওনার জন্য শিক্ষিত মানুষ যখন আগুনে পোড়ায়, দড়িতে ঝোলায়, বারান্দা থেকে ঠেলে ফেলে দেয়, তখন অবাক লাগে। এই হল মানুষ।

মানুষের নিষ্ঠুরতা প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে নিৎসের একটি উক্তি, নিষ্ঠুরতা থেকেই মানবতার জন্ম। inhuman may even be the fertile soil out of which alone all humanity can grow in impulse, deed and work.

প্রাচীন পৃথিবীতে গ্রীকরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি মানবিক গুণসম্পন্ন

পরিশীলিত এক জাতি। অথচ ইতিহাসে তাদের নিষ্ঠুরতারও কোনও তুলনা ছিল না। বাঘের মত হিংস্র। আলোকজাণ্ডারের কথাই ধরা যাক। কত বড় বীর। ছাত্রজীবনে, তাঁকে কেন মহামতি বলা হয়, সেই ফিরিস্তি মুখস্থ করতে করতে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যেত। সেই মহামতি কি করলেন ? গাজার সাহসী যোদ্ধা, যিনি নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে লড়লেন, সেই বীর বাতিসের, পা ছেঁদা করে ফুটোয় দড়ি পরিয়ে নিজের রথের সঙ্গে বেঁধে ঘষড়াতে ঘষড়াতে নিয়ে চললেন। এ যেন আশিলের অনুকরণ। যিনি সারা রাত হেক্টরের মৃতদেহকে অপমানে জর্জর করলেন। মৃত্যুতেও যিনি নিষ্কৃতি পেলেন না। মানুষে আর প্রকৃতিতে কোন তফাৎ নেই। এই বসন্তের বাতাস, এই ঘূর্ণিঝড়।

দর্শন কপচে লাভ নেই। জীবন দর্শন এক এক জনের এক এক রকম। সেই শ্যামলা মেয়েটির গল্প বলে শেষ করি। সে যুগের ছেলেরা যথেষ্ট অভিভাবক নির্ভর ছিলেন। মেয়ের মুখচোখ ভাল, গাত্রবর্ণটি একটু চাপা। ছেলে বাঘা ইঞ্জিনিয়ার। সাফল্যের মই বেয়ে বহুদূর উঠবে কোনও সন্দেহ নেই। মেয়ে পছন্দ হল না। না হবারই কথা। মেয়ের এটি সপ্তম ইন্টারভিউ। মেয়েও পিতৃহীন, ছেলেও তাই। দু তরফের কথা হবে মায়েতে মায়েতে।

মেয়ের দাদাকে একজন পরামর্শ দিলেন, তুমি ছেলের মাকে ধরে পড়। মহিলার হৃদয়টি বিশাল। আর ছেলে ! মায়ের কথাকে বেদবাক্য বলে মনে করে।

সেই বিয়ে হল। ছেলের মা বললেন, মেয়েটির করুণ মুখ দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। বাইরের রঙ দেখে কি হবে ? ভেতরের রঙটাই আসল রঙ।

সেই দম্পতি আমার ধারণা, পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দম্পতি। সারা পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এখন নাইরোবীতে প্রবাসী।

এমন ঘটনা এখনও হয় ত ঘটে ! পৃথিবীর সব উদার মানুষ যদি এককালে উবে যেতেন তা হলে পৃথিবী অচল হয়ে যেত। মাঝরাতে পাল পাল কুকুর যেরকম পাড়ায় পাড়ায় কেঁউ কেঁউ করে ঘুম চটকে দেয়, ঠিক সেই রকম মহল্লায় মহল্লায় দিবারাত্র মানুষ নামক প্রাণী খেয়োখেয়ি করে মরত। সে অবস্থা এখনও আসেনি কারণ, এখনও কিছু মানুষ তলানি হয়ে পড়ে আছেন। যাঁদের মধ্যে হৃদয় আছে, মানবিক বৃত্তিসমূহ বেঁচে আছে। যাঁরা এখনও মানুষের দুঃখে বেদনা অনুভব করেন, সুখে সুখী হন। যাঁরা মানুষকে বাইরে না খুঁজে ভেতরে খোঁজেন। যাঁরা মহাপুরুষের পথ অনুসরণের বোকামিতে কোণঠাসা হতে হতে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী হতে চলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের মানুষকে বারবার বলেছিলেন, নারীজাতির আসন

যে দেশে সম্মানের নয় অবহেলার, সে দেশের অসীম দুর্ভাগ্য। হে ভারত! ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ!

ভারত স্বামীজীকেই ভুলে গেল। এরপর কোন দিন হয় তো প্রশ্ন শুনতে হবে—হু ওয়াজ ভিভেকানন্দ, ইয়ার? ওয়ো কোন থা ডার্লিং!

নিৎসেকে দিয়েই শেষ করি। শিক্ষিতা, আধুনিকাদের উদ্দেশ করেই বলে গেছেন, যা-ই করো মালক্ষ্মীরা, একটি কথা ভুলো না— marraige, according to its highest conception as a friendship between the souls of two human being of different sex এবং শেষ কথা, একটা দেশি প্রবাদ চোরা না শোনে ধর্মের বাণী।

কোথা হতে হইয়াছে কোথায় পতন!

আমাদের ভালো দিক কোনটা আমার জানা নেই। নিশ্চয়ই প্লাস পয়েন্ট অবশ্যই কিছু আছে, তা না হলে আমাদের এত অহঙ্কার আসে কোথা থেকে? কিসের অহঙ্কার? প্রশ্ন আছে উত্তর নেই। আমাদের কালচার, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের অতীত। বরোড গ্লোরি, ধার করা মালা পরে এতকাল বেশ চলছিল, বনগাঁয়ে শেয়াল রাজার মত। এখন আর হালে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। লাট বাগানের সব গাছ শুকিয়ে গেছে। জমিতে আর তেমন সার নেই, বীজেরও তেমন জোর নেই। মহীরুহ হবার ক্ষমতা নেই। খেঁকুরে গাছে বাগানের শোভা আর তেমন খুলছে না।

আজ থেকে প্রায় বিরাশি বছর আগে (১৮ জানুয়ারী, ১৯০০), ক্যালিফোর্নিয়ার, পাসাডেনায় শেকসপিয়ার ক্লাবে স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকান মহিলারা অনুরোধ করেছিলেন, স্বামীজী আপনার দেশের মেয়েদের কথা আমাদের বলুন।

স্বামীজী বলেছিলেন, আমি সন্ন্যাসী, মহিলা সম্পর্কে আমার জ্ঞান একভাবে একেবারেই নেই। ধর্মপ্রচারক হিসেবে আমি সারা ভারত ঘুরেছি, বহু বর্ণের, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী রমণীদের জীবনচর্যা দেখার সুযোগও আমার হয়েছে, তবু আমি বলতে পারব না, ভারতীয় রমণীর সব কিছু আমি জানি। কারণ আমি সন্ন্যাসী। আমি যে সঙ্ঘের সন্ন্যাসী তারা কখনও রমণীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে না। সেই কারণে আমি আপনাদের ভারতীয় নারীর আদর্শের কথাই বলব।

The ideal woman in India is the mother, the mother first, and the mother last.

শয্যাসঙ্গিনী নন, মাতৃত্বেই তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ। পাশ্চাত্যে নারীর স্ত্রী-রূপ, প্রাচ্যে নারীর মাতৃরূপ। পশ্চিমী সংসার শাসন করেন স্ত্রী। ভারতীয় সংসার মাথায় করে রাখেন মা। আপনাদের সংসারে স্ত্রী আগে মা পরে। ভারতীয় সংসারে মা আগে স্ত্রী পরে।

স্বামীজী তার পরেই প্রশ্ন করলেন, আপনারা যদি বলেন, ভারতীয় নারীতে স্ত্রী কোথায় ? সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রশ্ন করব, আমেরিকায় মা কোথায় ? কোথায় সেই মাতৃস্বরূপিনী পবিত্রা নারী, যিনি আমাকে আমার এই শরীর দান করেছিলেন। তিনি কে, যিনি আমাকে দীর্ঘ নটি মাস গর্ভে ধারণ করেছিলেন ! তিনি কোথায় যিনি আমার প্রয়োজনে বিশবার জীবন দিতে প্রস্তুত ! তিনি কোথায় সন্তানের প্রতি যাঁর ভালবাসা অকৃপণ ধারায় ঝরে পড়ে ! আমি দুর্বৃত্ত হতে পারি, উচ্ছন্নে যেতে পারি, তবু মাতার স্নেহে আমি বঞ্চিত হই না। সেই মা এদেশে কোথায় ! আমাদের ভক্তকবি রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন, কুপুত্র হয় অনেক গো মা, কুমাতা নয় কখনও। ভারতীয় মা আর এদেশের স্ত্রী, কোনও তুলনা চলে না। এদেশের অসহিষ্ণু স্ত্রী স্বামীর সামান্য দুর্ব্যবহারে আদালতে ছোটেন বিচ্ছেদ-মামলা ঠুকতে। সেই সর্বংসহা মা এদেশে কোথায় ! এদেশে সেই সন্তান কোথায়, যিনি মাকে স্থান দেন সবার ঊর্ধ্বে।

ছেলের স্ত্রী আসে মেয়ের মত হয়ে, নিজের মেয়ে চলে যায় অন্যের মেয়ে হয়ে। একজন যায় আর একজন আসে। বর্তমানের মা তৈরি করবেন ভবিষ্যতের মা। মা হলেন, কুইন অফ কুইনস। পুত্রবধূকে তাঁর শাসনে থাকতেই হবে।

স্বামীজী বললেন, আমি যদি বিবাহিত হতাম আর যদি দেখতাম, আমার স্ত্রী আমার মাথায় চড়ে আমার মাকে শাসন করার চেষ্টা করছে, সেই স্ত্রীর প্রতি আমার কোনও শ্রদ্ধা থাকত না। অপেক্ষা কর। তোমারও দিন আসবে। মায়ের ছায়ায় হেঁটে আসছেন স্ত্রী। তোমার নারীত্ব আগে পূর্ণতা পাক, পরিপূর্ণ নারী হয়ে ওঠো আগে, তুমি আগে মা হও, তারপর ত তুমি কর্তৃত্বে আসবে।

মা হওয়া কি মুখের কথা। স্বামীজী মনুর আদর্শের কথা তুললেন, প্রজনন মানে কামক্রিয়া নয়, যজ্ঞানুষ্ঠান—যোষারূপ অগ্নিতে বীর্যাহুতি। আমার পিতা আমার মাতা, বছরের পর বছর প্রার্থনা করেছেন, উপবাস করেছেন, একটি সু-সন্তানের জন্মের জন্য। মনু বলেছেন, যে সন্তানের জন্ম প্রার্থনায়, সেই হল আর্য। অপ্রার্থিত সন্তান অবৈধ। বিধিমত, বেদাধ্যয়ন করিয়া, ধর্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিবে।

এই প্রসঙ্গেই হঠাৎ হিটলারের কথা মনে পড়ছে। যুদ্ধবাজ, নৃশংস ইত্যাদি নানা অখ্যাতি তাঁর চরিত্রকে ম্লান করে দিলেও তিনি ছিলেন ইতিহাস পুরুষ।

তাঁর কিছু ভাল গুণও ছিল। তিনি ছিলেন উগ্র জাত্যাভিমানী। তিনি বলতেন, পৃথিবীতে জার্মানরাই প্রকৃত আর্য জাতি, 'পিওর রেস'। বাকি সব মিশ্রণ। নর-নারীর যৌনতা সম্পর্কে তাঁর কোনও কোনও উক্তিতে মনুর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বলেছিলেন, আধুনিক যৌনতার শ্বাসরোধকারী সুগন্ধ থেকে জনজীবনকে মুক্ত করতে হবে।

মেয়েদের বলেছিলেন, হেঁসেলে ফিরে যাও, আদর্শ মা হও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। এক ইংরেজ মহিলা-সাংবাদিক হিটলারকে ইন্টারভিউ করার অনুমতি পেলেন। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। বিশাল একটা ঘর। চারটে দেয়াল ধবধবে সাদা। এককোণে একটি টেবিল আর চেয়ার। রাগী রাগী চেহারার মানুষটি বসে আছেন। সেই ব্যক্তিত্বের সামনে মহিলা একটু ঘাবড়েই গেলেন। বেশি প্রশ্নেরও অবকাশ নেই। সংক্ষিপ্ত সময়। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, হের হিটলার! জার্মানীর মেয়েদের জন্যে আপনি কি করেছেন? হিটলার চাবুকের মত লাফিয়ে উঠলেন। খপ্ করে সাংবাদিকের হাত চেপে ধরলেন। টানতে টানতে নিয়ে গেলেন, ঘরের আর এক ধারের খোলা জানালার সামনে। উত্তেজিত গলায় বললেন, নিচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো?

বিশাল এক চত্বরে সুঠাম, ঋজুদেহ জার্মান যুবকরা, তালে তালে পা ফেলে নাজি কায়দায় মার্চ করছেন।

হিটলার বললেন, আমি এদেশে সেই মা তৈরি করেছি যারা এমন সন্তানের জন্ম দিতে পারে। এযুগের আমরা 'ফ্রি সেকস' বলে নর্তন কুর্দন করছি। মনু জীবিত থাকলে বলতেন, সে আবার কি, পর ক্ষেত্রে বীজবপন, সে তো ব্যাভিচার 'ফ্রিলাভ' মানে 'ওয়াইলড ওটস'। অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর/এক অন্ধ তমঃ অন্য উজ্জ্বল ভাস্কর

তামসিক সন্তানদল কেমন করে আদর্শ স্বামী হবেন! আদর্শ পিতা হবেন প্রশ্ন আছে উত্তর নেই।

pathagar.net

বিসর্জন একস্পার্ট

এক এক জাত এক এক ব্যাপারে একস্পার্ট। সুইজারল্যাণ্ড এক সময় সাংঘাতিক ভালো ঘড়ি তৈরি করতে পারত। জাপান ইলেকট্রনিকসের দেশ। সুইডেনের ইস্পাত। ফ্রানসের মদ, খুশবু। আমরা কিসে একস্পার্ট? বারোয়ারি পুজো আর বিসর্জনে। অ্যানি ড্যাম থিং আমাদের কাছে নিয়ে এসো, নাচতে নাচতে, গ্রামের লোককে নাচিয়ে ঝপাং করে জলে ফেলে দিয়ে আসবো। ও সব

কোনও রাত-বিরেত নেই, দিনক্ষণ নেই। লাজ-লজ্জা নেই, মানান বেমানান নেই। নীতি, রাজনীতি নেই। বিসর্জন তো গঠনমূলক কিছু ব্যাপার নয় ? মাচা থেকে উপড়ে ইটখোলার লরিতে তুলে, হে রে, রে রে করে মাইল কয়েক ঘুরে, ছুঁড়ে ফেলে দাও জলে। বাঁশ গেল, বাঁখারি গেল, খড় গেল, মাটি গেল, আর গেল অতি কষ্টে বেঁচে থাকা কিছু মানুষের পকেট কাটা টাকা।

বেদান্তের দেশ। মায়ার খেলায় আমরা কিছুতেই মাতব না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিত্য গীতা পাঠ করতেন। পট্ট বস্ত্র পরে কম্বলের আসনে বসে, বুক চিতিয়ে চণ্ডীপাঠ করতেন। দোল, দুর্গোৎসব করতেন। আবার মামলাও করতেন। ছেলেদের বলতেন, মহাপুরুষ যে পথে গেছেন, সেই পথে নিজের কীর্তির ধ্বজা তুলে এগিয়ে চলো। তাঁদেরই উত্তর পুরুষ আমরা। আমরা একটা কাজ অবশেষে করতে পেরেছি, সেটি হল ছাঁকনি দিয়ে জীবনধারা থেকে ধর্মের গাঁজলাটি তুলে ফেলে দিয়েছি। এই হল বিসর্জন নাম্বার ওয়ান।

আগে ছিল ঈশ্বর আর আমি। দ্বৈতবাদ। ভেজিটেবল স্যাণ্ডউইচ। মাঝে মায়ার আস্তরণ। এখন আমরা পুরোপুরি অদ্বৈতবাদী। ঈশ্বর আর আমি এক। যা খুশি তাই করতে পারি। বেপরোয়া। আমাদের লজ্জা নেই, ভয় নেই, ঘৃণা নেই। ঈশ্বর সৃষ্টিও করেন সংহারও করেন। আমরা শুধু সংহার করব। আমরা শিশু ঈশ্বর। ভাঙবো চুরবো, ফেলবো ছড়াবো, দাঁত খিঁচোবো, শিশুর খেয়ালে। রকে বসে থাকবো। মুখ দিয়ে লালা ঝরবে। আবোল তাবোল বকব। আঁচড়ে দেবো, খামচে দোবো। এ যেন শ্রীদাম সুদাম বলরামের বাল্য লীলা। ঈশ্বর স্বয়ম্ভু। তাঁর পিতাও নেই, মাতাও নেই। এক কথায় অরফ্যান। সুতরাং দেখার কেউ নেই। কান ধরে গালে দুই থাপ্পড় মেরে শিশু ঈশ্বরের পিতা কি মাতা বলবেন না, এই বাঁদর কি হচ্ছে ! অজ্ঞান, মায়াবাদী মানুষের চোখেই তো যত ভেদাভেদ। ঈশ্বরের চোখে তিনিও যা, মানুষও তাই, বাঁদরও তাই। বহুরূপে সম্মুখে তোমার।

বালক ঈশ্বরের বাল্য লীলার এই দেশ। বুড়ো বখাটেদের অসহ্য মনে হলে কিছু করার নেই। কালচার, রিলিজান, প্রগরেস, সদাচার, কদাচার এ সব হল মায়াবদ্ধ মূঢ় মানবের কথা। দেবতার কাছে ওর কোনও অর্থ নেই। অর্থনীতি কি বস্তু ? মানুষের ছাপা ফালিফালি কিছু কাগজ, যার নাম টাকা। গদীর তলায় চেপে রাখলে কালো। হিসেবের স্রোতে ভেসে থাকলে সাদা। টাকায় কি হয়। মানুষের অবস্থা ফিরে যায়, গাড়ি হয়, বাড়ি হয়, মুরগীর ঠ্যাং হয়। পেস্তা হয়, বাদাম হয়, চেহারায় চেকনাই হয়। কোন্ চেহারা। সেই নশ্বর দেহ খাঁচা। যা একদিন যাবেই। আর পাঁচজন মানুষ যে তামাশাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ব্যালো হরি, ব্যালো হরি করতে করতে শ্মশান নামক অতি নোংরা একটি জায়গায় নিয়ে

pathagar.net

গিয়ে একপাঁজা কাঁচা কাঠের ওপর চিৎ করে শুইয়ে, মুখে আগুন ঠুসে দেবে। কোন্ মুখ ? যে মুখ গজরাত, ধমকাত, তেল দিত, তাল দিত, আশা দিত, নিরাশ করত, ধাপ্‌পা দিত, মিথ্যে বলত, মেরে খেত, সেই মুখ-চন্দ্রে আগুন মেরে, নাচতে নাচতে ফিরে যাবে। ফিরে গিয়েই কর্তার রেখে যাওয়া মাল ভাগ করতে বসে, দাঙ্গা কাজিয়া শুরু করে দেবে। খুব বড়োসড়ো মানুষ মরলেও যা হয় ঈশ্বরের দেখা আছে। অতি কষ্টে, পথের ধারে নর্দমার পাশে বিকট একটি মূর্তি। নাম লেখা থাকে বলে চেনা যায়। নামটি মুছে দিলেই—পরশুরামের কারিয়া পিরিত। জন্ম দিনে,মই লাগিয়ে প্রথামত কেউ একজন উঠে গলায় একটা গাঁদার মালা ঝুলিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। সারা বছর মাথার চাঁদিতে কাক বসে গলা সাধে আর হোয়াইট ওয়াশ করে।

অর্থনীতি কি, ঈশ্বরের-মতিভ্রম মানুষ আজও ফয়সালা করতে পারল না। একাই মারবো, মেরে কিছুটা ওঁ প্রজায় স্বাহা বলে ছিটিয়ে দেবো, না সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোরাসে গলা সাধব, সোসালিজম, ক্যাপিটালিজম না তারই অজস্র অপভ্রংশ। কোনটা যে গ্রহণীয় তা আজও বোঝা গেল না। জমিদার গেলে, ব্যবসাদার আসে, ব্যবসাদার বসতে না বসতেই জোতদার ঠেল মারে, নৃত্য শুরু করে দেয় নেতার দল। রকে বসে বালক ঈশ্বর বহু খণ্ড হয়ে দেয়লা শুরু করে। পাশ দিয়ে যারা যায় তাদের লিঙ্গ সম্বোধন করে।

ঈশ্বর জানে, শিক্ষা মূঢ় মানবের ভ্রান্তিবিলাস। সে ইংলিশ মিডিয়ামেই হোক। আর বাংলাই হোক। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। সে সকলের ঘরে নয়। ঘর বাঁধা আছে। তার বাইরে মায়ের পা বাড়াবার উপায় নেই। মাঠে যতই ফসল ফলাও তোমার বরাত বিদুরের বরাত। র‍্যাশানের খুদ্‌কুঁড়ো। তোমাকে রামেও মারবে, রাবণেও মারবে। একস্‌পোর্ট, ইমপোর্ট যাই করনা কেন, ন্যাশনাল ইনকাম, আর পার ক্যাপিটা ইনকাম ন যযৌ ন তস্থৌ। একবার এ 'পাওয়ার' এসে পিঠ চাপড়াবে, একবার ও 'পাওয়ার'। আর মানুষ দিন দিন ভূতের বাচ্চার মত ফুটপাতের ধারে কিলবিল করবে। পথ্য সেই আদি অকৃত্রিম বক্তৃতা। শেয়ানাদের কথার মালা।

তাই আমরা সব ফেলে বিসর্জন একস্‌পার্ট। মানুষ মরছে মরুক। মৃত্যুও নেই জন্মও নেই। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, দৃষ্টিবিভ্রম। নিয়ে আয় জেনারেটর। তোল ঠ্যালায়। নিয়ে আয় চিৎপুর থেকে আলোর গেট, শুঁড়অলা গণেশ, আলোর কেয়ারি। ধরে আন পায়ে ফেটি বাঁধা, ক্লাউনের পোশাক পরা লিকলিকে ব্যাণ্ডপার্টি। পাকড়ে আন তাসা। মধ্যবিত্তের ঘর থেকে তুলে আন নিরীহ শিশুদের। পরীক্ষা-টরীক্ষা দ্যাখার দরকার নেই। ক্লাস এইট অবধি পাশ ফেল নেই। এরা পিপ পিপ করে বাঁশী বাজাবে। স্বাধীন দেশের শিশুদের স্বাস্থ্য দেখে

প্রাণ যেন কেঁদে না যায়। বিসর্জন মানে সব বিসর্জন। ধরে আন ঢাকি ঢুলি। বড়লোকের গাড়ি ম্যানেজ করে ছেড়ে দে অ্যাডভানস্ পার্টি—আমাদের অভিনন্দন। খবরদার, সাধারণ বুদ্ধি যেন প্রশ্ন না করে, কার অভিনন্দন, কিসের অভিনন্দন, কাকে অভিনন্দন। বিকৃত ব্যাণ্ড, ঢোলের তাণ্ডব, পিটার প্যানের বাঁশি, তাসার চটরপটর, বোমার বাহার, শিশু-যুবকদের পাছা নৃত্য। কে চলেছে, তাণ্ডবের আগে আগে। মা তুমি ? না রে বোকা ? তোদের ভবিষ্যৎ চলেছে নির্বোধের নাচ নেচে নেচে, অতলে। জানলা, দরজা বন্ধ করে দে, অন্য দেশের দিকে চোখ পড়ে গেলে মন খারাপ হয়ে যাবে। হয় ত বলেই ফেলবে—এ আবার কি ? আর তখনই দ্বৈত থেকে অদ্বৈত।

শব্দ ব্রহ্ম

আর এক পর্ব শেষ হোলো। ভিটেমাটি চাঁটি হোলো। স্টক এখনো পুরো শেষ হয়নি। ছুটকো ছাটকা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে ফুটফাট্, ভুটভাট্ করবে। আকাশে মাঝে মাঝে ছাঁকা তেলে বেগুন ভাজার মত কিম্বা সুন্দরীর একান্তে নাকঝাড়ার মত শব্দ উঠবে।

বিপ্লববাবু এক সময় পারিবারিক জীবনে অনেক বিপ্লব করেছেন। সাবালক ছেলের বেয়াদপি দেখে কান ধরে চড় কষিয়েছেন। মেয়ে বাথরুমে গুনগুন করে প্রেমের গান গেয়েছিল বলে চুল কেটে মোক্ষদা বামুনীর মত করে দিয়েছিলেন। পাশের-বাড়ি বাড়ির সামনে ছাই ফেলেছিল বলে কোদাল দিয়ে তুলে সব ফেরত দিয়ে এসেছিলেন। এখন তিনি বড়ই কাতর। মাধ্যাকর্ষণে হৃদয়টি বৃহৎ হয়ে ঝুলে পড়েছে। সদা বুক ধড়ফড়। উত্তেজনায় কাতর হয়ে পড়েন। তাঁকে লেপ কম্বল কাঁথা, পাশবালিশ, মাথার বালিশ দিয়ে চাপা রাখা হয়েছিল। শব্দ ব্রহ্ম থেকে দূরে রাখার চেষ্টা। কর্তা ব্রহ্মে লীন হয়ে গেলে হস্তে হারিকেন।

তিনি এখন টনখানেক চাপার তলা থেকে মুখটি বের করে মেনি বেড়ালের মত মিউ মিউ করে জিজ্ঞেস করছেন—অল ক্লিয়ার ? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি শেষ হয়েছে ?

পুত্রবধূর উত্তর, প্রায় শেষ। এনিমি পিছু হটতে শুরু করেছে। দূর থেকে দু চারটে ফুটফাট ভেসে আসছে। নেতাইবাবু মুদিখানার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বাজারের ব্যাগ নাচাতে নাচাতে বলছেন, ক্যানিং স্ট্রিট থেকে আড়াইশো টাকার বাজি কিনেছিলুম। আমার ছেলে এখনও সব শেষ করতে পারেনি। রাত একটার সময় বললুম, আজ ছেড়ে দে। আফ্টার অল উই আর সোস্যাল

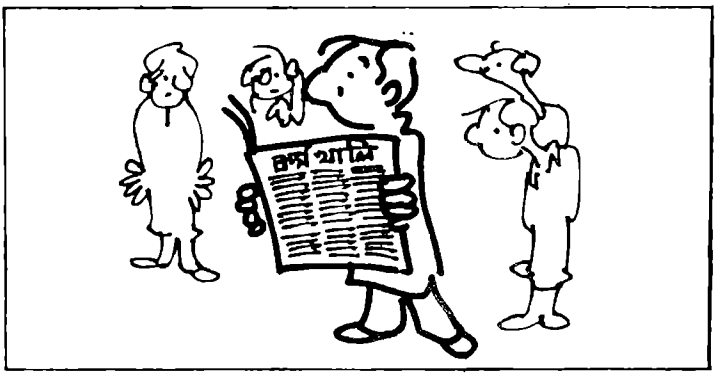

অ্যানিম্যাল। পাঁচজনের কথা ভাবা উচিত। পাড়া প্রতিবেশীকে ঘুমোতে দে। একটু পরেই সে ফিল্ডে নামছে। চমচম দিয়ে স্টার্ট, দোদমা দিয়ে ফিনিশ। খাই না খাই, এ সব ব্যাপারে আমি ভীষণ লিবার‍্যাল।

আপনার ছেলেটি কি করে ?

ছাত্র।

কখন পড়ে ?

যখনই সময় পায়।

শুনলুম একই ক্লাসে স্ট্যাণ্ড স্টিল হয়ে আছে।

সেটা কিছু নয়। নর্দমাও তো মাঝে মাঝে চোকড্ হয়ে যায়। ফ্লাশিং-এ বেরিয়ে যাবে।

ক্যানিং স্ট্রিটে বাজি কিনতে গিয়েছিলেন প্রদীপবাবু। ঘণ্টাতিনেক ধস্তাধস্তি। চশমা গেছে। পার্সটিও হাওয়া। বৃহৎযজ্ঞে ওরকম ছোটোখাটো ব্যাপার হয়েই থাকে। গলায় তিনপাট মাফলার জড়িয়ে সাড়ে ছটায় ছাতে উঠেছিলেন সপার্ষদ। উৎসাহ আর ভয় দুটোই আছে। ছাতের আলসেতে নিবু নিবু মোমবাতি। হাতে হাতদশেক লম্বা লগবগে প্যাঁকাটি, এক গাঁট্টা চকোলেট বোমা আলসেতে শুঁড় বের করে আছে। প্যাঁকাটির খোঁচা খেয়ে বাতি হয় নিবে যায়, না হয় উলটে পড়ে যায়। ডগাটি যদিও বা জ্বলে, বাতির শুঁড়ের কাছাকাছি আসার আগেই নিবে যায়। আগুন পলতে ছোঁবার আগেই চিৎকার, সাবধান, মালা সরে আয়, পুলু পালিয়ে আয়। রাত দশটা পর্যন্ত কর্তার চিৎকার, শব্দের ধুন্দুমার। নিচে নেমেই তিন চরণ হাঁচি। হোল ফ্যামিলিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে। ফুটবাথ, হটওয়াটার ব্যাগ।

শব্দ ছাড়া আজকাল উৎসব হয় না। নেশায় যেমন স্তর আছে, শব্দেরও তেমনি গ্রাম আছে। মদ থেকে মরফিন, মরফিন থেকে সাপের ছোবল। আগে ছিল ধানি পটকা। বড়দার ধমকের মত ভ্যাট্ করে উঠত। বৈঠকখানাতেও ফাটানো যেত। ধানির ওপরে লঙ্কা। লাল টুকটুকে। পলতেটি সামান্য বড়ো। বড় দারোগার ধমকের মত শব্দ। তেমন অসহ্য নয়। সহনীয় ডেসিব্‌ল। শব্দের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে হতে পটকা এখন মাস্তানীর শেষ সীমায়। সবই যখন বাড়ছে শব্দ তো বাড়বেই।

প্রতিদিন যা ঘটে চলেছে, সে চমক যথেষ্ট নয়! আরো চমক চাই। বাঙালীর পিলে চমকে দে, ব্রহ্মতালুতে ক্র্যাক ধরিয়ে দে। ছাত ফাটলে কি যেন লাগায়। দোকানে দোকানে বিজ্ঞাপন ঝোলে। এবার হয় তো ব্রহ্মতালুর পুলটিস বেরোবে।

পিপীলিকা খেয়ে যে প্রাণী বাঁচে তাকে বলে পিপীলিকাভূক। শব্দ খেয়ে যারা বাঁচে তারা হল শব্দভূক। শব্দভূক বাঙালীর কান যেন আর ভরে না। আস্তে, নিচু গলায় কথা বলার অভ্যাস প্রায় চলেই গেছে। অনেক কাল আগে থানার সামনে দিয়ে যেতে যেতে বড় দারোগার ফোন করা দেখেছিলুম ও শুনেছিলুম। হৃষ্টপুষ্ট বিপুল চেহারার ইউনিফর্ম পরা এক ব্যক্তি জুতো পরা ডান পা চেয়ারে তুলে বাঁ পায়ে দাঁড়িয়ে। ডান হাতের কনুই ডান উরুতে। হাতে রিসিভার। যেন মাস্তানের লিকলিকে ঘাড়। চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছেন—ধরেছিস! ব্যাটাকে রুলের গোঁত্তা মারতে মারতে নিয়ে আয়। যাকে বলছেন সে একই সঙ্গে বড় দারোগার কণ্ঠস্বর দুবার শুনছে। একটা আসছে তারের ভেতর দিয়ে আর একটা আসছে বাতাসে ভেসে। রিসিভার ফেলে এমনি চিৎকার করলেই শোনা যাবে।

একালের আমরা, সবাই প্রায় ষাঁড়ের গলায় কথা বলি। কেন বলি? প্রচণ্ড শব্দে সকলেই প্রায় কালা হয়ে যেতে বসেছি। জাতীয় পরিকল্পনা হল, হাবা, বোবা, কালা করে ছেড়ে দাও। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দ্যাখা করতে গেছি। ভদ্রলোক আসুন আসুন বলে এমন অভ্যর্থনা করলেন, রাস্তার একটা কুকুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে ন্যাজ গুটিয়ে ভয়ে ভয়ে পালাল। বাইরের ঘরে বসে আছি, ভদ্রলোকের স্ত্রী পর্দা সরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চা খাবে। কানে বাসের টিকিটের খড়কে কাঠি দিচ্ছিলুম। চমকে খোঁচা লেগে গেল। ভদ্রলোক সপ্তগ্রামে বললেন, হ্যাঁ খাবো। যেন দুটো লাউড স্পিকারে কথা হচ্ছে।

মিশনারীরা যখন বলেছিলেন, Humanity in its worst form is Hinduism. তখন আমরা রাগে নৃত্য করেছিলুম। আর আজ! শৃগালের হা হা রব। বোমার কমা, ফুলস্টপ।

মদনানন্দ

উঠতি বয়েসের মেয়েরা যে সব বাড়িতে রয়েছে সেই সব বাড়ির বাপ-মায়েরা কি সুখে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরাই জানেন। আমাদের চারপাশে হায়নার উপদ্রব বড় বেড়েছে।

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে এমনই একদিনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে দুই মহাপুরুষে কথপোকথন হচ্ছে।

নরেন্দ্র আজকাল ছোকরারা কেমন দেখছেন ?

মাস্টার মন্দ নয়, তবে ধর্মোপদেশ কিছু হয় না।

নরেন্দ্র আমি নিজে যা দেখছি, তাতে বোধহয়, সব অধঃপাতে যাচ্ছে। বার্ডসাই, ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুলপালানো, এ সব সর্বদা দেখা যায়। এমন কি দেখেছি যে কুস্থানেও যায়।

মাস্টার যখন পড়াশুনা করিতাম, আমরা তো এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই।

নরেন্দ্র আপনি বোধহয় ততো মিশতেন না। এমন দেখেছি যে খারাপ লোকে নাম ধ'রে ডাকে কখন আলাপ করছে কে জানে।

মাস্টার কি আশ্চর্য

নরেন্দ্র আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেরা এ সব বিষয় দেখেন ত ভাল হয়।

সেদিন এই আলোচনা আর বেশি দূর এগোয় নি। ঠাকুর এসে দাবড়ানি দিয়েছিলেন, 'এ সব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়। তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না।'

তাঁরা এখন পরব্রহ্মে। পড়ে আছি আমরা। তলে তলে একশোটা বছর চলে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে জল ঘোলা করতে সেদিন বারণ করেছিলেন, সেই জলে এখন কুমির কামট থিক থিক করছে। পা দিয়েছ কি মরেছ। অতএব ঈশ্বর ভরসা। স্বামীজী আবার ফিরে এলে বলতেন, ভাই সব, অরণ্যেরোদন করে গেছি। যা যা বলেছি, সব উইথড্র করে নিচ্ছি। ভয়ে নয়, ঘৃণায়। তোমরা আমার লাশ ফেলতে পারবে না। আমার বিকৃত মূর্তির খুশুটা অবশ্য ওড়াতে পারো। তাতে আমি খুশিই হবো। তোমাদের মাঝখানে স্মৃতি হয়ে গেড়ে বসে থাকতে চাই না। কাকবিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। আমার অনেক স্বপ্ন ছিল তোমরা যে বাস্তব তৈরি করেছ, তা আমার দুঃস্বপ্নকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ব্র্যাভো বাঙালী এই গতিতে যদি এগোতে পারো তা হলে আর শখানেক বছরেই অস্ট্রালোপিথেসাস থেকে র‍্যামাপিথেসাস, তারপরেই চতুষ্পদ। বৃক্ষকাণ্ডে

সুখে বসবাস। লাঙুল আস্ফালন। কদলি ভক্ষণ। দন্ত বিমোচন, আর শুধুই প্রজনন। একেন্দ্রিয় প্রাণী।

সব কালে সব দেশেই একটা কথা শোনা যাবে ফিউচার জেনারেসান। সভ্যতা একটা রিলে রেস। একদল এগোচ্ছে, একদল আসছে পেছনে। যা হয়েছে, যতদূর হয়েছে, সব বর্তমানের হাতে গচ্ছিত করে সরে পড়ো। ইংরেজীতে বলে, লাইক ফাদার, লাইক সান। বর্তমান তৈরি করে ভবিষ্যৎ।

আমাদের ভবিষ্যৎ ? একশো বছর আগে যা ছিল, আজও তাই। কোনও পরিবর্তন নেই। বরং আরও খারাপ। তখন আমাদের পাশে কিছু জ্যোতিষ্ক ছিলেন, যাঁদের আলোয় আমাদের অন্ধকার আলোকিত হত। এখন কি আছে ! এখানে ওখানে অবহেলিত কিছু প্রতিমূর্তি। কীটদষ্ট কিছু পুঁথি, যার পাতা ওলটান মানে সময় নষ্ট। সেকস নেই, ভায়োলেনস নেই, রাজনীতি নেই, আন্দোলনের কথা নেই। থাকার মধ্যে আছে কিছু ভালো ভালো জীবন বিমুখ কথা। নিজেকে জয় করো, আত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হও। মানব থেকে অতিমানব হবার চেষ্টা করো। যত সব রাবিশ ট্র্যাশ। পশ্চিম থেকে বিজ্ঞান এসেছে তেড়ে। মাটন রোল খেয়ে ডিসকো নাচো পশ্চাদ্দেশে পশ্চাদ্দেশ মেরে। আর বিজ্ঞান ? আমাদের জীবন একেবারে জজবজে করে দিয়েছে। কল ঘোরালেই বালকের ছুনু। সুইচ টিপলেই আলকাতরা অন্ধকার। আহার ? প্রেটিন আর ভিটামিনে ভরপুর। গলায় ঢুকে চলবে না, চলবে না করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ট্র্যাফিক জ্যাম। চুমুকে চুমুকে চাপাকলের স্কচ। ব্রহ্মতালুতে থাবড়া। সকলেই একটি করে গাড়ি আর বাড়ির মালিক। গাড়ি হল এল ইলেভন। বাড়ি হল নিজের দেহ। প্রাণপাখি অষ্টপ্রহর সিটি মেরে চলেছে—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রোড ট্র্যানস্পোর্ট অচল। গতির যুগে ওসব বাতিল। বিয়ের বরযাত্রীরা মাঝেসাজে চাপতে পারেন। আমাদের জন্যে এয়ার ট্র্যাফিক। স্পিরিটে চলে। আমাদের প্রত্যেকেরই উদরে একটি করে ডিস্টিলারি। মগজঅলা জীবরা অম্বলে ভোগে। সেই অম্বলে দাদখানি চাল আর ভেজিটেবল, এক দলা ভেলি পোধে বাঙালীর সব পদে একটু করে মিষ্টি। নিমেষে পেট স্পিরিটে ভরপুর। চোখ ঢুলুঢুলু। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু একবার বলো হুস্। ব্যাস্ মৌজা গন্তব্যে। তা ছাড়া আমাদের একতা ! গলায় গলায়, হলায় হলায়। আমাদের যাওয়া আসা তাল তাল অবস্থায়। একতাল দুম্ করে পড়ল, যেন মাকড়সার বাচ্চা হল। স্ত্রী মাকড়সা পেট থেকে সাদামত একটি থলি ফেলে দেয়। সেই থলি এক সময় ফট করে ফেটে রাশি রাশি বাচ্চা তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। একতাল বাঙালী দুম্ করে পড়ল, চারপাশে ছিটকে স্পিরিটের জোরে ছুটল অফিসে সেরেস্তায়।

BanglaBook.org

পশ্চিমী ধাঁচে আমাদের অর্থনীতি এত উন্নত, অধিকাংশ মানুষকেই আর কিছু করতে হয় না। সব লোটাস ইটারস। মেকআপ টেকআপ নিয়ে একটু রকে বোসো। ফুটবল আছে, ক্রিকেট আছে, সিলভার স্ক্রিনের নায়ক-নায়িকারা আছে। সেইসব নাড়াচাড়া করতে করতে মারো সিটি। কি হোলো বাপী ? মদনানন্দ গুরু। কে গেল একবার দেখলে না টেস্টামেন্ট বলেছেন, লাভ দাই নেবার। পূর্বপুরুষকে প্রশ্ন করা হল, কি রেখে গেলেন মশাই সগর্ব উত্তর, দোলনা, টি সার্ট আর হিপি চুল। টিপির ওপর বসে পায়রা ওড়াচ্ছেন।

বাজার

বাজার এক বিচিত্র জায়গা। মহাতীর্থ। প্রতি দিনের কুম্ভমেলা। বাজারেরও একটা আঞ্চলিক চেহারা আছে। যে অঞ্চলে যে ধরনের মানুষের বসবাস বাজারেরও সেই ধরনের চেহারা। তবে বাজার মানেই গুঁতোগুঁতি। বাজারের পিক আওয়ার্স হল সকাল ছটা থেকে আটটা। যা কিছু খণ্ডযুদ্ধ সব ওই সময়ের মধ্যে।

সবল বলশালী মানুষ, দুর্বল ক্ষীণজীবী মানুষ সকলকেই ছুটতে হয় সকালের বাজারে। কারুর পকেটে অঢেল কাঁচা পয়সা, কারুর পকেটে হিসেবের মাপা কড়ি। বেশী মাস্তানী করতে গেলেই মাঝমাসে চেত্তা খেয়ে পড়তে হবে। সে দিন কাল আর নেই। যত রোজগারই করো শেষ মাসে প্রায় সকলেরই রস শুকিয়ে আসে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তাঁরা হলেন ভগবানের ব্লু-আয়েড বেবি। এখনও সে দৃশ্য ভুলিনি। সন্ধের মুখে অবাবু পাড়ায় ঢুকলেন, এ হাতে ঝুলছে দুটো ইলিশ, ও হাতে ঝুলছে দুটো ইলিশ। অকরিতকর্মা প্রতিবেশীদের প্রশ্ন, কি ব্যাপার অদা, চার-চারটে ইলিশ ?

অদা মুচকি হেসে বললেন, আর ভাই পারা যায় না, আজ শ খানেক বেকারের নাম একলটে পাঠিয়ে দিলুম বেঙ্গল অ্যাণ্ড বেঙ্গল ট্রাস্টে। আ, বাই দি গ্রেস অফ গড শ তিনেকের চাকরিও যদি হয়, বড় তৃপ্তি পাবো। ভাপা খাবো, দই ইলিশ খাবো, কাঁচা ঝাল খাবো, ভাজা খাবো, অম্বল খাবো। খেয়ে খেয়ে ফাঁক করে দোবো।

একজন বোকার মত প্রশ্ন করল, লোক পাঠানোর সঙ্গে ইলিশের কি সম্পর্ক।

অদা হাসলেন, হেসে অভিনেতা বিমল দেবের গলায় বললেন, বোকা ছেলে, কিচ্ছু বোঝে না। বাজারে যাবার আমাদের কোনও নির্দিষ্ট পোশাক নেই। গো অ্যজ ইউ লাইক। এ বাজার সে বাজার নয় যে ফ্যাশন প্যারেড হবে। পায়ের

pathagar.net

তলায় কি আছে দেখার উপায় নেই। শাকপাতা, জল গোবোর, পচেধসে মাখো মাখো। দু'ধারে স্টল, মাঝে সঙ্কীর্ণ পথ। প্রত্যেকেই সামনের ব্যক্তির মূলাধারে খোঁচা মারতে মারতে ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন। সকলেই ঝট করে সারতে চান কিন্তু উপায় নেই। আপ অ্যাণ্ড ডাউন দু দিকেই জনস্রোত চলেছে। বাজারের অবশ্য আপও নেই ডাউনও নেই। এলাকা আছে।

আগে ছিল বায়ারস মার্কেট, এখন হয়েছে সেলারস মার্কেট। অর্থনীতির চাকা ঘুরে গেছে। আগে দরদস্তুর চলত, এখন আর চলে না। স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে, পেশী ফুলিয়ে বসে আছেন বিক্রেতা। হাতে কাঁচের গেলাস। গেলাসে সকালের প্রথম চা। মুখে চোখে একটা তেরিয়া ভাব, লিতে হয় লে, না লিতে হয় সরে পড়। যে যুগে ক্রেতারাই ছিলেন সর্বে-সর্বা, সে যুগে দোকানে দোকানে লেখা থাকত, খরিদ্‌দার লক্ষ্মীর সমান। তার তলায় লেখা থাকত, আজ নগদ কাল ধার।

আগেকার কালে বিক্রেতাদের মুখে ভুবনমোহিনী একটা হাসি লেগে থাকত। আসুন বলে আবাহনের প্রথা ছিল। এখন আর সে সব নেই। ক্রেতারা এখন খুবই বিনীত। ভাই, পটল আজ কী দাম যাচ্ছে ?

এ ব্যাটা প্রাচীন ক্রেতা। দাম জিজ্ঞেস করে মাল কেনে। বিক্রেতা গুরুগম্ভীর গলায়, কত চাই, এক কিলো ?

কি দাম যাচ্ছে ভাই ?

ভাই চায়ের গেলাসে চুমুক মেরে, পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে বিবিধ ভারতী একটু জোর করে দিলেন। পটলের দামের বদলে, গান শুনুন। বাকি ব্যবস্থা অন্য ক্রেতার হাতে। কনুইয়ের খোঁচা মেরে বাঁ পাশে টাল খাইয়ে দিলেন। মানুষকে মানুষ মনে করার প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পেতে চলেছে। যিনি কেতরে দিলেন তাঁর দিকে একবার তাকানো যাক। বপুটি বিশাল। পরনে চেক চেক লুঙ্গি। বুশশার্টের বুকের বোতাম খোলা। মুখে সিগারেট। এতখানি ছাই বেরিয়ে আছে, যে কোনও মুহূর্তে ধসে পড়ল বলে। ফোলা ফোলা চোখ নিজের তৈরি ধোঁয়াতে আধবোজা। মুখ থমথমে। গত রাতের জের এখনও কাটেনি। দাঁতে সিগারেট চেপে, দু হাতে ডোরাকাটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের মুখ ফাঁক করে সামনে এগিয়ে দিলেন। ঝপাঝপ মাল উঠতে লাগল। ব্যাগের পেট ফুলে উঠল। দাঁত চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কত হোলো ? বুকপকেট থেকে এক ড্যালা নোট বের করে ফেলে দিলেন। পড়ল গিয়ে করলা, আর আঠাধরা পেঁপের বুকে। কী দাপট রে ভাই ? একেবারে টাকা মাটি, মাটি টাকার গ্রুপের মানুষ। সোর্সটা কি ! মনে হয় সেই প্রতিষ্ঠানের, যে প্রতিষ্ঠানে টাকা খাটালে একশো টাকায় দুশো টাকা সুদ পাওয়া যায়।

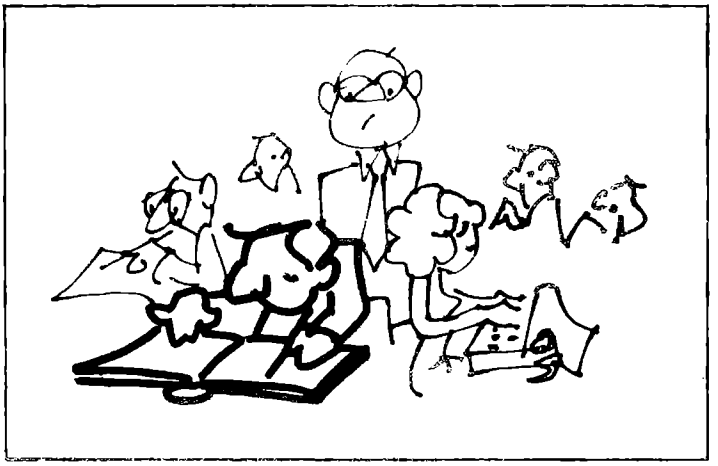

রামকৃষ্ণ বলতেন, যোগীর চোখ দেখলেই চেনা যায়। ডিমে তা দিতে বসা পাখির চোখের মত ফ্যালফেলে হয়ে যায়। ঠাকুর জানতেন না, অর্থেও মানুষের চোখের দৃষ্টি ওইরকম হয়ে যায়। চোখ চড়ে থাকে চড়কগাছে। দেখছেন অথচ দেখছেন না। চেনাকে অচেনা মনে হচ্ছে। লোককে মনে হচ্ছে পোক। দাপটের ক্রেতা সদম্ভে চললেন মাছের বাজারের দিকে। এঁদের দেখলে সিনেমার সুরে গান গাইতে ইচ্ছে করে, ও বাজার খারাপ করনেওয়ালে।

বাজারে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য গরুও থাকবে। এদের পয়সা না থাক গতর আছে। দু' সার লোকের মাঝে শিং নেড়ে মাথাটি গলিয়ে দেবে। সেটা তেমন সমস্যার নয় ? নিচের দিকে একটু সুস্‌সুড়ি মত লাগে। গরুর সব চেয়ে বেঢপ অংশ হল পেট। ওই পেট যখন পেছন দিয়ে পাশ করে তখন বাঙালীর কোমরের জোর কত বোঝা যায়। সার সার বাঙালী কাটা কলাগাছের মত একের পর এক সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কেউ মানকচুর ওপর, কেউ মোচার ওপর, কেউ চারাপোনার গামলায়। একটু উপরি পাওনা। দু ঢোঁক জল খেয়ে আবার খাড়া।

সব চেয়ে হৃদয়বিদারক এলাকা হল মাছের বাজার। দম বন্ধ করে কুম্ভক অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা যায় না। নিঃশ্বাস নিলেই দুর্গন্ধ। আগেকার কালে বাউটিপরা একসার মহিলা বিক্রেতা খ্যানখেনে গলায় বাজার মাথায় করে রাখতেন। তাঁরা আর নেই। এখন রক্তচক্ষু যুবকেরা মাছের ব্যবসায় নেমেছেন।

pathagar.net

এঁরা ক্রেতার মুখ দেখেই পকেটের অবস্থা বুঝে ফেলেন। কাটা পোনার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে একজন রুল অফ থ্রি করছেন, হাজার গ্রাম পঁয়ত্রিশ টাকা। তাহলে দেড়শো গ্রাম ? না ওভাবে হবে না। বাজেট বাঁধা ? তিনের বেশি নয়। তা হলে, পঁয়ত্রিশে যদি হাজার হয়, তিনে কত হবে ? তিন ইনটু হাজার বাই পঁয়ত্রিশ। ভাই আশী দশমিক পাঁচ গ্রাম কাটাপোনা দেবেন। না, একথা বলা যায় না। দিনকাল ভাল নয়। এখুনি খড়কে কাঠি দিয়ে গায়ে মাছের জল ছিটিয়ে দেবে, ওঁ স্বাহা বলে।

এ যাত্রা গুঁতোই খাওয়া যাক। মেয়ের বিয়ের সময় সেই তো ধারধোর করতেই হবে, তখন খাওয়া যাবে পাকাপোনার ফ্রাই। বাদামী রঙ। গায়ে খাঁটি সরষের তেল ফুটুর ফুটুর করছে।

দিন আগত ওই

সেই দিন আসছে, যেদিন এই ধরনের ঘটনা ঘটবে।

কোনও এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি যুবক এসে অধ্যক্ষকে বলছে, এই যে মাল একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট লিখে দাও। [যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময় বাঙলা ভাষা একটা নতুন চেহারা নেবে। যাঁরা পদে থাকবেন তাঁদের সকলকেই মাল বলে সম্বোধন করা হবে। কেউ কিছু মনে করবেন না। যেমন একটা সময়ে ছেলেদের বয়স্করা ছোঁড়া বলে সম্বোধন করতেন।]

অধ্যক্ষ সেই যুবককে বলবেন, এসো গুরু, বোসো এখুনি লিখে দিচ্ছি ! [বাঙলা তখন গুরুতে গুরুতে ছয়লাপ হয়ে যাবে। যুবক মানেই গুরু।]

এইবার চরিত্র। চরিত্রের কি সংজ্ঞা দাঁড়াবে তখন ! অধ্যক্ষ প্রথমেই লিখবেন, লাগে তাক না লাগে তুক, কিম্বা কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে। এটি হল ওই ইংরিজিটির অনুবাদ, টু হুম ইট মে কনসার্ন এরপরই তিনি লিখবেন,

'মান্যবর'

মান্যবর লিখতেই হবে তা না হলে লাশ পড়ে যেতে পারে, চেয়ার উলটে যেতে পারে। রাজনীতি তখন এমন এক হাইটে উঠবে, একেবারে 'গোলান হাইট'। রাতে বিছানায় শুতে হলে, কি শ্মশানে সৎকার হতে হলেও রাজনৈতিক ব্যাকিংয়ের প্রয়োজন হবে। এমন কি রাজপথে হাঁটা-চলা করতেও গুরুর কৃপার প্রয়োজন হবে, নয়ত মুণ্ডুটি কেটে দু' হাতে ধরিয়ে দেবে। টু হুম ইট মে কনসার্ন বলে।

অধ্যক্ষ লিখতে থাকবেন,

'মান্যবর বগা ওরফে নগা, ওরফে আলি, ওরফে পল্টু, ছনা, ওরফে পদা,

ওরফে হিটলার, ওরফে দিলদার।'

তখন এক একজনের কৃষ্ণের শতনামের মত হাজারটা নাম হবে। বন্দনা বা ভজনার জন্যে নয়। প্র্যাক্‌টিক্যাল কারণে। সমাজে তখন ব্যাপক চোর-পুলিশ খেলা চলবে। ধরা আর ছাড়া। এ-পক্ষ বলবে, ছেলেবেলার কুমির কুমির খেলার সেই ছড়াটাকেই একটু বদলে নেবে, কুমির তোর জলকে নেমেছি না বলে, পুলিশ তোর জলকে নেমেছি। ও-পক্ষ বলবে, ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি। ধরিলেও ছেড়ে দিতে হয়। রাগ বেহাগ, দ্রুত তিন তাল।

অধ্যক্ষ ওরফে, ওরফে করে শেষে লিখবেন,

যতদূর জানি গুরু আমাদের বড়ই করিতকর্মা। শৈশব থেকেই এরমধ্যে যুগলক্ষণ প্রভূত পরিমাণে ফুটে উঠতে দেখা গেছে। গুণের গুণমণি বললেও অত্যুক্তি হবে না। যেমন অবাধ্য, তেমনি একগুঁয়ে। যিনি একে বাপ বলেন, তাঁকে ইনি শ্যালক বলে সম্বোধন করেন। এই যুবকটির প্রাচীন পন্থী, সেকালের সংজ্ঞায় চরিত্রবান, শিক্ষিত, এ-কালের সংজ্ঞায় চরিত্রহীন, নির্বোধ পিতা, আধপাগলা হয়ে, কাছাকোঁচা খোলা অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এর গর্ভধারিণী গত পৌষে, এই মহামানবের হাওয়াই চপপল পেটা খেয়ে উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করেছেন। আমাদের গুরু তখন ইডেন উদ্যানে বসে এক ঈভের অধর সুধা পান করছিলেন। গুরুর এতই স্নায়ুর জোর, গর্ভধারিণীর এমত পরিণতিতে আদৌ বিচলিত না হয়ে, পিতাকে গলাধাক্কা দিয়ে রাজপথে বের করে দিয়ে, গৃহপ্রাকারে নিজের পতাকা উড্ডীন করেছে। এই সুসন্তান শুধু কুলতিলক নয়, দেশতিলক।

গুরু আমাদের কর্মবীর। শিক্ষা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে, ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে লাটে তুলেছে। প্রহারে সিদ্ধহস্ত, ভাঙচুরে উলটো বিশ্বকর্মা, এক ঘণ্টায় পুরো একটি প্রতিষ্ঠানকে জমিতে শুইয়ে দিতে পারে। একটা পাখাও আস্ত থাকবে না, সমস্ত কাঁচের সার্সি মিছরির দানার মত ঝরে পড়বে, সমস্ত ফার্নিচার টুকরো টুকরো, এমন গুছিয়ে কাজ অতি অল্পজনেই করতে পারে, বোমা ছোঁড়ে যেন হরির লুঠের বাতাসা। শিক্ষার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে এই বঙ্গজ গুরু। যে কোনও পরীক্ষাই এ অক্লেশে পাশ করতে পারে, ভোজালি, পাইপ আর পেটোর তেরোস্পর্শে। আই হ্যাজ লিখলেও এ সুপণ্ডিত। এর হাতে শিক্ষা যে স্বাধীনতা পেয়েছে তার প্রভাব যুগ থেকে যুগান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। মানুষকে মালের পর্যায়ে নামিয়ে এনে এমন এক বৈদান্তিক ব্যবসায়িক সংজ্ঞা সংযোজন করেছে, যার ফলে ভারতীয় দর্শনের মুখ আরও উজ্জ্বল হবে। জন্মের থেকেই এ এক আন্দোলনকারী। চব্বিশ ঘণ্টায় সারা শহর পোস্টারে মুড়ে দিতে পারে। মিনিটে একটা লাশ ফেলে দিতে পারে। কণ্ঠনালীতে ব্লেড চালায়

যেন পাকা সার্জেন। জ্যান্ত মানুষ চিরে চিরে বিলেত না গিয়েই এফ আর সি এস। অ্যানাটমিতে কি সাংঘাতিক জ্ঞান। ইচ্ছে করলে অ্যাপেন্ডিক্স্, গলব্লাডার, হার্ট, লাঙস সবই অপারেশন করে ছেড়ে দিতে পারে। দু'জন প্রধান শিক্ষক আর তিনজন অধ্যক্ষকে লাগাতার ঘেরাওয়ের মধ্যে রেখে গুরু আমাদের রেকর্ড করেছে। তাঁরা ইউরেমিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করেছেন। যাবার আগে মনে মনে আশীর্বাদ করে গেছেন, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, যুগ যুগ জিয়ো, আর বোতোল বোতোল পিয়ো।

রাজনীতিতে বস্তুটি অপরিহার্য। একে সেবা করলেই, নেতার আসন পাকা। ইনি সেবন করবেন, নেতা সেবা করবেন। সেবন আর সেবার যুগে গুরু আমাদের পিলার অফ দি সোসাইটি। এ দেশের সব মহাপুরুষকে ম্লান করে দিয়ে, গুরু আমাদের জাতির ভাগ্যাকাশে দেদীপ্যমান। গুরু আমাদের জাতীয় উৎসবকে সম্পূর্ণ এক নতুন চেহারা দিয়েছে। ধর্মের ফেঁসো ছাড়িয়ে আমোদের শাঁসটিকে বের করে এনেছে। পুজো এলেই বাঙালীর মুখ শুকিয়ে আসে। কেন আসে ? গুরু কৃপা হি কেবলম। হয় চাঁদা দাও, না হয় নামের আগে অর্ধ চন্দ্র বসাও। হয় ঈশ্বরের সেবা করো, নয় নিজে ঈশ্বর হয়ে যাও।

দয়া, মায়া, বিনয়, ভদ্রতা, প্রাচীনকালে যা সতীদাহের মতই আদরণীয় ছিল, গুরু সেসব দাহ করে, সভ্যতাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছে। পশু থেকে মানুষকে আলাদা করার যে ষড়যন্ত্র এতকাল চলছিল, সেই ষড়যন্ত্রকারীদের কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমি এর উত্তেরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। বাবাজীবন নয়, মহাজীবন দীর্ঘজীবী হয়ে দেশকে ক্ষীণজীবী করুক। দেবতার পদাভিষিক্ত শয়তানের কাছে এই প্রার্থনা।

শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

সেদিন ময়দানের কাছে হঠাৎ শয়তানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথমে চিনতে পারিনি। ঈশ্বর শুনেছি মানুষের রূপ ধরে দেখা দেয়। মাথার পেছনে একটা জ্যোতির্বলয় থাকে। এই যা তফাৎ। শয়তানও যে মানুষের চেহারা ধরতে পারেন জানা ছিল না। ছবিতে যে শয়তান দেখেছি, তাঁর মাথায় একজোড়া শিং থাকে। দুপায়ে জুতোর বদলে থাকে ক্ষুর।

যাই হোক, ধারণা আমার বদলে গেল। শয়তান অবিকল মানুষের মত দেখতে। ঘটনাটা বলি। একটি মানুষ আমার সামনে সামনে, রাইট অ্যাণ্ড লেফ্ট থুতু ফেলতে ফেলতে চলছে। যারা খইনি খায় অনেকটা তাদের কায়দায়।

পিচিক্ রাইট, পিচিক্ লেফ্‌ট। দু' একজন ওভারটেক্ করে চলে যেতে গিয়ে থুতু সিঞ্চিত হলেন। হলেও গ্রাহ্য করলেন না। তাঁরা মনে হয় রিয়েল ক্যালকেসিয়ান। কলকাতার অধিকাংশ মানুষই সিদ্ধ পুরুষ। নির্বিকার, উদাসীন, দেহবোধ শূন্য। যাঁরা নিত্য বড়বাজার অঞ্চলে চলাফেরা করেন তাঁরা হলেন পরমহংস।

শয়তান চলেছেন সামনে সামনে, আমি চলেছি ঠিক পেছনে। ওভারটেক করার সাহস হচ্ছে না। লাগাতার থুতু বৃষ্টি চলেছে। প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও, সাহসে কুলোচ্ছে না। আজকাল প্রতিবাদ করা মানেই লাশ পড়ে যাওয়া। ব্রাহ্মণী বিধবা। হালফিল দেখলেই হল, চারটে চোর একটা পুলিসকে বেঁধে নিয়ে চলেছে। পেটাতে পেটাতে। কী ব্যাপার ভাই?

আর বলবেন না মশাই। সবে পাইপ বেয়ে উঠছি, ব্যাটা মধ্যযুগের পুলিসের মত 'চোর চোর' বলে চিল্লে মেজাজটাই খিচড়ে দিলে।

এঁকে এখন কি করবেন?

তলপেটে গোটাকতক কোঁতকা মেরে ফাটকে ভরে দি। কাল সকালে চালান করে দোব।

প্রতিবাদ চলেনা। চলছে-এ না-আ, চলবে না-আ। ন্যাশন্যাল অ্যানথেমের মত, এই জাতীয়-মন্ত্রটিরও একটি সুর আছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ সামনে পেছনে দুলিয়ে দুলিয়ে এই মন্ত্রটিকে ছাড়তে হয়। সব স্তব্ধ। রাজা ক্যানিউট জানতেন না। জানলে সমুদ্রের ঢেউও স্তব্ধ হয়ে যেত। অন্য কোনও ব্যাপারে প্রতিবাদ মানেই ক্যাপিটেল পানিশমেণ্ট। ধর্ষণ! নো প্রতিবাদ। টিজিং! মনে কর হরির লুঠের বাতাসা গায়ে এসে লাগছে। ছেনতাই এক ধরনের সোস্যালিজম। তোমার

pathagar.net

ছিল, এখন আমার হল। চারিয়ে দাও। চাইলে যখন জ্ঞান আর উপদেশ ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না, তখন কেড়েই নিতে হবে। উঁচুতলার জল নিচুতলায় আসুক। সব সমান হয়ে যাক এইভাবে।

সব প্রতিবাদ এখন উৎপাদন কেন্দ্রে। ফুটপাথে সারি বেঁধে দাঁড়াও। তারপর চিল্লে যাও চলছে না, চলবে না। প্রতিবাদ, অফিস ছুটির সময়, কলকাতার কয়েকটি বাঁধা পথে। এই প্রতিবাদে তেমন কোনও পার্সোন্যাল রিস্ক নেই। বড়জোড় দু-চারটে পটকা ফাটবে, স্টকে টিয়ারগ্যাস থাকলে, এক কি দু' রাউণ্ড চলবে। ঢালধারী পুলিস লাঠি উঁচিয়ে গরু তাড়াবে। বেশ একটু ছোটাছুটি হবে। কলকাতায় সম্পদের মধ্যে বেড়েছে ইট আর পাথরের ঐশ্বর্য, আর বেড়েছে হকার এবং পেভমেন্ট ডোয়েলার। শহরজীবনে এই তিনটি সম্পদই আমাদের প্রয়োজন। এশটেবলিশমেণ্টের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। প্রতিবাদের ভাষা আর সুর বেশ সেট করে গেছে। ওদিকে যেমন 'কার হল গো'। এদিকে তেমনি চলছে-না, চলবে-না। কণ্ঠের ব্যায়ামের সঙ্গে, শুধুই বাহুর আস্ফালন। এর সঙ্গে ইটপাটকেল ছুঁড়তে পারলে, ভাল বোলার তৈরির সম্ভাবনা কেউ ঠেকাতে পারবে না। পুলিসের তাড়ায় অফিস ছুটির পর একটু দৌড়োদৌড়ি স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। হার্ট, লাঙস্, ডাইজেসটিভ সিস্টেম জোরদার হবে। এ সবই যে ফিজিক্যাল এডুকেশনের আওতায় পড়ে, সেই কথাটাই আমরা ভুলে যাই। যাঁরা আবার গ্রাম থেকে শহরে আসেন, তাঁরা শুধু গদির ব্যবসার 'লিভিং অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট' মনে করলে ভুল হবে। এই আসা আর যাওয়াটা পড়ে ন্যাশন্যাল এডুকেশন স্কিমের আওতায়। কলকাতায় এসে দেখে যাও, শহর কি করে নোঙড়া করতে হয়, ভাঙতে হয়, চুরতে হয়। আইন কাকে বলে, প্রশাসন কী বস্তু! ট্র্যানস্পোর্ট নেটওয়ার্ক কী জিনিস! রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কেমন বস্তু। পশুতে আর মানুষে তফাৎ কতটুকু। বিবর্তন কাকে বলে। বাঁদর সত্যিই মানুষের পূর্ব পুরুষ ছিল কী না। বিজ্ঞাপনের কলকাতা আর বাস্তব কলকাতায় ফারাক কতটা! নানাবিধ জ্ঞান সঞ্চয় করে, কাঁচা পাঁউরুটি আর গোটা দুই সিঙ্গাপুরী কলা খেয়ে গ্রামের মানুষ গ্রামে ফিরে চল। জিনিসের দাম কমল কী না, ট্যানা ঘুচে পরনে ফিরিঙ্গি জামা উঠল কী না, গ্রামে বিদ্যুৎ এল কী না, ক্ষরায় সেচের জল মিলল কী না, সবুজ বিপ্লব হল কী না, দপ্তরে ফাইল নড়ল কী না, বিনা তেলে যন্ত্র চলে কী না, জানার দরকার নেই। দুটি ডাণ্ডা, একটি ঝাণ্ডা, কপালে আণ্ডা, বেড়ে যাও গণ্ডা গণ্ডা। তারপর সেই এক ভরসা, জিভ দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

হকারও খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। বড়দেরও তো ব্যায়াম চাই। লোকলস্কর, সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়। বুলডোজার দিয়ে আটচালা

ভূমিসাৎ কর। সবই ওই এক কারণে। তোমায় নতুন করে পাব বলে, হারাই বারে বারে, আমার ভালবাসার ধন। রাজ-রাজরার দাবা খেলা। হিউম্যান ঘুঁটি। ফুটপাতের ছক। রাজা যে চালই দিন, তিনিই জিতবেন। তারপর আড়াইচালে আবার ফিরে এস। দাবায় খেলোয়াড় দু'পক্ষ। দর্শক অনেক। বেশ লাগে দেখতে।

আর পেভমেণ্ট ডোয়েলার্স ফিল্মের জন্যে, ডক্টরেট থিসিসের জন্যে অবশ্যই প্রয়োজন। ফিল্মে ফোরেন প্রাইজ পেতে হলে ফুটপাথে নামতেই হবে। কি ইন্টেলেকচ্যুয়াল, কি কমার্শিয়াল ক্যামেরাকে এক ঝলক ফুটপাথে আছড়ে পড়তেই হবে। সেকস্ আছে, শোষণ আছে। ভায়োলেন্স আছে, ভারচু আছে। পলিটিক্স আছে, টিক্স আছে। বিশ্বরূপ আছে। বিদেশে দেখাবার মত এদেশে আর কী আছে!

যাক্, শয়তানের পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে কোথা থেকে কোথায় চলে এলুম! অবশেষে প্রতিবাদ নয়, পেছন থেকে বিনীত কণ্ঠে বললুম, স্যার, আপনি কী ওয়ার্মসে ভুগছেন? এত কণ্ঠধারা নিক্ষেপ করছেন চতুর্দিকে। এক ডোজ 'সিনা' খেয়ে দেখতে পারেন। তখনও আমি কিন্তু জানি না, কার সঙ্গে কথা বলছি!

॥ দুই ॥

শয়তান একটা গাছ দেখিয়ে বলল, সিট ডাউন।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। কী জানি বাবা, এ আবার কার পাল্লায় পড়লুম। তেমন তো কিছু বলিনি! প্রোটেস্টও করিনি। অ্যাণ্টি-ইনস্টিটিউশন কথাবার্তাও বলিনি! বুক গুড়ু গুড়ু করছে। মাল নিজ দায়িত্বে রাখুনের মত, প্রাণও এখন যার যার নিজের দায়িত্বে রাখার রেওয়াজ চলেছে।

শয়তান ধপাস করে বসে পড়ে বললে, সিট ডাউন।

কেন স্যার?

ভয় পেলে চাকুরিজীবী মানুষ স্যারই বলে, শয়তান বললে, বসতে বলেছি বসবে, বেশি দেয়লা করবে না। তোমাকে কিঞ্চিৎ ট্রেনিং দিয়ে যাই।

আপনি কে স্যার?

আমি শয়তান।

সেই শয়তান, যে আমাদের আপেল খাইয়েছিল? সাপের মত দেখতে!

সবই জানো তাহলে?

pathagar.net

ইয়েস স্যার।

পকেটে মালকড়ি আছে ?

সামান্য। শেষ মাসে যা থাকা উচিত।

হিসেব চাইনি, আমি তোমার স্ত্রী নই। পঞ্চাশ গ্রাম বাদাম কিনে আনো। বিফলে যাবে না। তোমাকে কিছু শয়তানি শিখিয়ে দোবো।

কিছু কিছু অলরেডি জানি প্রভু।

সে জানা তোমার জানাই নয়। হাতুড়ে বিদ্যা। ট্রেনিং ছাড়া প্রোফেস্যানাল শয়তান হওয়া যায় না। অ্যামেচারের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

বাদাম নিয়ে এসে দুজনে মুখোমুখি বসলুম। চারটি বাদাম হাতের তালুতে ফেলে দেখতে দেখতে শয়তান বললে, এই দ্যাখো, এই হোলো তোমার ভগবানের রাজত্ব, কিংডাম অফ গড। ফিফটি পারসেন্ট পচা। এটা যদি সেন্টপারসেন্ট শয়তানের রাজত্ব হত, তাহলে একশোটার মধ্যে একশোটাই পচা হত বা ভালো হত। তোমাদের ভগবান হলেন ভেজাল সম্রাট। সেই কোন শৈশব থেকেই তোমাদের অঙ্ক শেখালেন, একজন ব্যবসায়ী পঁয়তাল্লিশ টাকা মণ দরে দশ মণ চালের সঙ্গে পঁয়ত্রিশ টাকা দরের বিশ মণ চাল মিশিয়ে চল্লিশ টাকা দরে বিক্রি করলে কত লাভ হবে ! করনি এমন অঙ্ক ?

ইয়েস স্যার !

তবে ! শয়তানের পাঠশালে এমন অঙ্ক নেই। আচ্ছা, বাজে বকে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তোমার ফাউণ্ডেশনটা আগে দেখেনি, কী কী শয়তানি জানো ?

স্যার, আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না, একটু এলোমেলো হয়ে যাবে, তাছাড়া এগুলো শয়তানির মধ্যে পড়ে কিনা, আপনিই বলতে পারবেন, কারণ আপনি পাকা শয়তান। প্রথমে একটা শয়তানির কথা বলি, সরতে বললে না সরা। এই জাতের শয়তানির লেবেল দিতে পারেন, সরতে বললে না সরা !

বাঃ, সেটা কি ধরনের জিনিস ? আমি তো শুনিনি !

এটা আমরা বাড়ির চেয়ে বাইরেই ব্যবহার করি বেশী। বাসের বা ট্রামের পাদানিতে, অথবা আর একটু ওপরের ধাপে, গেটের মুখে, ফুটপাথে, বাজারে, এমন কি মন্দিরে মায়ের মূর্তির সামনে, দোকানের কাউন্টারে। পাদানিতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লুম। পেছনে চিৎকার, দাদা উঠুন না, কি হোলো দাদা উঠুন না। এমনি যদিও বা উঠতুম, তাগাদায় ব্যাদড়া ছেলের মত খিচড়ে গিয়ে পেছনের সঙ্গে ন্যাজে খেলতে লাগলুম। আমার সামনে যিনি আছেন, তিনিও আমার সঙ্গে ওই একই খেলা খেলছেন, তার মানে শয়তানির রিলে। এরপর পেছন থেকে আসে দাওয়াই-এর রিলে। শিরদাঁড়ায় এক খোঁচা, ওঠ ব্যাটা। এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন প্রভু, এই শহরের যানবাহন ব্যবস্থা কি আপনি চালাচ্ছেন ?

pathagar.net

না রে, ভাই, ওটা খোদ ভগবানের ডিপার্টমেন্ট। আমার রাজত্বে পাপ নেই, ফলে নরকও নেই।

আর একটা ছোট্ট শয়তানির কথা বলি। অফিসে আর রেস্তোরাঁয় এটা আমরা পরস্পর পরস্পরের ওপর প্রয়োগ করি। ওয়াশ বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত ধুচ্ছি তো ধুচ্ছিই, নাক ঝাড়ছি তো ঝাড়ছিই, সামনের আয়নায় মুখ দেখছি তো দেখছিই। শেষে পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলের কেয়ারি হচ্ছে তো হচ্ছেই। ঠিক ওই সময়টিতে পৃথিবীতে যে দ্বিতীয় কোন প্রাণী থাকতে পারে আমরা ভুলেই যাই। একটাই অসুবিধে, এই শয়তানি ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। এই মুহূর্তে যে ঘুঘু দেখাল, পর মুহূর্তে সে-ই আবার ফাঁদ দেখল। ট্রেনের টয়লেটে এর প্রয়োগ আরও ব্যাপক, আরও বেশি মানুষকে এইভাবে বিব্রত করা যায় বলে, অনেক তৃপ্তিদায়ক। রেস্তোরাঁতে অকারণে আসন আটকে রেখে আমরা বেশ মজা পাই। ঢোকার মুখে একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা দাঁড়িয়ে। জুল জুল করে তাকাচ্ছে, কখন একজোড়া আসন খালি হয়! চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি দেখে বলে উঠল, ওই যে, ওই জায়গাটা খালি হবে। কানে এল। মুচকি হেসে, চুমুক আরও প্রলম্বিত করে ফেললুম। যতক্ষণ আসন আটকে রাখা যায়। শেষে আবার আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে, থেবড়ে বসে রইলুম। একে বলে, বাড়া ভাতে ছাই টেকনিক।

শয়তান ফুঁ দিয়ে বাদামের খোসা উড়িয়ে আমার কোল ভরিয়ে দিয়ে বললে, এটা করো না?

অবশ্যই করি। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে দি কালো প্যান্টে। আগে 'সরি' বলতুম প্রথামত, ইদানীং তাও আর বলতে হয় না। সুযোগ পেলেই ধোপদুরস্তবাবুর প্যান্টের তলার দিকে জুতোর স্ট্যাম্প মেরে দি। প্রতিবাদ এলেই বলি, 'ওরকম হবে মসাই, না পোসায় ট্যাকসি করে যান।

pathagar.net

॥ তিন ॥

সেই মানুষ্যরূপী শয়তান বললেন, দু'রকমের শয়তানি আছে, এক হ'ল ছিঁচকে আর এক হ'ল ডাকাতে। অনেকটা চোরের মত। ছিঁচকেরা কোনওদিন ডাকাত হতে পারে না। মশা কোনওদিন ভীমরুল হতে পারবে?

আজ্ঞে না। কিন্তু, মশাকে আপনি, আণ্ডার এস্টিমেট করবেন না প্রভু। সন্ধেবেলা যখন ঘরে এসে, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়ে দেয়। ভীমরুলের বাবা। ছেলেবেলায় পড়েছি, বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।

না হে বৎস, ও শিক্ষায় বিশেষ কাজ হবে না। ও হল, তোমাদের ভগবানের কু-শিক্ষা। বড়র জাতই আলদা। ছুঁচো কোনওদিনই হাতি হতে পারবে না। ও সব জন্মসূত্রের ব্যাপার, ছুঁচোর বাচ্চা ছুঁচোই হবে, হাতির বাচ্চা হাতিই।

আপনি তো প্রভু দেহের আকার আকৃতির কথা বলছেন ! দেহ দিয়ে কি আর শয়তানি হয় ? শয়তানি হল ভেতরের জিনিস। আমাদের ভেতরে প্রভু আপনিও যেমন আছেন, আপনার ঘোর শত্রু ঈশ্বরও তেমনি আছেন। একাধারে দুই বীর তাল ঠুকছেন। সেদিক থেকে আমরা বর্ণসঙ্কর। পিওর শয়তান, পিওর ভগবান আজও চোখে পড়ল না। পিওর ঘি যেমন হয়ই না, পিওর সরষের তেল আর মিলবে না।

শোনো, হবে না বলে কোনও কথা নেই। চেষ্টায় সবই হয়। বংশের ধারাই পালটে যায়। তোমরা মাছের চাষ করো, ফল আর ফুলের চাষ করো, শয়তানির চাষ কোনওদিন করেছ ?

আজ্ঞে না।

চাষ না করলে ভাল ফসল হয় ? ভালো জমিতে, ভালো বীজ, তারপর ভাল সার। ফসলের চেহারাই পালটে যায়। আড়াই হাত বেগুন, ধামার মত ফুলকপি। শোনো বৎস ! জমি আমি তৈরি করে ফেলেছি। স্বাধীনতার সার দিয়ে, রাজনীতির বোনমিল দিয়ে, লাঙল মেরে রেখেছি। তোমরা হলে সেই বীজ, শয়তানির সম্ভাবনা নিয়ে ছটফট করছ।

তা প্রভু চাষ থেকে কী ধরনের ফসল উঠবে ?

সে তোমাদের মত ল্যাংমারা ছিচকে শয়তান নয়। তাদের চালচলন, হাবভাব কাজকর্ম মশার কামড় নয়, একেবারে বাঘের থাবা।

তাঁরা কি করবেন হুজুর ?

তাদের আমি ভালো ভালো পোস্টে বসাব। বড় বড় নেতা করে দোব।

প্রভু, তাঁরা লোডশেডিং, কি জলবন্ধ, আরও ব্যাপকহারে করবেন ? মানে সব, বন্ধটন্ধ করে, ভেঙেচুরে কোম্পানী লাটে তুলে দেবে ?

লাটে তুলে দিলে তো সব হয়েই গেল ! শয়তানের রাজত্বে কোন পরিণতি নেই। উত্থানও নেই পতনও নেই। তালগোল পাকানোই হল কাজ। এমনভাবে জড়ভট্টি করে দাও, সব সাপের ছুঁচো গেলা হয়ে বসে থাক। আমার রাজত্বে কি পাবে জানো, এখানে আছে ওখানে নেই, তোমার আছে আমার নেই, তখন ছিল এখন নেই। যেমন ; উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে,

লোডশেডিং। মাইলের পর মাইল এলাকা অন্ধকারে পড়ে আছে। প্রথম প্রথম অস্বস্তি লাগত। এ কি ব্যাপার ! সব সভ্যদেশেই শহর এলাকায় রাতে আলো জ্বলে। শুধু জ্বলে না, রোশনাই ছোটে। বিদ্যুতের অভাবে সুদৃশ্য গ্যাসের

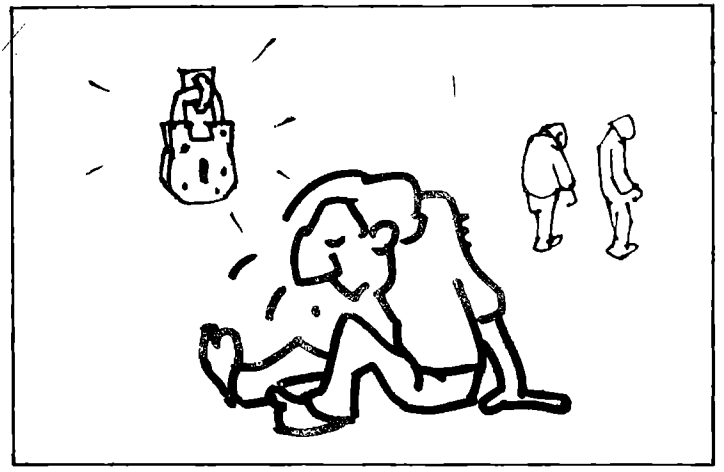

আলোর ব্যবস্থা শ'খানেক বছর আগেও ছিল। যে কালে মানুষ চাঁদে ছুটছে, পার্কস্ট্রীটে ডিসকো নাচছে, কথায় কথায় বউকে তালাক দিচ্ছে, ডিভোর্স-মামলা ঠকুছে, স্প্রিং লাগানো ছুরি খুলে বুকে বসাচ্ছে, পেখমমেলা মটোর চেপে অ্যাসেমব্লিতে গিয়ে গণতন্ত্রের খড়ম পেটাচ্ছে, সে যুগে রাতে, মানুষকে চাপ চাপ অন্ধকারের ব্যবস্থা দিলে, প্রথম প্রথম মানুষ বিক্ষুব্ধ হবেই। তারপর সয়ে যায়। শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়, কিন্তু গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলে কেমন হয় ?

সেটা কি প্রভু ?

এ টাচ অফ লারসেনির মত, এ টাচ অফ শয়তানি। আঃ সে যে কী জ্বালাদার জিনিস গো ! লোডশেডিং-এর পর আলো এলো। জনপদ হাসছে। হঠাৎ একটা ফেজ উড়ে গেল।

ও স্যার প্রায়ই আমার এলাকায় হয়। চারপাশে সব বাড়িতে আলো ফুটফুট করছে, আমরা বসে আছি অন্ধকারের দ্বীপে। বসে, বসে দেখছি সামনের বাড়িতে টিভি নাচছে নীল পর্দায়, আর জ্বলে জ্বলে উঠছি।

অ্যায়, একে বলে, আর্টিস্টিক শয়তানি। আর জিনিসটায় শয়তানির সৌন্দর্য কোথায় জানো ? লোডশেডিং হলে তোমার জানা আছে, ছ ঘণ্টা হোক, সাত ঘণ্টা হোক, আলো একসময় আসবে, ফেজ উড়ে গেলে আলো আসবে তখন, যখন সেই মহাপ্রভুরা দয়া করে আসবেন, কাঁধে মই নিয়ে।

উঃ সে এক সাসপেন্স। তারপর ওঁরা যা করেন প্রভু, সে হল ন দেবায়, ন হবিষায় ! আর একটা ফেজে ঢুকিয়ে দিলেন। সারা এলাকার আলো মোমবাতির মত হয়ে গেল। টিং টিং করে জ্বলতে লাগল। তারপর আবার লোডশেডিং এসে অন্ধকারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এ রকম কেন হয় প্রভু ?

আরে বোকা ওইটাই তো আমার কেরামতি। যেমন ধরো জল ছাড়া বাঙালীর চলে না, দিলুম বাহাত্তর ঘণ্টা জল বন্ধ করে। কিছু বললেই বলব, ভেবে দ্যাখো বাঙালী, সাহারার মানুষ সারা জীবনে এক ভিস্তি জল পায় কি না সন্দেহ ! চান করবে চান ? পশু জগতের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, গরুর মা, গরুর বাচ্চাকে চেটে পরিষ্কার করে দেয়। বেড়ালের মা বেড়ালকে চাটে। পারস্পরিক চাটাচাটি করে, টেরি কেটে অফিসে যাও কি মিছিলে যাও।

ফ্রীডম

আমরা বলি 'ইমানসিপেশন অফ ওম্যান', বাংলায় বলি নারী জাগরণ, স্ত্রী স্বাধীনতা। সে বস্তুটি কি ? কারুর জানা আছে কি ! স্বাধীনতা কি বস্তুর গুণাগুণ, ধর্ম, বর্ণ সব পালটে দেয় ! স্বাধীন দেশ মানে কি উচ্ছৃঙ্খল দেশ ! স্বাধীন যুবক মানে কি, বেলেল্লা পনা করার অবাধ ছাড়পত্র ? স্ত্রী স্বাধীনতা মানে কি, শুভাশুভ সব ভুলে নিজেরই খড়ের চালে আগুন ধরান ? তুড়ি লাফ মেরে বলা, আমি সমাজ মানি না, সংসার মানি না, শাসন, অনুশাসন কিছুই গ্রাহ্য করি না। বাপ-মা, একটা থার্ডক্লাস ডিসটারবেন্স। বিবাহিতা হলে স্বামী, জাস্ট ল প্লাটফরম ! প্রয়োজনে চিনতে পারি, অপ্রয়োজনে বিদায় করি। আমি এক 'বর্নফ্রী'।

আবার কোনও মহিলা যদি দাওয়ায় আড় হয়ে শুয়ে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে, হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, অ্যায় হরে, রাথরুমে চানের জল দে, মনে হয় খুব উপাদেয় হবে না। এ আচরণ যদি তাঁর স্বাভাবিক হয়, তাহলে তাঁর স্বজাতিরাই ব্রহ্মতালু কামিয়ে মাথায় ঘৃতকুমারী চাপাবেন।

কোনও মহিলা যদি আলোকিত মঞ্চে সর্বাঙ্গে তেল মেখে বিশ্বশ্রীর ভঙ্গিতে বাদ্যের তালে তালে ট্রাইসেপ বাইসেপ দেখাতে থাকেন তাহলে কেমন লাগবে ! মহিলারাই বলবেন ইনি একটি মদ্দা নারী। হিন্দি ছবিতে মাঝে মাঝে মেয়ে মস্তান দেখা যায়। হাণ্টারওয়ালী। মেয়েদের এই পুরুষালী ইমেজে বীরত্বের চেয়ে হাসির উপাদানই বেশি। মা দুর্গার মূর্তিতে যে তেজস্বিতা, সেই তেজই হল নারীর শক্তির বিশ্বাসযোগ্য, স্বাভাবিক স্ফূরণ। ওই পুতলীবাঈ, ফুলনদেবী মার্কা অ্যামেরিকান কাউবয় চেহারা বড় বাইরের ব্যাপার। ক্যারিকেচারের মত। এ

যুগটাই হল মেড ইজির যুগ। সাহস, স্বাধীনতা, বীরত্ব সব কিছুকেই আমরা সহজ করে নিয়েছি। দেশ যেন একটা বিরাট অপেরার মত। মেকি দেশ নেতা, মেকি সমাজসেবী, মেকি দেশ সেবক, মেকি সংস্কৃতিমান। সবই মেকি। সোনা ছেনতাইয়ের ভয়ে লকারে গচ্ছিত, কেমিকেল সোনায় জীবন সেজে উঠুর্ক।

স্ত্রী স্বাধীনতায় শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, শালীনতা, সভ্যতা-ভব্যতা এসব কি গৌণ ব্যাপার ! ও সবে কি যথেষ্ট স্বাধীনতার প্রকাশ হয় না ! জীব জগৎ, ঈশ্বর নামক সেই রসিক বাস্তুকারের খেলায়, দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ, পুরুষ ও প্রকৃতি ! পুরুষের এক স্বভাব, নারীর আর এক স্বভাব। কোনও দামড়া ছেলে, সখি আমায় ধরোধরো-র কায়দায় চলাফেরা করলে, কেউ তার প্রশংসা করবে না। ছেলেরা বলবে, বেরো ব্যাটা লালিমাপাল [পুং], মেয়েরা বলবে মেনিমুখো। কোনও পুরুষ কোলে ছেলে ফেলে ঝিনুক-বাটিতে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছেন আর মেয়েদের মত গলা করে, টেনে টেনে, আদো আদো বুলি ছাড়ছেন, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও ওই যে পাখি, যাঃ পাখি ! দৃশ্যটা মনে হয়, যে স্কিমে এতকাল পৃথিবী চলছে, সেই স্কিমে খুবই বেমানান। ছেলেদের মেয়ে যাত্রার মত। ছবার গোঁফদাড়ি চেঁছে, চড়া মেকআপ মেরে, পরচুল, শাড়ি, লোমঅলা, মাস্‌ল ফোলা গেঁটে হাতে বালা পরে, বৃহন্নলার গলায় প্রাণনাথ, প্রাণনাথ বলে হাঁচরপাঁচর করার মতই হাস্যকর।

বাক্যে পর্বত কার্যে তুলাকার। সাজে-পোশাকে, ঠমকে-ঠামকে, কেতায়-কায়দায় দেশ ভুড়ভুড় করছে। একটা কথাই আমরা ভুলে গেছি, দো-দিল্ বান্দা কলমা-চোর, না পায় বেহস্ত, না পায় গোর। মেড-ইজির দেশে সবই ইজি, তবে ভেতর ফোঁপরা।

স্বাধীনতা দিবস, মানে, একদিন সরকারি ছুটি। সকালবেলা গুটি কয়েক বালক আর গুটিকয়েক পাগল আদর্শবাদীর ঢ্যাপঢ্যাপে ব্যাণ্ড সহ পথ পরিক্রমা। কয়েকটি স্কুলে একদল অনিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর সামনে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকার পতাকা উত্তোলন। পতাকাদণ্ডের চারপাশে চুন মাখান সাদা ইটের পলকা কেয়ারি। প্রথমেই পতাকার ভুল দড়ি ধরে টান। ওঠার বদলে পতাকা ভূমি স্পর্শ করতে চাইবে। ওটা নয় স্যার, ওটা নয় স্যার বলে একজন ছুটে এসে ঊর্ধ্বমুখী দড়িটি হাতে ধরিয়ে দেবেন। দলা পাকানো, আধ ময়লা একটি পতাকা নাতি ঊর্ধ্বে উঠে, 'আমি আর খুলবো না, আমি আর উঠব না', এই অভিমানে ঝুলতে থাকবে। সংক্ষিপ্ত ভাষণ, আজকের এই পুণ্য প্রভাতে, তোমরা বীর ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, নেতাজী সুভাষের আদর্শকে স্মরণ করো, এই দেশ সুজলাং সুফলাং, শস্য শ্যামলাং [রেশনের পচা চাল স্বদেশী নয় বিদেশী, ইংল্যানডের মাল] এই দেশেরই তোমরা সন্তান, মহাপুরুষের পথ অনুসরণ করে তোমরা অসংখ্য মহাপুরুষ সাপ্লাই করো। [দেখো, ফুড সাপ্লাইয়ের সাপ্লাই যেন

না হয়]। [পেয়ার আ রাহি হ্যায় ।] তোমরা ওদিকে কান দিও না, বাঁদররা লাউড স্পিকার ছেড়েছে। আমাদের মন্তর বন্দেমাতরম, ঋষি বঙ্কিম, নেতাজী সুভাষ, রবীন্দ্রনাথ [স্টক ফুরিয়ে আসছে] আমাদের আদর্শ [পেয়ার আ রাহি হ্যায়]।

স্বাধীন হাসপাতাল, যেখানে সব কিছুই জাল, খাট চলে যাচ্ছে, বিছানা চলে যাচ্ছে, খাবার চলে যাচ্ছে, ওষুধ চলে যাচ্ছে, ডাক্তার চলে যাচ্ছে, কুকুর যাচ্ছে, মিছিল পাশ করছে, সেখানে একদল ভাগ্যাধীন মানুষকে, গোটাকতক ফল বিতরণ, হলদে কোল্ড স্টোরেজ মার্কা মুসাম্বি। দু'চারজন হাই প্রেসারের প্রথামাফিক রক্তদান। আমাদের স্বাধীনতা।

সেই স্বাধীনতায় সব স্বাধীনতারই একটা শো উইনডো থাকবে। শাড়ি ছেড়ে জিনস, যদিও স্কি করছি না, কিংবা ঘোড়ায় চড়ছি না। সিগারেট ঠোঁটে। শরীরের কলকব্জা কমজোর হলেও মুক্তির মন্দির সোপান তলে। দু-চার পেগ। ইমানসিপেসান। ইনকামের কে ধার ধারে।

আগে মহিলারা, ফিঁচিৎ করে হাঁচতেন, শোনো যায় কি যায় না। সেইটাই ছিল শালীনতা, সভ্যতা। হঠাৎ একজন দোদমা হাঁচি হাঁকড়ালেন। মা, এটা কি হল ? বৃদ্ধের প্রশ্ন। মায়ের উত্তর, ব্যাশ করেছি। শেকল ছিঁড়েছি। মানছি না মানব না। বঙ্কার মত হাঁচব, পঞ্চার মত ঢেউ করে ঢেঁকুর তুলব। আমরা আর মা নই বাবা।

কচিপাঁঠা, বৃদ্ধ মেষ

ভাই নগেন,

মনে হয় এই আমার শেষ চিঠি। জীবন নিয়ে আর বোধ হয় বেশিদিন কালোয়াতি চলবে না। তোমার আমার মধ্যে দেনাপাওনা যা আছে চুকিয়ে নিলে ভালো হয়। তা না হলে সামান্য সামান্য জিনিসের জন্যে দু'জনকেই ভূত হয়ে ঘুরতে হবে। তোমার কাছে আমার হটওয়াটার ব্যাগটা দীর্ঘদিন হয়ে গেল পড়ে আছে। জিনিসপত্রে তোমার আবার তেমন যত্ন থাকে না। মনে হয় পাউডার দিয়ে রাখোনি। বুকে পিঠে তিনি হয় তো সেঁটে বসে আছেন। তোমার একটা হনুমান টুপি আমার কাছে আছে। সেই একদিন তোমার ওখানে শীতের বিকেলে বেড়াতে গিয়ে টাক মাথায় ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয়ে রাতে ফেরার সময় পরিয়ে দিয়েছিলে। ভাগ্যিস ভাই আমরা রাজনীতি করি না। করলে আমাদের মধ্যে কি অ্যাতো পেয়ার থাকত। পেয়ার শব্দটা কি পেয়ারা থেকে এসেছে ? আমি

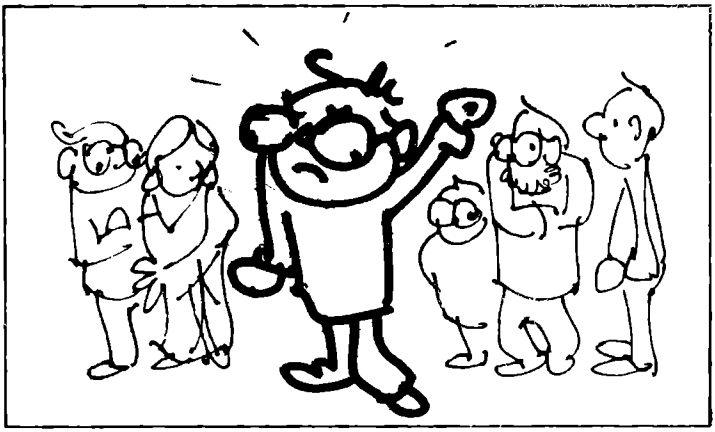

শিখেছি বিবিধ ভারতী থেকে।

একটা পুজো ভাই অতি কষ্টে পার করলুম। দ্বিতীয়টি পারবো কিনা জানি না। এ দেবী হলেন শ্যামা। এঁর চেলারা অতি ভয়ানক। কেউ শীর্ণ কাপালিক, কেউ স্ফীত। চালে চলনে শেরম্যান ট্যাঙ্কের মত। হুড়মুড় করে আসেন। কোনও বাধাই এই মহাসাধকদের কাছে বাধা নয়। কড়া নেড়ে পিলে চমকে দেবার ভয়ে তিন বছর আগেই দরজার কড়া খুলে ফেলা হয়েছে। আমাদের খুলতে হয়নি, খুলেছেন ঈশ্বর। পেতলের কড়া লাগাবার সময় মিস্ত্রি বলেছিল, বাবু লাগাচ্ছেন লাগান, রাখতে পারবেন না। তখন হ্যাঃ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, তিনি বছর আগে বুঝলাম, গরিবের কথা বাসি না হলে মিষ্টি হয় না। এখন তাই সার বুঝেছি, সারা দেশ জুড়ে সেই ইংরেজি নাচ চলেছে, যাকে বলে স্ট্রিপটিজ। ওই নাচ আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তোমারও হবে না। আমরা বড় সেকেলে। ইংরেজি থ্রিলার পড়ে জেনেছি, ব্যাপারটা অতিশয় থ্রিলিং। লাস্যময়ী নর্তকী, লাল নীল আলোর ঝরনায়, বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে অঙ্গ বস্ত্র মোচন করতে করতে ক্রমে উদোম হয়ে ধিতিং ধিতিং করে নাচতে থাকেন। আমাদের জন্মভূমি সেই নৃত্য শুরু করেছেন। পার্কের লোহার রেলিং খুলে চলে যাচ্ছে, ম্যানহোলের ঢাকা, কলের মুখ, কাজ করা জাফ্রি, সব খুলে জন্মভূমি নাঙ্গা নৃত্য শুরু করেছেন। আমার বাড়ির সব কাস্ট আয়রন রেন ওয়াটার পাইপ হাওয়া হয়ে গেছে। নাতির অন্নপ্রাশনে সপরিবারে আনন্দ করতে গিয়ে এই দুর্গতি।

আর কয়েকটা দিন মাত্র আছি। কালীপুজোর আগের দিন এ দেশে চোদ্দ

শাক, চোদ্দ প্রদীপ ইত্যাদির প্রথা আছে। বঁটিতে মেয়েরা ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে কোটে। সেই ভাবে আমাকে কেটেকুটে 'মায়ের ভোগে' লাগান হবে। ঠিক এই ল্যাঙ্গোয়েজ ছেড়ে গেছে ব্রাদার। এ কোন মা মাইডিয়ার নগা ! যাঁর পুজোর চাঁদা গলায় গামছা দিয়ে আদায় করা হয়। না দিতে পারলে সেবককে চলে যেতে হয় মায়ের ভোগে। চুল্লু বস্তুটা কি হে ভাই ! চুলো মানে উনুন ! চুল্লু কী বলো তো ! সুনীতিবাবু থাকলে একটা চিরকুট ছাড়তুম।

ভাই নগেন, আমরা যেন ভেড়া। সোস্যাল ভেড়া। সমাজ আমাদের ভেড়ার মত পুষছে। চাকরি করি, খাই দাই, বংশ বিস্তার করি। গায়ে ফুরফুরে লোম তৈরি হয় আর সমাজপালকরা ঠিক সময়ে এসে বেশ খোলসা করে জল মাখিয়ে ধারালো একটি ক্ষুর বের করে চেটেপুটে কামিয়ে নিয়ে চলে যায়। এই উল দেবার জন্যে সংসারের হুল খেয়ে বেঁচে থাকা।

আর ভাই, সে আর তোমাকে বলবো কি, মায়ের প্রণামী চাইতে আসার কোনও সময় নেই। এনি টাইম ইজ টি-টাইমের মত, এনি টাইম ইজ চাঁদা টাইম। এই কায়দাটি ভাই শিখে রাখো। শান্তির সময়ে কাজে লাগতে পারে। অপরিচিত ব্যক্তির বাড়ি ঢুকতে আমরা কতো সঙ্কোচ বোধ করি, ভয় পাই, ইতস্তত করি। ভাবি কেউ যদি অপমান করেন ! ছাড়পত্রটা কি বলো তো ! একটা চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে সোজা গেট খুলে ঢুকে পড়ো। গেট সব সময় লাথি মেরেই খুলবে, যেন ঝড়াং করে একটা বুক কাঁপানো শব্দ হয়। গৃহবাসী যেন গাইতে পারেন, ওই আসে, ওই অতি ভৈরব হরষে। পদাঘাতে প্রবেশ, চাঁট ছুঁড়ে প্রস্থান। চাঁদার খাতা কি বিরাট পাসপোর্টরে ভাই। উটি হাতে নিয়ে তুমি বাথরুমে গিয়েও ঢুকতে পারো। আসছে কে ? ভূতের বাবা, আবার কে ? ভাই, মাঝরাত, গেরস্ত দোর তাড়া বন্ধ করে দুর্গা বলে, পায়ে পা ঘষে ধুলো ঝেড়ে, মশারির মধ্যে সবে পা দুটি তুলেছেন। সংসারের ঘোলাজল থেকে আমকাঠের ছোবড়াতলে সংসারীর ঘণ্টা ছয়েকের খণ্ডপ্রয়াণ। উপাধানে মাথা রেখে সবে পাশ ফিরেছেন, অন্ধকার জানালায় পাশাপাশি দুটি মুখ। একটি আলোর বিন্দু বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। কে ?

অ্যায় যে দাদা, চাঁদাটা। গেরস্তের প্রশ্ন, কোথাকার ভাই ?

জলপ্রপাত সঙ্ঘ।

এই গভীর রাতে ভাই ?

আপানাদের গভীর রাত, আমাদের সন্ধ্যারাত। মাল ক্যাচ করার এই তো সময় গুরু। এখন আর কেউ বলতে পারবে না, বাবা বাড়ি নেই। নোলে পাইপ বেয়ে দুতোলার বেড রুমে একবার টুসকি দে।

ভাই নগেন এই আমার শেষ পত্তর। ডিমাণ্ড, পঞ্চান্ন, পাঁচের বেশি আমি

pathagar.net

পারবো না ভাই। মায়ের ভোগে চললুম। সেই শ্লোকটি তোমার মনে আছে ভাই,

কচি পাঁঠা, বৃদ্ধ মেষ
দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ।

আমি ভাই বৃদ্ধ মেষ। মায়ের ভোগে জমবে ভালো। মটন দো পেঁয়াজা উইথ এ সিপ অফ চুললু। প্রবচন আমরা কেমন মেনে চলছি, তুমি একবার দ্যাখো ভাই। কচি কচি পাঁঠাদের যেমন চিবিয়ে খাওয়া হচ্ছে, বৃদ্ধ মেষদেরও সেই রকম মূলে হাবাতে করা হচ্ছে। দইয়ের আগাটি প্রথামত নেপোয় মেরে যাচ্ছে। আর ভাই ঘোলের শেষ ? সেটি বাঙালীর বরাতে আর জুটল না। যুগ যুগ জিও ॥

ইতি প্রফুল্ল

রায়

ধর্মাবতার ! আগে প্রমাণিত হোক যে মানুষ পশু নয়, তারপর মনুষ্যোচিত রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে।

ফরিয়াদী হাজির ?

হাজির ধর্মাবতার।

প্রমাণ করো যে তুমি পশু নও।

আজ্ঞে, এ তো এক কথায় প্রমাণ করা যায় ধর্মাবতার ! উপনিষদ্ বলছেন, মানুষ হল অমৃতের পুত্র। আপনি অমৃতের পুত্র, আমি অমৃতের পুত্র, বড়বাজারের ব্যবসাদার সকল অমৃতের পুত্র, বিধানসভার ওঁরা সবাই অমৃতের পুত্র, মিনিবাস, ম্যাক্সিবাস, ট্রেন, ট্রাক-চালক, সবাই সবাই অমৃতের পুত্র।

হোয়াট ইজ অমৃত ?

আজ্ঞে গরলের উল্টো। ভেরি টেস্টফুল শুনেছি। সুদৃশ্য পাথরের তৈরি গলা সরু আধারে থাকে। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়ের মলাটে ছবি দেখেছি। ঘাগরা পরা সুন্দরী কাত করে গেলাসে ঢালছে। খৈয়াম আধবোজা চোখে বলছেন, ঢাল সাকী, ঢাল সাকী। মিষ্টি মিষ্টি খেতে। আঙুরের নির্যাস থেকে তৈরি। সমুদ্রের তলায় কেউ ফেলে রেখেছিল, সিজনিং-এর জন্যে। দেবতারা অসুরদের হাত থেকে ভোগা মেরে নিয়ে স্বর্গে চম্পট দিয়েছিল। সেই অমৃত পান করে প্রমত্ত হয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে ইয়ে করে, মানুষের জন্ম। সেখান থেকে ভায়া ইডেন হয়ে

উইদাউট টিকিটে এখানে আগমন। আমরা হুজুর অমৃতস্য পুত্রাঃ। শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হবার নয়।

হোয়াট ইজ শাস্ত্র ?

আজ্ঞে এক ধরনের বিশ্রী মলাট-অলা, ধেড়ে ধেড়ে টাইপে ছাপা, দেবভাষায় লেখা অপাঠ্য বই। কোনো কোনো মানুষ, সকালে স্নান করে, শুদ্ধ বস্ত্র পরে, কুটকুটে কম্বলের আসনে বসে, কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে এখনও পড়েন, আর মনে মনে ভাবেন খুব শক্তি হচ্ছে, শক্তি। রোজ সকালে এবম্বিধ গ্রন্থ পাঠে গৃহস্থের সুখ-শান্তি নাকি বৃদ্ধি পায়! পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, পুত্রগণ ব্যঙ্কে এক ইণ্টারভিউয়ে চাকরি পায়, কন্যাসকল সু-পাত্রস্থ হয়। শশ্রুমাতা, ননদ-নন্দাই সমভিব্যাহারে অঙ্গে ব্ল্যাকমার্কেটে কেনা দুর্লভ কেরোসিন তেল সিঞ্চন করে জোয়ান অফ আর্কের মত পুড়িয়ে মারে না। এই গ্রন্থ সকল পাঠে, গাড়ি হয়, বাড়ি হয়, টাকে সামান্য চুল গজায়, স্বামী নিগ্রহকারী স্ত্রীগণের জিহ্বা কোমল হয়ে মধু নিঃসরণ করে। সংসার হরিণের দুধের মত উথলে ওঠে। কর্তাসকল গাড়ি চাপা পড়ে, কি ট্রেন দুর্ঘটনায়, কি বাথরুমে বেকায়দায় থ্রম্‌বোসিসে আক্রান্ত হয়ে পটল তোলেন না। ঝানুবয়েসে বিজ্ঞাপনের ধবধবে সাদা বৃদ্ধের মত, নামী মিলের দামী পাজামা পাঞ্জাবি পরে, থিন অ্যারারুট বিস্কুট খেতে খেতে, টু ইন ওয়ান স্টিরিওসিসটেমে গজল শুনতে শুনতে সজ্ঞানে, সশরীরে, দাতব্য পশুচিকিৎসালয়ে নয়, মোজাইক মোড়া তিন লাখ টাকা দামের ফ্ল্যাটে, রেশমী চাদর মোড়া ডিভান থেকে, আন-আইডেণ্টিফায়েড ফ্লায়িং অবজেকটের মত একলাফে স্বর্গারোহণ করেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেন, অপ্সরাগণ দুন্দুভি বাজাতে থাকেন। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে বৃদ্ধকে লাদাই করে এসে উত্তরপুরুষগণ লকার খুলে মোহিত হয়ে যান। ইউনিট ট্রাস্ট উপচে পড়ে। ব্যাঙ্কের পাশ বই দেখে দৃষ্টি মোহিত হয়ে যায়, মনে হতে থাকে, আহো, কি সত্য ? মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্ণ সন্তোষধিঃ। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু। বড়খোকা মূল্য ধরে দিয়ে নব-কার্তিকের মত চুল না কামিয়েই শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করেন, ছোট খোকার কাঠবেড়ালী গোঁফ ঠোঁটের ওপরেই শোভা পেতে থাকে। ক্ষৌরী হয়ে ঘুরে বেড়ায় পাড়ার ন্যাপলা।

ওই অবসোলিট শাস্ত্র বলেছে বলেই তুমি পশু নও ? ওরে আমার পাঁঠারে ! ওয়েস্ট কি বলে, ওয়েস্ট !

ধর্মাবতার, ওয়েস্টকে কেন টানছেন হুজুর ! ইস্ট ইজ ইস্ট, ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট, দি টোয়েন শ্যাল নেভার মিট। নিগার বলে রেস্তোঁরা থেকে লাথি মেরে বাইরে ফেলে দেয়। বাস থেকে, কান ধরে নামিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে বেধড়ক গণধোলাই দেয়।

pathagar.net

বাস্ বাস্, তোমার কথাই প্রমাণ করছে তুমি পশু। ওয়েস্ট যদি মনে করে ইস্ট পশু, তার ওপর আর কথা চলে না। মামলা ডিসমিস। নাও রায় লিখে নাও, 'আমরা মানুষ' আন্দোলনের এই হতচ্ছাড়াটা নিজেকে মানুষ মনে করে, এখানে সেখানে চিঠিচাপাটি লিখে, পোস্টারমোস্টার মেরে সমাজের পশুবলের ক্ষতি সাধন করছে, সহ্যশক্তি কমিয়ে দিচ্ছে। এই অর্বাচিন এক দেশদ্রোহী। একে এমন এক জেলখানায় পাঠিয়ে দাও যেখানে কয়েদীদের উলঙ্গ রাখা হয় আর খেতে দেওয়া হয় জাবনা। মেয়াদ ! যতদিন না ব্যাব্যা ডাক ছাড়ছে।

ধর্মাবতার, আমি যে এখনও শেষ করিনি। ইস্টের স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েস্ট কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। ইস্টের উদয়শঙ্কর ওয়েস্টে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ইস্টের রবিশঙ্কর ওয়েস্টকে মিট করেছেন। আমাদের পলিটিস্যানরা ব্যবহারিক প্রাচ্যের প্রতিনিধি হয়ে শুধু ভিক্ষেই করে গেলেন, টাকা দাও, খাদ্য দাও, অস্ত্র দাও, কারিগরী বুদ্ধি দাও। শেষে এমন হল, দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ালেই হেঁকে বলে, ভিক্ষে হবে না। বাড়িতে অসুখ। ভিখিরি তাড়াবার জন্যে আমরা যেমন বলি আর কি ! আত্মিক প্রাচ্যের প্রতিনিধিরা কিন্তু ভিক্ষের বদলে সম্মানই কুড়িয়ে এনেছেন। ধর্মাবতার, আমরা পশু তো নই-ই, মানুষও নই, সত্যিই আমরা দেবতা। পশু হলে এতদিনে খোঁয়াড় ভেঙে বেরিয়ে এসে গুঁতোগুঁতি শুরু করতুম,মানুষ হলে সব চুরমার করে ভণ্ডামি আর ন্যাকামি আর ধাস্টামোর বারোটা বাজিয়ে দিতুম। দেবতা বলেই দিকে দিকে আমরা শিবনেত্র হয়ে বসে আছি। কণ্ঠের নীল আরও নীল হতে হতে কালো হয়ে এসেছে। নাচুক তাহাতে শ্যামা।

দর্শকের দরবারে

মিনতি কুণ্ডু, দরগা রোড। আপনি প্রশ্ন করেছেন, কলকাতা শহরটা কার ? ঠেলাঅলার, রিকশাঅলার, হকারদের, না লরি-চালকদের ?

শ্রীমতী কুণ্ডু খুব বাঁকা বাঁকা কথা শিখেছেন। আঁ। মেয়েরা অবশ্য অল্প বয়সেই পেকে যায়। আপনি একটু বেশি পেকেছেন। জেনে রাখুন, কলকাতা যারই হোক, আপনার নয়, আপনার পিতারও নয়। দয়া করে থাকতে দেওয়া হয়েছে, মুখ বুজে থাকবেন। অসুবিধে হলে, ইওরোপ, আমেরিকায় চলে যান। কেউ তো ধরে রাখেনি। আপনার প্রশ্ন, খোঁচা মারা প্রশ্ন। অসম্মানজনক তো বটেই। আপনি জানেন না, কলকাতা কার ? প্রশ্ন করে জানতে হবে ? একে বলে, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার ! সরাসরি এ প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি না, দেবো

pathagar.net

না। উত্তর নিজেই খুঁজে নিন। অযথা উত্যক্ত করবেন না।

বিধান সরখেল, বাজে শিবপুর রোড। আপনি লিখছেন, আমার বয়েস ষাট পেরলো। রাতে আমি এক কাপ দুধ ছাড়া, আর বিশেষ কিছুই গ্রহণ করি না। জীবনের প্রয়োজন নামাতে নামাতে একেবারে চাহিদার শেষ স্তরে নামিয়ে এনেছি। ইদানীং এক এক চুমুক দুধ খাই আর ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি, পোকা গিলে ফেললুম না তো ! মহাশয়, দুধে আজকাল যে সব পোকা থাকে, তা কী জাতীয় পোকা ! উইপোকা, বা ছারপোকা নয় তো ! উইপোকা হলে কিন্তু পাকস্থলীর পার্চমেন্ট খেয়ে শেষ করে দেবে ! ছারপোকা হলে, মিউকাস মেমব্রেনের তলায় গোপনে বংশ বৃদ্ধি করবে। উদরের অভ্যন্তরভাগ চুলকে উঠলে, কীভাবে চুলকোবো ! হাতের আঙুল তো পৌঁছবে না।

সরখেল মশাই, আপনার এই আতঙ্ক অজ্ঞতাজনিত। জেনে রাখুন, দুধের পোকা দুধই। যেমন বেদান্তবাদীরা বলেন, জলের বিম্ব জলই। আর একটু স্পষ্ট করে বলি, সবই ব্রহ্মোদ্ভূত। আপনিও যা, পোকাও তাই। খাদ্যও যা খাদকও তা। মায়াচ্ছন্ন বলেই আপনার এই ভেদজ্ঞান। রোজ সকালে একপাতা পরিমাণ গীতা পড়ুন না ! বয়েস তো হল ! এখনও কীট-বিজ্ঞানীর মত পোকামাকড় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন ? পারেনও বটে ! বৈরাগ্য আর কবে আসবে ! সব সময় এই শ্লোকাংশটি মনে মনে বলবেন, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-কর্মসমাধিনা। তার অর্থ কি—যত পোকাই আপনি গিলুন না কেন, সবই আপনার জঠরাগ্নির পথে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাচ্ছে। আপনার বরাতেও, আজ হোক, কাল হোক সেই একই পরিণতি নাচছে। আপনার জন্যে অবশ্য অনেক কাঠকুটো, চিতার প্রয়োজন হবে। আপনি অনেক বড়জাতের পোকা। আপনাকে জল, কি দুধের সঙ্গে গিলতে হলে স্বয়ং ব্রহ্মাকে সশরীরে অবতীর্ণ হতে হবে। ব্রহ্মা সরাসরি কিছু গ্রহণ করেন না। তাঁর উদর হল, চিতা। সে চিতা মানুষকেই তৈরি করতে হয় পয়সা খরচ করে।

আমাদের গরুহীন গোশালা থেকে কৃত্রিম সহজপাচ্য যে দুগ্ধ জনসাধারণে পরিবেশিত হয়, তার আর এক নাম সাইকোলজিক্যাল দুধ। দুগ্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করলে দুগ্ধ, জল বিশ্বাসে গ্রহণ করলে ধবল পানীয়। সরখেল মশাই, জলে দু-একদানা পোকা থাকলে অত লম্ফঝম্পের কি আছে ! পোকায় মানুষ মরে না। পাখির আহার পোকা ! জানেন কি, হাঁড়িচাচা পাখি শোঁয়াপোকা খায়। জীবজগতের কোনও খবরই রাখেন না ! ষাট বছর বয়েস নিয়ে বসে আছেন থেবড়ে।

জেনারেল নলেজও তেমন নেই, বেশ বোঝাই যাচ্ছে। এ যুগ হলে আর চাকরি মিলত না। দুধের বদলে জল খেয়েই জীবন ধারণ করতে হত।

ফরাসীদের প্রিয় খাদ্য পচা পনীর। ভোজসভায় সম্মানিত অতিথিদের সামনে সেই পনীরখণ্ড রাখা হয়। খোঁচালেই কিলবিল করে বেরিয়ে আসে মোটামোটা পনীর পোকা। সম্মানিত অতিথিরা কাঁটা দিয়ে গাঁথার জন্যে টেবিলের চারপাশে ছোটাছুটি করতে থাকেন। সে এক মজা! ভোজের সঙ্গে মিশে যায় শিকারের আদিম আনন্দ। পনীরের চেয়েও সুস্বাদু এই পনীর পোকা। তেমনি পুষ্টিকর।

জাপান কী করেছে খবর রাখেন? সেখানে পেট্রোলিয়াম প্রোটীন তৈরি হয়েছে। পেট্রোলিয়াম জেলিতে সে দেশ পোকার চাষ সফল করেছে। এক একটা পোকা এক একটা পাঁঠার সমান প্রোটিন সমৃদ্ধিতে। বনসাইয়ের দেশ তো! বিশাল বটকে যারা টবে খাটো চারা বানাতে পারে, তারা পাঁঠাকে পোকার আকার দেবে, এ আর এমন কি আশ্চর্যের! সে দেশের মানুষ অবশ্য সরাসরি পেট্রল পোকা খাচ্ছে না। গন্ধের জন্যে। তারা খাচ্ছে, ভাবে সপ্তমী করে। ওই পোকা খাওয়ান হচ্ছে শিলমাছকে। বাড়তি প্রোটীনে শিল গায়ে গতরে ফুলে উঠছে। সেই গতরঅলা শিল যাচ্ছে মানুষের পেটে। মানুষের গতর ফুলছে।

সরখেল মশাই, পুরনো সব ধারণা পালটাবার সময় এসেছে। পৃথিবী প্রগতির পথে তরতর করে ছুটছে। তবু যদি আপনার মন খুঁত খুঁত করে, সাদা জলে এক ফোঁটা ক্লোরিন ফেলে খান।

বিজয় মাখাল, গণেশ অ্যাভিনিউ। আপনি প্রশ্ন করেছেন, দীর্ঘজীবন লাভের উপায় কি?

হাসালেন মশাই ! এই বাজারেও দীর্ঘজীবন লাভের বাসনা ! বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের পরিকল্পনায় এখনও বেশ খামতি আছে, তা না হলে বেঁচে থাকার ইচ্ছে প্রবল হয় কি করে ! আমরা সেই যুগের প্রবর্তনা করতে চাই, যে যুগের মানুষ তারস্বরে শুধু বলবে—'ছেড়ে দে'মা কেঁদে বাঁচি।' তবু যখন দীর্ঘজীবনের বাসনা, তখন শুনুন, নিদ্রাই হল দীর্ঘজীবন লাভের গোপন কথা। রাতের বেলা গেঁজে ওঠা পান্তা মেরে কাঁথায় কেতরে পড়ুন।

দরবার শেষ হল। এখনও যাঁবা খাড়া আছেন তাঁরা কাটা কলাগাছের মত লটকে পড়ুন। শুভ রাত্রি।

দর্শকের দরবারে দ্বিতীয় অধিবেশন

নিমচাঁদ মিত্র লেন থেকে মিনু কারফরমা লিখছেন, গত ২৫শে বৈশাখ আমার স্বামী রাত নটার সময় পাড়ার পানবিড়ির দোকানে আমার জন্যে ছাঁচি পান কিনতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। ফেরার পথে রাস্তায় শুয়ে থাকা একটি কালো কুকুরের পেটে পা তুলে দেওয়ায়, সেই অসভ্য, বদমেজাজী বাঁদর কুকুর আমার স্বামীকে কামড়ে-কুমড়ে ফর্দাফাই করে দিয়েছে। ডাক্তার বলেছেন কুকুরটাকে নজরে রাখতে আর আমার স্বামীকে তলপেটে ছত্রিশটা ইনজেক্সান নিতে হবে। আমিও চাকরি করি। অফিস কামাই করে সেই কালো কুকুরটাকে নজরে রাখার চেষ্টা করছি। মুশকিল হল পাড়ায় কালো কুকুরের সংখ্যা একাধিক। কোন্ কুকুরটা কামড়েছিল, কেমন করে বুঝবো ? খুনী মানুষকে ফিংগারপ্রিন্ট দেখে ধরার ইচ্ছে থাকলে ধরা যায়। কুকুর ধরার উপায় কি ? কুকুরের দাঁত পরীক্ষা করে ধরার কোনও উপায় আছে কি ? থাকলে, সেই দফতর কোথায় ? লোডশেডিং না হলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। আমার প্রস্তাব, কালো কুত্তা আর লোডশেডিং একই পাড়ায় একসঙ্গে থাকা উচিত নয়। আমার স্বামীর ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে আমাকেই বিধবা হতে হবে, আমারই কপাল পুড়বে। সানতালডি, কি ব্যাণ্ডেল বিধবা হবে না। আপনারা জনদরদী, প্রতিকারের ব্যবস্থা করে আমাদের সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় করুন।

শ্রীমতী কারফরমা, আপনার দুর্ভাগ্যে আমরা ব্যথিত। এই দুর্ঘটনার জন্যে লোডশেডিং বা কুকুর কেউই দায়ী নয়। লোডশেডিং আমাদের প্রাতঃকৃত্য। ওটি না হলে আমাদের কোষ্ঠকাঠিন্য হবে। আর কুকুর ! কুকুরের কাজ কুকুর করেছে। আপনার স্বামীকে কুকুরে কামড়ায়নি, কামড়েছেন আপনি। বেচারা প্রেমের দংশনে এখন ভুগে মরুন। এই ঘটনা থেকে যে সত্যটি জানা গেল, তা

চেচ্ছে ডগ-বাইট আর লাভ-বাইট একই প্রকারের। যে স্বামী স্ত্রীর-ছাঁচিপান সেবার জন্যে রাত নটার সময় বিপদসঙ্কুল রাস্তায় বেরোন, তিনি জরু-কী গোলাম। আপনি কি সেই ভদ্রমহোদয়ের দ্বিতীয় পক্ষ ? না, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা ? না, সদ্য বিবাহিত ? আপনার লজ্জা করে না, কারফিউয়ের সময় স্বামীকে ঠোঁট রাঙাবার জন্যে পান কিনতে পাঠান ? জেনেশুনে নিজের লালসা পরিতৃপ্তির জন্যে পরের ছেলেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে সিঁথির সিঁদুরের জন্যে প্যানপ্যান করছেন ! আসলে স্বামী আপনার কাছে একটি সিম্বল মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, ইনসিওরেনসের সিম্বল। একটু ধমকধামক দিলুম বলে কিছু মনে করবেন না। আমরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। সন্ধের পর রাস্তায় বেরোবার কি দরকার। ঘরে বসে প্রেমালাপ করবেন, ঝগড়া করবেন, উল বুনবেন। এই গ্রীষ্মকাল, পিঠে ঘামাচির চাষ করতে পারেন না ?

হালফিল কাগজে পড়েছেন, লোডশেডিং আরও বাড়বে। সুতরাং এ অন্ধকার যান্ত্রিক উপায়ে দূর করা যাবে না। একমাত্র পথ, সাধনভজন। অন্তরের আলোয় আলোকিত না হলে, টিকটিকি লোভী বেড়ালের মত হাঁ করে ওই ডাণ্ডা আলো আর ঘটি আলোর দিকে সারারাত তাকিয়ে বসে থাকতে হবে। ডাণ্ডা আলোর যুগ চলে গেছে। এখন ডাণ্ডাবাজি, বোমবাজির যুগ। শ্রীমতী, সন্ধেবেলা রাস্তাঘাট তাদের জন্যে ফাঁকা করে দিন, যারা নিজেদের সামলাতে জানে, যারা গণতন্ত্রের সেবক, যারা নতুন যুগের উদয়-সূর্য।

আমরা অবশ্য দুটি বিকল্প পরিকল্পনার জন্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথা ভাবছি। দুটি নয় তিনটি।

প্রথম পরিকল্পনা রাস্তার জেব্রাক্রসিংয়ে যে সাদা রঙ লাগানো হয়, সেই সাদা রঙ কালো কুকুরের গায়ে লাগালে, সহ্য করতে পারবে কিনা। পারলে ক'মাস অন্তর লাগাতে হবে। খরচের পরিমাণ কি দাঁড়ায় ! সে খরচ আসবে কোথা থেকে। খরচ অবশ্য আমরা ট্যাক্স চাপিয়ে তুলে নিতে পারবো। যেমন, বাসের কি ট্রামের টিকিটের ওপর সিনেমার টিকিটের মত প্রমোদকর বসিয়ে দেবো। বাসে-ট্রামে ভ্রমণ তো এখন প্রমোদ ভ্রমণই। সিনেমার চেয়ে কম কিসে ! সেক্স আছে, ভায়োলেন্স আছে, নায়ক আছে, নায়িকা আছে, খল নায়ক আছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কুকুরকে বাগে আনার জন্যে কিছু বাঘ ছেড়ে দিলে কেমন হয় ! সন্ধেবেলা ছাঁচিপান কেনার বায়নাও কমবে। রাতবিরেতে ফূর্তি করে বাড়ি ফেরার সময় ছেনতাই হলে, পুলিসের কাছে গিয়ে কাঁদুনি গেয়ে তাদের আর উত্যক্ত করা হবে না। মিথ্যে মিথ্যে ফিরিস্তি গাইতে হবে না, আমার

pathagar.net

সাতশো টাকার ঘড়ি গেছে, গেছে হয়তো দেড়শো টাকার মাল ; আমার তিন ভরির হার গেছে, গেছে হয়তো গিল্টিমাল। বাঘ ছাড়লে শহরটা হয়তো অভয়ারণ্যের চেহারা নেবে। ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকসান বাড়বে। তাছাড়া কবি গাহিয়াছেন, বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি, আমরা হেলায় নাগের খেলাই নাগেরই মাথায় নাচি। কবিরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। কবির মর্যাদা রক্ষা জাতীয় কর্তব্য।

তৃতীয় পরিকল্পনা ম্যানহোলের ঢাকা আমার প্রিয় ভাইয়েরা চম্পট করে দিয়েছে। যে কটা পড়ে আছে, সে কটাও আমরা নিজেদের গরজেই সরিয়ে দেব, আর ওই হোল্-এ মিথেনগ্যাস ভরে, রাতে শহরের মানুষকে আলেয়ার খেলা দেখাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করব। পৃথিবীর কোনও শহরে এমন ব্যবস্থা আছে ! আমেরিকায় আছে ? হনুলুলুতে আছে ? কামস্কাটকায় আছে ? নেই। সাধে বলে হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টোডে, ইণ্ডিয়া থিঙ্কস টোমোরো। কোন্ শহরে গোলগাল মানুষ ঝপাং করে জলে পড়ে যায় ? পোল হল ভাগের মা। নিজে গঙ্গা পাবে না। গঙ্গা পাবে পোলচারী !

আচ্ছা, শুভ রাত্রি ! নার্স ইওর বেবি। যাঁদের নাক ডাকে, তাঁরা সারারাত জেগে থাকুন। নিজে না ঘুমিয়ে অন্যকে ঘুমোতে দিন। লক্ষ্মী ছেলে !

দর্শকের দরবারে তৃতীয় অধিবেশন

মধুমিতা মজুমদার, গুলু ওস্তাগর লেন। আপনি লিখছেন, কলকাতার একটি পথচিত্র তৈরি করলে সাধারণ পথচারীর সবিশেষ উপকার হয়। নাবিকদের জন্যে 'ন্যাভিগেশন-চার্ট' যে রকম অপরিহার্য, পথচারীদের জন্যেও পথচিত্র অনুরূপ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে ইদানীং। এই চার্ট কলকাতা-হাওড়া স্ট্রিট ডাইরেকটরির মত সকলের পকেটে পকেটে থাকবে প্রাণের দায়ে। খুব বিক্রি হবে। বিক্রয় লব্ধ অর্থ রাজকোষে যেতে পারে, অথবা শহীদ বেদী নির্মাণে ব্যয় করা যেতে পারে। এই পথ চিত্রে একটি সেতুচিত্রও যেন যুক্ত হয়। কোন্ সেতুতে কটা গর্ত আছে, কোন্ পাশে কি ভাবে আছে, তাদের আকার আকৃতি কি রকম, যেমন কোনটায় পা গলে, কোনটায় কোমর গলে, কোনটায় পুরো মানুষটা গলে, সবই যেন চিহ্নিত করা হয়। কোন্ সেতু শুধু মনের জোরে বাতাসে ভাসছে, সেটিও জানাতে দ্বিধা করবেন না। এদেশে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, বাতাসে ভাসমান নিরালম্ব সেতু থাকাও বিচিত্র নয়। এ'হল সেই দেশ, যেখানে ঘি-লেস-ঘি, তেল-লেস-তেল, মেডিসিন-লেস-মেডিসিন, দুধ-লেস-দুধ,

মানুষ-লেস-মানুষ পাওয়া যায়। সুতরাং গার্ডার-লেস, জয়েন্ট-লেস, নাট-বল্টু লেস, ফ্যান্টম-সেতু থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। ডার্ক সাইড অফ দি মুনের মত, সেতুরও একটি তলদেশ আছে। ওপরটাই যখন ভাল করে দেখা সম্ভব হয় না, তলায় তখন কি ঘটছে, ঘটবে ঈশ্বরই জানেন। সেতু-নির্দেশ বাজারে ছাড়লে দায়িত্ব পুরোপুরি জনসাধারণে বর্তাবে। কর্তৃপক্ষ ঝাড়া হাত পা হয়ে যাবেন। কিছু ঘটলে বুক ফুলিয়ে বলা যাবে, আমরা তো বলেইছিলাম, ও পথে বাড়াসনে তুই পা! নিজের দায়িত্বে পারাপার হতে গিয়ে পগারপারে গেছ। কমপেনসেসানের প্রশ্নও থাকবে না। মহাশয়, আপনি কি কখনও লন্ড্রী-বিলের ফুট-নোটটি পড়ে দেখেছেন! না পড়ে থাকলে কি লেখা আছে শুনবেন, কাটা, ছেঁড়া, পোড়া, চুরি, হারানো, কোনও কিছুর জন্যেই লন্ড্রী—দায়ী নয়। তার মানে, কাচতে দিয়ে জামা-কাপড় যে ফিরে পাচ্ছ, এই তোমার বাপের ভাগ্যি। সেই একই কায়দায় জনজীবনের বৃহত্তর ব্যবস্থায় এই রকম একটি পাদটীকা জুড়লে কেমন হয়, চাপা পড়লে, খুন হলে, রেলে কাটা পড়লে, গর্তে কি গহ্বরে তলিয়ে গেলে, বাসের ভেতর ভিড়ের চাপে চিঁড়ে চ্যাপটা হলে, জাঁকাতে চলমান ট্রেন থেকে লাথি মেরে ফেলে দিলে, ট্রেন উলটে পটল তুললে, ঘরের মধ্যে বোমা ছুঁড়ে মানুষ মরে কি-না পরীক্ষা করলে অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর কোনও ব্যাপারে কোম্পানী দায়ী নয়।

পথ-চিত্রে দেখান যেতে পারে, **এক** ॥ কোন্‌পথ বাস্তবে আছে, কোন্ পথ শুধুই নামে আছে। **দুই** ॥ কোন্ পথের দুপাশ আছে, এক পাশ আছে, মাঝখান আছে। **তিন** ॥ ম্যানহোল ও গর্ত ডাইরেক্টারি, কোন্ পাশে কোথায় কি ভাবে ফাঁদ পাতা হয়েছে। আমরা তো শত্রু-পক্ষ নই যে মাইন পেতে ব্যাটেলিয়ানকে ব্যাটেলিয়ান উড়িয়ে দিতে হবে! আমাদের সম্পর্ক তো ব্যাধ আর খরগোসের

pathagar.net

নয়, যে ফাঁদ পেতে ধরতে হবে ?

শ্রীমতী মধুমিতা, বয়েস আপনার কত চিঠিতে তার উল্লেখ নেই, তবে বেশ ডেঁপো হয়েছেন। মনে রাখবেন, বিদ্রূপ হজম করার শক্তি আমাদের আছে। আপনার লজ্জা করে না, সব কাজ আমাদের করে দিতে হবে কেন ? নিজেরা কিছু করতে শিখুন। চোখ আর কান সজাগ রাখুন। বর্ষায় ভরাডুবি হলে বিপদ আরও বাড়বে, তার জন্যে মাথা খাটিয়ে একটা কিছু বের করুন। কোমরে মাপ-মত পাতকুয়ার পাড় বেঁধে হাঁটাচলা করলে, গর্তে পড়ে গেলেও তলিয়ে যাবার আশঙ্কা কমবে। কোমরেই আটকে থাকবেন। পরে প্রিয়জন এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে জগৎটাকেও চেনা হবে। পিতা আপন, কি মাতা আপন, কি পুত্র আপন, কি প্রেমিক প্রেমিকা আপন, স্বামী আপন, কি স্ত্রী আপন ? দেখা যাবে অনেকেই পড়ে রইলেন, কেউই আর উদ্ধার করতে এল না। যাক আপদ গেছে বলে সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। সেই সব বেওয়ারিশ মালেদের আমরা ডিসপোজালে ঝেড়ে দোব। হাফ দামে; লাটের মাল। শ্রীমতী মধুমিতা এই পৃথিবীতে কেউ কারুর নয় মালক্ষ্মী। সেতু আপনার নয়, পথঘাট আপনার নয়, শহর নয়, গ্রাম নয়। কেন মিছিমিছি মাথা ঘামিয়ে রাতের ঘুম নষ্ট করছেন ! আমরা এখন যে সব পরিকল্পনার কথা ভাবছি, তা হল, লোহার পাতের প্রতি এক ধরনের মানুষের ভীষণ দুর্বলতা। গণতান্ত্রিক ব্রিজের প্রতিটি নাট-বল্টু জনসাধারণের। রাগ করে খুলে নিলে কিছু করার নেই। তবু আমরা অনুরোধ করে দেখব। ব্রিজের সামনে নোটিস ঝুলিয়ে দোব—'একটু একটু করে ব্রিজ খুলে নিসনি রে পাগলা ! শেষে নিজেই আর নদী পেরোতে পারবি না।' ইতিমধ্যে আমরা বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলব,খরচ যা লাগে লাগুক আমরা প্লাস্টিকের ব্রিজ তৈরি করাব। আর একটা পরিকল্পনাও আমাদের মাথায় ঘুরছে, ঢালাই ব্রিজ। পুরো ব্রিজ ঢালাই করে বসিয়ে দাও। চুরি করতে হলে পুরো ব্রিজটাই তুলে নিয়ে যেতে হবে।

আমরা রাস্তা সম্পর্কে নতুন এক গবেষণায় ব্যস্ত। ম্যানহোলের তলায় কি আছে ? নিশ্চয়ই একটা তল আছে। অতল বলে কিছু নেই। ডাঙ্গা আর গর্ত, দুটো আলাদা শ্রেণী, পাশাপাশি থাকায় যত শ্রেণী সংঘাত। গর্ত হল শোষিত শ্রেণী। আমরা ক্লাসলেস শহর গড়তে চাই। ডাঙ্গা আর রাখব না। ম্যানহোলে, ম্যানহোলে, হোলে হোল করে শহরটাকে হলো করে হেলের লেভেলে, নামিয়ে দোব। উত্থানের পতন আছে। কিন্তু পতনের পতন নেই। মানুষ যেখানে পড়ে আমরা সেইখানে নেমে গিয়ে মানুষের জয়গান গাইব।

শুভরাত্রি। শুয়ে পড়ুন। স্বপ্ন দেখুন, অটোভানের, বিদেশের রাস্তাঘাটের, সাজানো শহরের। ও সবই হল তামসিকতা। জয় নরকের জয়।

দর্শকের দরবারে চতুর্থ অধিবেশন

সোনালী শর্মা, গড়বেতা। আপনি লিখছেন, মান্যবরেষু ! [মান্যবরেষু লেখায় বড় খুশি হলুম। আমাদের আজকাল কেউ আর তেমন মানেটানে না। অমান্য করাটাই যুগধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমদের স্কুলে শ্যামল সাহা বলে একটা ছেলে, হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছা খুলে দিয়েছিল বলে তাকে রাস্টিকেট করা হয়েছিল। আর এখনকার কালে ! কাছা খুলতে পারলে, সে জাতীয় বীরের সম্মানে ষাঁড়ের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ায়। মহাদেবের মত সম্মান পায়।]

যাক, আপনি লিখছেন, পশ্চিমবঙ্গে ছোট-বড় কত সাঁকো আর সেতু আছে আপনারা জানেন কি ? জেলা পলিটিকসে মানুষই জেরবার। কারুর একটা চোখ আছে, তো আর একটা নেই, হাত আছে তো পা নেই, পা আছে তো হাত নেই। সব সময় যুদ্ধ চলেছে। ডাকাতও তেমনি বেড়েছে। কে ডাকাত আর কে ডাকাত নয় বোঝাই দায়। ফলে যার যাকে সন্দেহ হচ্ছে তাকেই পিটিয়ে দিচ্ছে। শত্রু-মিত্র চেনা যাচ্ছে না বলে সকলেই সকলের শত্রু। এই অবস্থায়, নদী, নালা, সাঁকো সেতু, শিক্ষা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি, এত এলেবেলে ব্যাপার, মাথা না ঘামালেও চলে। পা দুটো থাকা মানেই চলা। পথ থাকলেও চলবে, না থাকলেও চলবে। মানুষের চলা, কারুর বাপের ক্ষমতা নেই থামায়। গ্রামের জন্য বা জেলা শহরের জন্য আমি ভাবছি না। যদ্দিন পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়ে বাঁশ আছে তদ্দিন খানাখন্দ পেরোবার ভাবনা আমরা করি না। বাঁশ দিয়েই সব ব্যবস্থা করে নেবো। আমার ভাবনা খোদ কলকাতাকে নিয়ে। সেখানে আপনাদের বসবাস, চলাফেরা। কত বড় বড় লোক, চৌপর দিন শহর চৌরস করে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের জীবনের কত দাম ? একজন ধনী মানুষ দীর্ঘজীবী হওয়া মানে, দশের কত লাভ ! কত সিল্কের শাড়ি কিনবেন, জমি কিনবেন, গাড়ি কিনবেন। গয়না গড়াবেন, সারা জীবনে এক বাগিচার মত কমলা লেবু, আপেল, লিচু, আম, আনারস শেষ করবেন। এক সরোবর মাছ। তেমন খাইয়ে হলে একপাল ছাগল কালিয়া-ফর্মে গর্ভে স্থান করে নেবে। কত টন চাল আর গম খাবেন তার কোনও হিসেব নেই। এই অঙ্ক, কেউ কি কখনও করেছেন—ষাট বছর বাঁচলে একজন মালদার যত মাল খাবেন, আশি বছর বাঁচলে তার কত গুণ বেশি খাবেন ! একটা পুরো ডিস্টিলারি খেয়ে ফাঁক করে দেবেন। অর্থনীতির পালে যাঁরা বাতাসের টান ধরান, তাঁদের জীবনের দাম নেই। সাদা টাকাকে এক চক্কর ঘোরালেই কালো টাকা। কালোর কদর তো এঁদেরই হাতে ! অন্যদেশে এই কালো-প্রীতি কত সম্মান, কত পুরস্কার নিয়ে আসতে পারত। একজন গরিব মানুষের জীবনের কি দাম ? তায় আবার হারাধনের দশটি ছেলে, সব কটাই অপঘাতে মরে। একজন

গরিব মানুষ সারা জীবনে বড় জোর গোটা চারেক কুমড়ো আর এক কুইন্টাল বোগড়া চাল খাবে। অর্থনীতিতে তার খাতির একটা আলপিনের চেয়ে বেশি হতে পারে না। এই সব বড় মানুষ আর আপনাদের নিরাপত্তার জন্য আমার এক ক্ষুদ্র পরিকল্পনা সবিনয়ে পেশ করছি

ব্রিজের তলায় লম্বা করে জাল ঝুলিয়ে দিন। মহাশয় আপনি নিশ্চয় ক্যারামবোরড দেখেছেন ? চারটে পকেটেই জাল লাগানো থাকে। পকেটে ঘুঁটি পড়ে জালে ফুলতে থাকে। খেলা শেষে উদ্ধার করা হয়। ঠিক সেই কায়দা ! লম্বা একটা জাল পোলের তলায় ফিট করে দেওয়া হোক। ম্যাগনেটিক জাল হলে লাগাবারও সমস্যা নেই। লোহার সঙ্গে টানে সেঁটে থাকবে। সহজে চুরি করা যাবে না।

আজকাল হঠাৎ হঠাৎ মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি, কিশোর কিশোরী। এই ছিল, এই নেই। অনুসন্ধানে কর্তৃপক্ষকে প্রায়শই বিরক্ত হতে হয়। মানুষ ছিল, মানুষ নেই, এ আর নতুন কথা কি ! তার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধরে কেন টানাটানি ? মানুষ কেন অদৃশ্য হয়, তার কতকগুলি সুচিন্তিত কারণ খুঁজে বের করা হয়েছে। কেউ নিরুদ্দেশ হলে যে কোনও একটি কারণের মধ্যে ফেলতে পারলেই সমাধান হয়ে গেল, যেমন মহিলা হলে, ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে সংসার-সংসার খেলা করতে বেরিয়েছেন, কিম্বা বোম্বে গেছেন নায়িকা হতে। কিম্বা কোথাও গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছেন দাবি আদায়ের ছলে। যেই কাগজে বেরোবে, 'মান্তু, ফিরে আয়, যা করতে চাস কর। বাপ-মা আর চোখ খুলছে না।' অমনি কলিংবেল বেজে উঠল মান্তু আ গিয়া। বুড়ো অদৃশ্য হওয়া মানেই, হয় দেনার দায়ে, কি মেয়ের বিয়ে দেবার আতঙ্কে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছেন। তেমন আলো-বাতাসের সাপ্লাই পেলে যে-গুহাতেই থাকুন চালিয়ে যাবেন অনেকদিন। আর তা না হলে পরস্ত্রীর সঙ্গে দূরে বহুদূরে চলে গেছেন প্রেমালাপ করতে করতে। সময়, তারিখ, বার, দিক, স্থান-কাল-পাত্র সব ভুল হয়ে গেছে। বয়েস কোনও ব্যাপারই নয়। দুটি মাত্র কারণে মানুষ হাওয়া হয়ে যায়, এক, প্রেম, আর এক, চিত্রতারকা হবার টানে ! তৃতীয় কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে—দেখুন গিয়ে, ব্রিজের তলায় জালে আটকে ঝুলছে কি না !

উটমুখো-নরনারী নিচে থেকে চিৎকার করে খোঁজ নিচ্ছেন, প্রফুল্ল আছে, প্রফুল্ল ? সাধুচরণ তুমি কি জালে পড়েছ ? পতিব্রতা স্ত্রী বিরহকাতর গলায় চিৎকার করবেন—হ্যাঁ গা, তুমি কি জালে জড়িয়ে আছ ?

শ্রীমতী শর্মা, ঔদ্ধত্যের একটা সীমা আছে। তবে জেনে রাখুন, পুরনো লছমন-ঝুলাটা আমরা হাফ-প্রাইসে কেনার তালে আছি। অথবা আমাদের

pathagar.net

রেজিমেন্ট গিয়ে যারা ট্রেন খোলে, ড্রেন খোলে, পার্কের রেলিং খোলে, বিশাল উঁচু বাতিস্তম্ভ থেকে বাল্‌ব খোলে, তারা গিয়ে উটিকে রাতারাতি খুলে এনে বলবে—এই নাও দড়ির পোল, বদলে দাও লোহার পোল।

দর্শকের দরবারে পঞ্চম অধিবেশন

গাদাগাদা চিঠি এসেছে স্যার। যথারীতি গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দি!

না হে, কিছু কিছু চিঠির জবাব আমি দিতে চাই, দর্শকের দরবারের কায়দায়। জনসংযোগের বড় সুন্দর মাধ্যম। চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দেব, সব চিঠির নয়, কিছু কিছু নির্বাচিত চিঠির। তুমি ঘোষণা করে দাও, দরবার চালু…।

সময় স্যার? কোন্ সময়ে দেবেন?

মাঝরাতে ঘুম আসে না, সারা রাত দেশের চিন্তায় দু' চোখের পাতা এক করতে পারি না।

দেশের চিন্তা না গেঁটে বাতের ব্যথা?

ডোণ্ট বি সিলি। ঘরের শত্রুর সাজা জানো?

এখন রাত বারোটা। যাঁরা দাঁতের যন্ত্রণায়, পেট মোচড়ান ব্যথায়, খিদের জ্বালায়, মশার কামড়ে, কি গৃহবিবাদে চোখ জবাফুলের মত লাল করে ঘরে ঘরে বিনিদ্র, তাঁরা এবার তটস্থ হোন, দর্শকের দরবারে শুরু হচ্ছে। কান খাড়া রাখলেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন। ব্যাপক তরঙ্গে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। ক্যালেণ্ডার-মুক্ত যে কোনও দেয়ালের দিকে তাকান।

নমস্কার। আমি বলছি। আপনারা সব কে কেমন আছেন ভাই। আমি ভালো আছি। রাতে কম খাবেন। লঘুপাক হলেই ভালো হয়। শুধু বাতাস আর জল আরও ভালো। মন ফসফস করলে দুটি হাল্কা ধরনের ফুলবাতাসা। বাত, মানে আমাদের বাত আর আপনাদের আশা, দুয়ে মিলে সন্ধি করে বাতাসা। বড় মিঠে জিনিস। জলে ভিজিয়ে খেলে পেট ঠাণ্ডা। পেট ঠাণ্ডা মানে মাথা ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা মাথাই হল অগ্রগতির হাতিয়ার। ঠাণ্ডা জিনিস খাবেন। পান্তাভাত, লাউ, কুমড়ো। মাছ, মাংস, ডিম, নাই-বা খেলেন। পয়সা বাঁচবে। দুশ্চিন্তা কমবে। ট্যাক্স ফাঁকি দিতে ইচ্ছে করবে না, ঘুষ নেবার ইচ্ছে হবে না।

প্রথম চিঠি। হরেনচন্দ্র কাবাসী, গুমখুন লেন, কলকাতা। আপনি লিখছেন, সংবাদপত্র দৃষ্টে অবগত হইলাম, আগামী পঞ্চাশ বৎসরেও কলিকাতার জল-জমা সমস্যার কোনওরূপ সমাধান সম্ভব নহে। আকণ্ঠ পচাজলে নিমজ্জিত হইয়া, খলরবলর করিয়া পাঁকাল মাছের মত নিত্য জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে।

উক্ত সমস্যা সমাধানে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে হাজার হাজার টাকা খরচ হইল তাহাতে কোন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইল ? রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি হইল। বিশাল বিশাল পাইপ আসিল, যানচলাচল বিপর্যস্ত হইল। সংবাদপত্রের শিরোস্তম্ভে, বিজ্ঞাপনের চৌখপ্পরে প্রচুর কাব্য-নির্যাস ঝরিয়া পড়িল, বিশিষ্টাঞ্চলে বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন-পাটাতনে লিখিত হইল, তিলোত্তমা তিলে তিলে তিলাইয়া উঠিতেছে। হায় ঈশ্বর ; তিল অবশেষে তাল হইয়া, সব তালগোল পাকাইয়া, জনসাধারণের গ্যাঁটের কড়ি কর হিসাবে করায়ত্ত করিয়া জাদুকর এখন নাচিয়া নাচিয়া বলিতেছেন, খেল খতম, পয়সা হজম।

কাবাসীমশাই, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি ? জনসাধারণ, ট্যাক্সের টাকা, টাকা কোথায় গেল, এ সব প্রশ্নের কোনও মানে হয় না। বলতে হয় তাই বলেছেন, লিখতে হয় তাই লিখেছেন। সরকার চালাতে গেলে টাকা চাই। লক্ষ্য করুন, আমি সরকার বলেছি, দেশ বলিনি কিন্তু। দেশের চেয়ে সরকার বড়। প্রজার অর্থেই সরকার চলে। কিভাবে চলে, কে চালায় এ সব কথা সাধারণ মানুষের মনে থাকে না, মাথাও ঘামায় না। মন্দিরে প্রণামীর থালায় পয়সা ফেলে, পরের দিন মা কালীকে এসে কেউ প্রশ্ন করে না, হিসেব দাও। করলেও উত্তর পায় না ; কারণ, দেবদেবীরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন না।

কাবাসীমশাই, আপনি একটি গবেট। আপনার চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি না, তবে অনুমান করতে পারছি। মাথাটা কাতলা মাছের মত মোটা, ড্যাবাড্যাবা বুদ্ধিহীন অনুজ্জ্বল চোখ, নিচের ঠোঁট পুরু, সব সময়েই ফাঁক হয়ে থাকে, নাকটা থ্যাবড়া। সব কথাতেই বোকার মত প্রশ্ন করেন, অ্যাঁ কি বললে ? সহজে কোন কথা বুঝতে পারেন না। সাধারণ একটা যোগ করতে পরিবেশনকারীর মত অক্ষরের সিঁড়ি বেয়ে অনবরতই ওপর-নিচ করেন। লোকে আপনাকে ইডিয়েট, ডান্‌স, হুলো ইত্যাদি বলে, আপনি শুনতে পান না। আপনার কানের পাতায় কড়ানে কড়ানে চুল আছে।

কাবাসীমশাই, এই দেশে আমরা একটা আধ্যাত্মিক ওয়ার্কশপ খুলেছি। এই পরীক্ষাগারে আমরা দুটো সত্যের ক্লিনিকাল পরীক্ষা চালিয়েছি। এক নম্বর, আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই, টাকা মাটি, না মাটি টাকা ? দু নম্বর, কর্মে আমাদের অধিকার আছে, কর্মফলে নয়। আমাদের দেখতে হবে, এই ভাব সত্যি সত্যিই মনে আনা সম্ভব কিনা ?

কাবাসী, ভাইয়া আমার, দুটি সত্যই সত্য, একেবারে পরীক্ষিত সত্য। মাটিতে টাকা ঢালতে ঢালতে আমরা প্রমাণ পেয়েছি, মাটিই টাকা। আর আমরা এ প্রমাণও পেয়েছি, কর্মই হল সব, ফলটা কিছুই নয়। ভাই রে, এ হল সেই বৃক্ষ, যার ফুল আছে ফল নেই। ডিয়ার কাবাসী, বয়েস নিশ্চয়ই অনেক হল, কোন

অন্ধকারে পড়ে আছেন ভাই, সব কিছুতেই ফল খোঁজেন ? ফল না খুঁজে আঁটি খুঁজুন।

জীবনের সেইটিই সার সত্য। আঁটি চুষতে চুষতে, জীবনের যে কটা দিন বাকি আছে কাটিয়ে শ্রীহরি বলে বিদেয় হোন। রাত অনেক হল। শুভ রাত্রি। এবার শুয়ে পড়ুন। কাল ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা দিন। যা নেই তা আছে মনে করে, ললিপপ চোষা শিশুর মত মুখটি হাসি হাসি করুন। বলুন, হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে বিশ্ববাসী।

ছত্রপতি

অনেক রকমের মানুষ। অনেক রকমের ছাতা। হালফিল বর্ষার অভিজ্ঞতা। নিরীহ মানুষ আছে আবার বলদর্পী মানুষও আছে। বৈষ্ণব আছে। শাক্ত আছে। প্রাণহীন ছাতা মানুষ বিশেষে চরিত্র পায়। যেমন বেত। ঝাড়ের শান্তশিষ্ট লিকলিকে বেত পণ্ডিত মশাইয়ের হাতে মারাত্মক। গাড়ির স্টিয়ারিং। লরি-চালকের হাতে বেপরোয়া। একই জুতো, কেরানীর পায়ে মিনমিনে। বড় সয়েবের পায়ে অহঙ্কারে মসমসে। কোমরের বেল্ট। মাস্তানের বেল্ট প্রাণসংহারী।

আমাদের হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাবুর বগলে সারাবছরই একটি ছাতা থাকে। ডাক্তারবাবু টুকটুকে ফর্সা, ছাতাটি কুচকুচে কালো। সাদা টুইলের শার্টের ওপর বড় সুন্দর খোলে। ছাতা বগলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলেছেন। পথচারী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—ডাক্তারবাবু ছাতাটি খুলুন না। তিনি মৃদু হেসে বললেন—এটি আমার গ্রীষ্মের ছাতা, বর্ষার নয়।

তার মানে ?

মানে অতি সহজ। জল পড়লেই কালো রঙ গলে গলে গায়ে পড়বে।

ছাতার শুধু চরিত্র নয় রকমও আছে। একহারা শিক, দোহারা শিক। সিল্কের কাপড়, নাইলনের কাপড়, প্লেন কাপড়। বাঁশের বাঁট, বেতের বাঁট, লোহার বাঁট। হাতলের রকমারি বাহার। এক ধরনের হাতল আছে, অনেকটা লম্পট লম্পট দেখতে। দেখলেই শরীর সিরসির করে।

গোব্দাগাব্দা মেহনতী ছাতার পাশাপাশি, শৌখিন ছাতাও আছে। ছাতার সমাজে মানুষের সমাজের মতই শ্রেণীবৈষম্য খুঁজে পাওয়া যাবে। ছাতা আর রুমাল বড় বেশি ক্লাস-কনসাস। ধনীর রুমাল আর সাধারণ মধ্যবিত্তের রুমাল দেখলেই চেনা যায়। যে সব ছাতা গাড়িতে গাড়িতে ঘোরে তাদের চেকনাই

BanglaBook.org

অন্যরকম। যত্নে লালিত, ভিটামিনপুষ্ট শিশুর মত। পিওনের ছাতার সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে না।

আজকাল আবার পিলে চমকানো, পায়রা ওড়ানো ছাতা বেরিয়েছে। ভদ্রমহিলা বোতাম টিপলেন। মেয়েদের সোহাগের ধমক—ভ্যাট্ শব্দে ছাতা খুলে গেল। ভদ্রলোক বড় কাছাকাছি ছিলেন। চশমাটি শিকের ঝাপটায় পাখা মেলে নাকের ডগা থেকে উড়ে, সচল ব্র্যাবোর্ন রোডে ছিটকে পড়ল। উদ্ধারের আগেই চাকার তলায়। মোলায়েম একটি 'সরি', মহিলা অটোমেটিক ছাতা মাথায় কলকাতার প্যাচপেচে বর্ষাকে রমণীয় করে ব্যাঙ্ক অফ টোকিওর দিকে ছুটলেন। বোতাম টেপা ছাতার কল্যাণেই তলপেটে একজনের চোদ্দটি চলেছে। শ্রাবণী কুকুর একটু খিপ্ত মেজাজে থাকে। কুকুর তো আর মানুষ নয়। ছাতার ধমক সহ্য হল না। তেড়ে এসে পায়ে কামড়। নাও, এখন পাস্তুরে হাজিরা দাও। বিজ্ঞানের কেরামতি।

ফোল্ডিং ছাতার আর একটি শ্রেণী আছে। ধাপে ধাপে খুলতে হয়। প্রথমে লক খোলো। না লক নয়। প্রথমে খাপ খোলো। তারপর ফিতে খোলো। তারপর লক খোলো। আধখানা আছে উল্টো ভাঁজে, কায়দা করে ভাঁজ খোলো। টেনে লম্বা কর। তারপর এক ঝটকায় খুলে ফেল। চটাপট বৃষ্টি। ছাতা খুলতে খুলতেই ভিজে একশা। ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখে আগেই খুলে না রাখলে, না খোলাই ভাল, কারণ আবার ধাপে ধাপে মুড়ে খোলে ঢোকাতে হবে। বাজনার চেয়ে খাজনা বেশি। বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁরা এমন ছাতা সঙ্গে রাখেন, কদাচিৎ খোলেন। প্রয়োজনে অন্যের ছাতার তলায় মাথাটি ঢুকিয়ে দেন। শরীরটি দকারান্ত হয়ে ছাতার বাইরেই পড়ে থাকে। মাথাটি ছত্রধারীর গতির বেগে চলতে থাকে। দেখলে মনে হবে, কেউ যেন চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে।

সাবেককালের বড় ছাতার আশ্রয়ে স্বার্থপরের মত একা একা চলার উপায় নেই। যে কোনও শেডের তলা থেকে দাদা, দাদা বলে, ম্যানেজ মাস্টার কেউ না কেউ ছুটে এসে আশ্রয় নেবেই। কোয়ালিশানের যুগ। তিনি লম্বা হলে, আমার হাতে দিন বলে, ছাতার দখল নিয়ে নেবেন। চলতে চলতে বলবেন, ভিজচেন নাকি! যার ছাতা তিনি লাজুক লাজুক গলায় বলবেন, না, না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। নিজের ছাতার গড়ান জলে, ডানপাশ কি বাঁপাশ সপসপে করে, মনে মনে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করলেও, মুখে কিছু বলবেন না। শেষ পাওনা একটি থ্যাংকস, ফাউ ফ্লু।

যুগ পালটে গেছে। এ যুগ হল—'কে তুমি হরিদাস পালের যুগ।' আজকাল কেউ কাউকে পথ দিতে চায় না। গায়ে জোর থাকলে ঠেলে ধাক্কা মেরে সরাতে

হয়। না হয় ধাক্কা খেয়ে পাশে টাল খেয়ে পড়তে হয়। গরুর নিয়ম। গরু কখনও পথ ছাড়ে না। সোজা চলে। শিং আছে, বিশাল ভুঁড়ি আছে, সেই জোরে চারপাশে সব উল্টে পাল্টে ফেলে গদাই লস্করি চালে চলতে থাকে। এখনকার মানুষ সেই দৃষ্টান্তই অনুকরণ করে গুরু হয়েছে। মার ধাক্কা, গদাম।

এখন সব ছাতাই সেই কারণে বীরের ছাতা। কিছু দুর্বলের ছাতাও আছে। খোঁচা খেয়ে হেলে যায়। পার্শ্বচারীর টাকে শিকের ঠোকর মেরে গালাগাল খেয়ে ফিরে আসে। আধুনিক ছাতা, আধুনিক বাসস্থানের মতই উচ্চতায় খাটো। বীরের মাথায় সে জিনিস অতি সাংঘাতিক। তেড়ে এসে চোখে খোঁচা মারতে চায়। বীরে বীরে খেলা বেশ ভালই জমে। ছাতায় ছাতায় ইন্টারলক হয়, শিংয়ে শিং লাগান গরুর মত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। দুই বীরই বলতে থাকে, আয় দেখি তোর হিম্মত কত!

প্রাচীনের যুগ এখনও শেষ হয়নি। বাঁশের হাতলঅলা ম্যাগনাম ছাতা মাথায় প্রাচীন মানুষটি চাঁদনী দিয়ে চলেছেন। উল্টো দিক থেকে আসছে প্রতাপশালী ছাতা। সংঘর্ষ এড়াতে প্রাচীনের হাতটি উর্ধ্বে উঠল। তারপর আর মনে নেই। চাঁদনীতে পাহাড়ী ধস! মাথার ওপর ঝুলছিল পথ-বিপণির নানা মাপের স্যুটকেস, ব্রীফকেস, চেন, শিকল ইত্যাদি। সব নেমে এল ঘাড়ে। সমাহিত অবস্থায় মধুর দুটি বাক্য কানে এল—মার শালাকে। আজকাল আবার জিওগ্রাফী পাল্টে দেবার যুগ। দিকে দিকে নতুন ভূগোল তৈরি হচ্ছে। ছাতা আর ছাতাধারী, দু'জনেরই জিওগ্রাফী বদলে গেল।

সংবাদ সমীক্ষা

নানা সমস্যায় জর্জরিত এই দেশের এখন প্রধান সমস্যা হল আলু। পোট্যাটো। বস্তুটি বিদেশী। স্বদেশের ঘাড়ে চেপে বসেছে। কবে, কোন সময়ে ঐতিহাসিকরা জানেন। সুসময়ে আলুর দাম কেন বাড়ছে! কে বাড়াচ্ছে! কিভাবে বাড়াচ্ছে আমাদের জানা দরকার। অন্য জিনিসের দাম বাড়ছে বাড়ুক। চিন্তার কারণ নেই। মাছের দাম বাড়তেই পারে। মাছ গভীর জলের প্রাণী। মাছ বড়লোকের পাতের জিনিস। মাছের কেজি একশো টাকা হলেও গরিবের কাঁচকলা। কাপড়জামার দাম বাড়ুক। তাতে কাপ্‌তেনদেরই অসুবিধে। গরিবের গামছা, কি ট্যানাই সম্বল। জুতোর দাম চারশো টাকা জোড়া হলেও চিন্তার কোনও কারণ নাই। জুতো শহুরে বাবুদের পদশোভা। নিম্নবিত্ত মানুষ জুতোর পরোয়া করে না। সিগারেট! বাড়ছে বাড়ুক। সিগারেট যে ঠোঁটের শোভা সে

ঠোঁট সাধারণ ঠোঁট নয়। সিগারেটের বিজ্ঞাপনে যাঁদের ধূমপান করতে দেখা যায় তাঁরা কারা। চিনতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হয় না। তাঁরা সব রাজা রাজড়া। ভেলভেটের শয্যায় সুন্দরী রমণী ঊর্ধ্ব মুখী চাতক ঝুঁকে আছে যে পুরুষ, তিনি যুবরাজ। কবজিতে সোনার ঘড়ি। ঘরের সে কি শোভা ? যেন ফাইভস্টার হোটেল। কাপড়ের বিজ্ঞাপনে যে সব জুটি সেজেগুজে আঁচল উড়িয়ে ম্যাগাজিনের পাতায় কি পথ-মোহনার মাথার ওপর থমকে থাকেন তাঁরা কি এই ধূলার ধরণীর প্রাণী ? তাঁরা সব স্বপনচারিণী। কিন্তু আলু ? আলু বিজ্ঞাপনের বিষয় নয়। রাঙা ঠোঁটে সুন্দরী আলু কাটছেন আর তলায় লেখা আছে, 'রাঙা ঠোঁটে রাঙা আলু' এমন বিজ্ঞাপন জীবনে কেউ কখনও দেখতে পাবেন না। আলু-কাবলী অবশ্য রূপসীদের বড় পেয়ারের জিনিস। ফুচকা সহযোগে, ভেলপুরির ভিতের ওপর অম্বলের সৌধ রচনা করে।

আলু আমাদের নিদ্রাহরণকারী সমস্যা। সেই আলু সম্পর্কে আমরা একটি তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব রাখছি। বিবেচ্য বিষয়সূচী **এক** আলু কাকে বলে। **দুই** কত রকমের আলু আছে। গোল আলু, ঠিকরে আলু, নৈনিতাল আলু, খামালু, রাঙালু, মোমালু, গজালু। **তিন** আলুর রোগ, যেমন মাজরা, পোকা, ঝাঁঝরা পোকা, ধসা রোগ। **চার** আলু ও হিমঘর। **পাঁচ** হিমঘর ও মজুতদার। **ছয়** মজুতদার ও ব্যাংক। **সাত** আলু ও জনজীবন। **আট** আলুহীন জনজীবন। **নয়** আলুজাত দ্রব্যের ওপর কর, যেমন আলুকাবলী, আলুপরোটা, আলুটিকিয়া, আলুভাজার ওপর কর চাপালে রাজকোষে বাড়তি আয় হিসেবে যে টাকা আসবে সেই টাকায় কুমড়োর চাষ বাড়ালে জনসাধারণের সমস্যা ঘুচবে কি না ! **দশ** আলুর বিকল্প কি হতে পারে ? কচু ?

ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে কমিটি গঠিত হবে তার নাম হবে পোটাটো প্রবলেম কমিটি। ইতিমধ্যে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা যে সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করে এনেছেন তার নির্বাচিত অংশবিশেষ বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে।

আপনার নাম ? 'আজ্ঞে গোলোক সাঁপুই।' কি করেন ? 'আজ্ঞে, আগে অনেক কিছু করতুম। এখন আর কিছু করি না। স্বাধীন। চুপচাপ বসে থাকি। ফুরসত পেলে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করি।' বাঃ বাঃ বেশ ভালো কাজ। তা আপনি আলু খান ? 'আজ্ঞে খাই।' কি আলু খান ? গোল আলু, নৈনিতাল, ঠিকরে, না, রাঙা আলু ? 'আজ্ঞে কাটা আলু।' সেটা কি জিনিস ? 'যে সব আলু পচে যায়, সেই সব আলু কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে বাজারে বিক্রি হয় কম দামে, তাই কিনে এনে মাঝে মধ্যে রান্না করে খাই।' মাঝে মধ্যে কেন ? রোজ খান না ? 'আজ্ঞে রোজ কি আর খাওয়া যায়, না খাওয়া উচিত ? ওই বড় ছেলে

pathagar.net

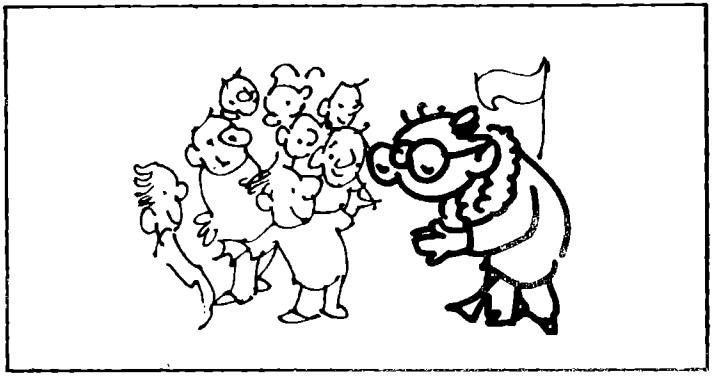

যেদিন কিছু কামাই করতে পারে সেই দিনই হাঁড়ি চাপে। তাও বাবু কামাই হলেই যে হাঁড়ি চাপবে এমন কোনও কথা নেই। চুল্লু খাবার পর যদি কিছু বাঁচে, তার মেজাজ যদি ভাল থাকে তবেই।' রোজ আপনারা তাহলে কি খান ? 'আজ্ঞে, ঈশ্বরের দেওয়া বাতাস, সেটা তো রোজই পাওয়া যায়। ডোবার পচা জল, তাতেও আপনার বেশ কিছু জিনিস আছে, আর বুনো শাকপাতা, তাতেও অবশ্য আকাল ধরেছে, খুব টান, সবাই খাচ্ছে তো।' এভাবে বেঁচে আছেন কি করে ? 'সে আপনার ঈশ্বরের ইচ্ছে। গরু ছাগলও তো এইভাবেই বেঁচে আছে।' বেঁচে থাকতে আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ? 'সে আপনার বলি কি করে ? বলা উচিত হবে না। তেনারা রাগ করবেন।' কে, ঈশ্বর ? 'আজ্ঞে না মালিক। ঈশ্বর কি সন্তানের কথায় রাগ করেন ? যাঁরা ওই ভোট নিয়ে যান, তেনারা রেগে গেলে আজকাল বড় মারধোর করেন।' অ, তা এই আলুর দাম বাড়ায় আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে। 'আজ্ঞে, তেমন আর কষ্ট কি ? রোজ যাঁরা খান তাঁদেরই কষ্ট। আমরা নমাসে ছমাসে একদিন কি দু'দিন খাই।' দুর্বল লাগে না ? 'আগে লাগত। যখন উঠে হেঁটে বেড়াতুম, এখন তো হুজুর শুয়ে বসেই কেটে যায়। পাঁচ বছরে একদিনই যা একটু হাঁটতে হয়। ওই ভোটের দিন।'

আপনার নাম ? 'মিনু মাইতি।' কি করেন ? 'ঘর সংসার।' আলুর এই অসময়ে মূল্যবৃদ্ধিতে আপনার ওপর খুব চাপ পড়েছে তাই না ? 'তা একটু পড়েছে।' প্রতিদিন আপনার কত আলু লাগে ? 'তা এক কিলো লাগে ?' আপনার সংসার কি খুব বড় ? 'একদম ছোট। কত্তা, গিন্নি, আর একটা বাচ্চা। আসলে আমার স্বামী খুব আলুখোর। রোজ একতাল আলুভাতে চাই, তবে বাবুর ভাত ওঠে।'

আপনার নাম ? 'বিপিন পাল।' বয়েস ? 'সত্তর। পেশা ? 'এক সময়ে মোক্তারি, এখন অবসরভোগী।' আলু খান ? 'আজ্ঞে না, সুগার।' তাহলে বেঁচে গেছেন, কি বলেন। 'বেঁচে গেছি মানে ! রসিকতা হচ্ছে ছোকরা ! পাঁচশ চল্লিশ সুগার, বেঁচে গেছি ?' আজ্ঞে না, এই আলুর দাম বেড়েছে তো ? 'আ মোলো ! মানুষের দাম ছাড়া কোন জিনিসের দাম বাড়েনি ?' লাস্ট কোন ইয়ারে আলু খেয়েছেন ? 'ফিফটি সিক্সে।' আলুর তখন দাম ছিল আট আনা সের। বালি বালি নৈনিতাল। কি তার টেস্ট ! সে আলু এখন কোথায় ? তার শুকনো শুকনো দম, আর খাস্তা লুচি। আহা ! শোন হে ছোকরা, সে আলু তোমরা খাওনি।

হায় পোশাক

ধুতি পাঞ্জাবি-পরা বাঙালী কোথায় গেল ? স্বভাবে যেমন বিপ্লব এসেছে, সাজপোশাকেও এসেছে। লিবারেটেড মহিলারা ব্লাউজের হাতা ছেঁটে ফেলে দিয়েছেন। চুলে কোপ মেরেছেন। মেজাজে মিলিটারি হয়েছেন। বিবাদি বাগে দশ বছর আগে অফিসের সময়ে যত মহিলা দেখা যেত এখন তার অন্তত তিনগুণ বেশি দেখা যায়। মহিলাদের গাম্ভীর্য বেড়েছে, দায়িত্ব বেড়েছে। বাঙালীর সংসার অনেক রুক্ষ হয়েছে। শিশুদের শৈশব নেই। কিশোরের কল্পনা নেই।

বাঙালীর ধুতি পাঞ্জাবি ঘুচিয়েছে পার্টিশান। স্বাধীন হবার পর থেকেই আমরা সায়েব হতে শুরু করেছি। আমরা মনে বাঙালী, লিভারে পিলেতে, ফুসফুসে, হৃদয়ে, মগজে বাঙালী। কর্মে বাঙালী। শুধু জীবনযাত্রার ধরনে ক্রমশ সায়েব থেকে সায়েবতর হয়ে উঠছি।

দেশবিভাগের পর, দু'দেশের মানুষ একদেশে ঠাসাই হয়েছে। মমার-চকার অবস্থা। বছরে বছরে চক্রবৃদ্ধি হারে আমরা বেড়েছি। মানুষে মানুষে থইথই চারপাশ। ধুতি আর পাঞ্জাবি একটু ফুরফুরে জিনিস। ফেলাও হয়ে থাকতে চায়। খেলার মত খেলাবার মত প্রশস্ত জায়গা চায়। ধুতি পাঞ্জাবি পরে কুচকাওয়াজ চলে না, যা অনবরতই চলছে রাস্তাঘাটে, বাসেট্রামে, হাটেবাজারে।

শৌখিন মানুষের পাঞ্জাবির হাতায় গিলে থাকত। গিলে-করা পাঞ্জাবি পরে, মিহি ধুতির কোঁচা দুলিয়ে মুখে একটি ছাঁচিপান ফেলে বাঙালী অফিসবাবু আয়েস করে ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে বসতেন। হাতে একটা বই থাকাও বিচিত্র ছিল না। ঢুলে ঢুলে ট্রাম চলেছে। ঢুলে ঢুলে বাবু চলেছেন।

ট্রাম আছে। বাসও আছে। তবে তাতে যে বসার আসন থাকে সে কথা প্রায় ভুলেই গেছি। সে যুগে গিলে পাঞ্জাবি পরে উঠতে হত, এ-যুগে গিলে হয়ে নামতে হয়। জামা কেন চামড়া পর্যন্ত গিলে হয়ে যায়।

আমাদের জীবন ধরে অদৃশ্য এক মেজর জেনারেল মোক্ষম এক নাড়া দিয়েছেন। ঢিলে ঢালা যা কিছু ছিল সব টাইট হয়ে গেছে। জীবন এখন বাঁধনে বাঁধনে টাইট। খাটে শুয়ে প্রাণখুলে হাতপাছড়াতেও ভয় হয় কারুর গায়ে পা না লেগে যায়। এখন সব স্কিন-টাইট। রেডিমেড পোশাকের নাম, হিপ-হাগার। ট্রাউজারের নাম ডবল বুল।

আগে বাস বা ট্রাম থেকে আমরা নামতুম এখন ছাড়াতে হয়, নারকেল ছোবড়া ছাড়াবার মত করে। ভগবানের ডিফেকটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং। মানুষ তেমন নিটোল প্রাণী নয়। চতুর্দিকে তার খোঁচা খাঁচা। ইংরেজিতে যাকে বলে প্রোজেকসান। পা ছ্যাতরানো, হাত ঝোলা। পায়ে পা জড়িয়ে যায়, হাতে হাত ঢুকে যায়। শরীরটাকে জটলা থেকে বের করতে হয় অনেক কায়দায়। এই শরীরে ঝোলাঝালা জামা কাপড় আর এক সমস্যা। ধুতি পাঞ্জাবি এই কামড়াকামড়ি, আঁচড়া আঁচড়ির যুগে অচল।

প্যান্টের বদলে কোনওদিন ধুতি পরে বেরোলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা চোখ বুজিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিও প্রভু। এমনিই তো রাস্তাঘাটের যা অবস্থা ! আগে মানুষ গাড়ি চাপত, এখন মানুষে গাড়ি চাপে। বেড়াতে বেড়াতে ফুটপাথ মাড়িয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে নামে।

চীনেরা দুটো কাঠি দিয়ে অনায়াসে চৌমিয়েন খায়। অনভ্যস্ত হাঁ করে দেখে। কাপড় সামলাবার কায়দা জানা চাই। এগার হাতের একটা ফলাও ব্যাপার। পঞ্চাশ ইঞ্চি বহর। কোঁচা কাছা। কোঁচার ভারে কাছার দিকটা উঠে যায়। দুটো পা সমান রাখাই এক সাধনা। বাতাস দিলে তো কথাই নেই। মাঝেমাঝেই হাত দিয়ে বাঁপায়ের দিকটা নামাতে হয়। নয়তো কুঁচকিতে গিয়ে উঠবে। পায়ের ফাঁকে লটরপটর কোঁচা ঢুকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে চায়। কলকাতায় মানুষ আর কুকুরের সংখ্যা এখন প্রায় সমান সমান। মাঝে মধ্যে বুলেটের মত কুকুর ছুটে এসে পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে চায়। ট্রাউজার পরা থাকলে বাধা পায় না। এমনও দেখেছি, অবশ্য হামেশা ঘটে না, কাছায় কোঁচায় কুকুর জড়িয়ে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করছে।

যানবাহনে এমন দৃশ্যও দেখেছি, ভদ্রলোক বাস থেকে নেমেছেন। রাস্তায় পা। কাছাটি ভেতরে আটকে গেছে, হাতলের খোঁচায়। কথায় বলে না, মামা কখনও আপনার হয় না। বাসও তাই। কখনও আপনার হয় না। তুমি নামলে, কি নামলে না, দেখার দরকার নেই। টিং টিং ঘণ্টা। ছুটলো বাস। আটকানো

pathagar.net

কাছা ভদ্রলোক চড়কের সন্ন্যাসীর মত ঝুলতে লাগলেন, রাস্তার এক বিঘৎ ওপরে। পাছে কোঁচা-কাছা খুলে যায়, কোমরে পুলিশের বেল্ট। রাস্তার লোক হে রে রে রে করছে। ভেতরের যাত্রী গেল গেল করেছ। চড়কগাছে ঝুলছে গাজনের সন্ন্যাসী। এ দুর্মতি কেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল।

এ দৃশ্যও চোখে পড়েছে। ভদ্রলোক নেমেছেন। কোঁচাটি ফুটবোর্ডে। তার ওপর জনাদশেক চেপে পড়েছে। যথারীতি বাস ছেড়ে দিয়েছে। কোঁচার মালিক পথে, কোঁচার প্রান্ত পাদানিতে। রোক্‌কে রোক্‌কে! আর রোক্‌কে। কোঁচা খুলছে ফর্ ফর্ করে। পুরো ধুতিটা লেত্তির মত বেরিয়ে গেল ফড়াত করে, ভদ্রলোক অন্তর্বাস পরে ঘুরতে লাগলেন লাট্টুর মত।

শেষ দৃশ্য, কোঁচা উড়িয়ে বাবু চলেছেন। পাশ ঘেঁষে হুস করে একটি গাড়ি চলে গেল। বাম্পারের বেরিয়ে থাকা অংশে কোঁচার অর্ধাংশ। উড়তে উড়তে চলে গেল দূর থেকে দূরে। ধুতির যুগ শেষ। ট্রাউজার চলছে। জাঙ্গিয়ার যুগ আসছে। বিজ্ঞাপন ক্রমশই ফলাও হচ্ছে।

যুগ যুগ জিও

খরা হোক, দুর্ভিক্ষ হোক, হানাহানি, কাটাকাটি হোক, রাজকোষ শুকিয়ে যাক, বেকারে দেশ ছেয়ে যাক, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই তুঙ্গে উঠুক, ডুবে যাক তরী, ভেসে যাক তরী, কর্তব্য কর্মে অবহেলাকরা চলবে না, যে সময়ের যা সেটি অবশ্যই করতে হবে, শুধু করতে হবে না। গত বছর যে স্কেলে হয়েছে হাল বছরে তা যেন অন্তত দশ কি বিশ গুণ বেশী মাত্রায় হয়। এ ব্যাপারে ইংরেজ আমাদের অনুকরণীয়, ডু ইওর ডিউটি কাম হোয়াট মে।

তখন খুব খরা চলছিল। গেল গেল অবস্থা। পাওয়ার প্ল্যান্ট চলেছে হিংলাজের তীর্থ যাত্রীর মত। এই উঠছে, দু'কদম এগিয়েই বালির ওপর মুখ গুঁজড়ে ধমাস করে পড়ে যাচ্ছে। দেশের দিকে তাকালে উৎসব আনন্দানুষ্ঠান করার মেজাজ থাকে না। তা বললে তো চলে না। আমরা বৈদান্তিক কর্মবীর। মানুষ মরবে, মানুষ বাঁচবে, মানুষ যাবে, আসবে। দুর্ভিক্ষ হবার হলে হবে। আলো জ্বলার হলে জ্বলবে, নেবার হলে নিববে। কলকারখানা চলার হলে চলবে, না চলার হলে না চলবে। অত সহজে থেমে গেলে চলবে না। আমরা যথারীতি মহাসমারোহে, দাঁত বের করা, পর্যটন মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা শহরের চারপাশে আলোর মালা ঝুলিয়ে, গলায় গামছা দিয়ে চাঁদা আদায় করে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছি। আমরা বাবা ধার্মিকের জাত। ভেজালই মেশাই, কি

pathagar.net

ঘুষই নি, কি বউকে পুড়িয়ে মারি, কি অপোনেন্টের পেটে ছুরি চালাই, ধর্মই আমাদের ব্যাকবোন। সেলাইট ফাঁকিবাজ বলে আমরা সমালোচিত। পূর্বপুরুষরা কথায় কথায় চীন জাপানের কথা তুলে আমাদের লজ্জা দিতেন। ধার্মিক হবার পর থেকে আমাদের লজ্জা স্বভাবতই চলে গেছে, কারণ লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। অন্য বৈষয়িক কাজে আমাদের গতর নড়ে না ঠিকই, ধর্ম কাজে আমরা একেক জন একাই একশো। কেউ বলতে পারবে না দেবীর আরাধনায় আমরা ফাঁকি মেরেছি। উৎসবের সমান্যতম কমতি হয়েছে। আমরা ফাটিয়ে দিয়েছি।

সাধকরা সাধারণত উদাসীন হন। তাঁরা কালাতীত, বর্ণাতীত, মোহশূন্য, মায়ামুক্ত জীব। কোথায় কে মরল, কে বাঁচল, কটা গ্রাম পুড়ে ছাই হল, শিশু হত্যা নারী নির্যাতন, ফ্যালফেলে, ড্যাবড্যাবে চোখের ওপর ঘটে যায়। গায়ে লাগে না। জীবনই বা কি মৃত্যুই বা কি ! আমরা সাধক। কত কি ধুম ধাড়াক্কা হয়ে চলেছে। মরুক গে। আমরা শ্যামা পুজো করেছি আরও ঘটা করে। বোমা আর দোদমায় আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। তিন চার রাতে লাখ লাখ টাকা পুড়ে ছাই। আমরা যা বিশ্বাস করি তা বিশ্বাস করি। বিশ্বাসে এক, কাজে আর এক, তেমন ভণ্ড আমরা নই। টাকা মাটি তো টাকা মাটিই। সে নিজের টাকাই হোক আর পরের টাকাই হোক। মা সরস্বতীকেও আমরা ছাড়িনি। এডুকেশান ছাড়া জাত তৈরি হয় ! শিক্ষার আলো যে কি আলো ! কথায় বলে জ্ঞান-সূর্য ! বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়ালে কি আছে ? কেতাবী শিক্ষা। সেই দীপ শিখাও আবার নানা কারণে টিং টিং করে জ্বলছে। ফুয়েলের অভাব। ছাত্রদের মেজাজ তেমন ভালো যাচ্ছে না। শিক্ষকবৃন্দও বীতশ্রদ্ধ। কারার ওই লৌহকপাট ভেঙে ফেলে বাগদেবীকে পথে নামাতে হবে। আমরা সেই দুরূহ কর্ম সফল করেছি। পথে, ঘাটে, মাঠে, মণ্ডপে, নর্দমার ধারে, ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট দেবী, বড় দেবী, ডিসকো দেবী, খড়ের ওপর মাটির প্রলেপ লাগানো দেবী, পেরেকের দেবী, কচুরিপানার দেবী, ভাসমান দেবী, প্রোথিত দেবী, যা দেবী সর্বভূতেষু করে ছেড়ে দিয়েছি। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল গুরুমুখী। গ্রন্থ বলে কিছু ছিল কি ? সবই ছিল শ্রুতি আর স্মৃতিনির্ভর। সেই স্মার্তদের যুগ আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। গুরুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার বেশীর ভাগই হল ফলিত। হাতে কলমে। নির্দিষ্ট কোনও সিলেবাস নেই। যখন যেমন তখন তেমন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোস পুরনো সিলেবাসে বাৎস্যায়ন অপাঙক্তেয়। প্যারালাল ব্যবস্থায় তিনিই প্রধান। প্রাচীনকালে বাবুদের আদুরে ছেলেরা রকে বসে, সন্ধেবেলা কুলফি খেতেন, বেলফুলের মালা কিনতেন, গুন গুন করে গাইতেন, আমার কাঁচা পিরিত পাড়ার লোকে পাকতে দিলে না। এ যুগে সেটি হবার উপায়

নেই। মিলিটারি ট্রেনিং কম্‌পালসারি। নিয়ম করে, রুটিন মাফিক সূর্য ডোবার পর, রাতের নেশা বেশ একটু জমে এলে দু চার রাউণ্ড বোমা ফলিত শিক্ষার আবশ্যিক পাঠক্রম। জাতির ঘুম ভাঙছে। ভেতো বাঙালী নড়ে চড়ে উঠছে।

অতিমাত্রায় চা-সেবী বলে একটা বদনাম ছিল। সেদিকেও আমাদের প্রখর দৃষ্টি। সন্ধের পর আর চা চলে না, চলে এনার্জি। নিতান্ত নিন্দুকেও বলবে, ওরে আমার সোনার চাঁদরে

সর্বজনীন শিবরাত্রি আমরা চালু করেছি। কোনও রকম প্রতিবাদে আমরা কর্ণপাত করিনি। ভাল কাজে বাঙালীর স্বভাবই হল বাধা দেওয়া। শিব ছাড়া কিছু হয়! অত বড় একটা সিনেমা হয়ে গেল, কয়েক কোটি টাকা খরচ করে যার নাম ছিল সত্যম্‌, শিবম্‌, সুন্দরম্‌। শিব হলেন মঙ্গলের দেবতা। লোটাভর খাও, ববম্‌ ববম্‌ নাচো। বাঙালী রেগে নৃত্য করবে। বাস ধরার জন্যে স্টপেজে নাচবে, শিবের নামে নাচতে হলেই নাকে কান্না, কোমরে বাত।

হালফিল হোলি হয়ে গেল। এবারের কভারেজ সেণ্ট পারসেণ্ট। শহর প্রায় ভেঙে পড়লেও আমাদের বেলুনবাহিনী, গেরিলাবাহিনীর মত শহরের সর্বত্রই তৎপর ছিলেন। ডোবার ব্যাং মেরে আর তেমন আনন্দ নেই। চিড়িয়াখানার খাঁচার পশুকে খোঁচানো খেলা হিসেবে পচে গেছে। বাস গাদাই গদাইরা আমাদের টার্গেট। গ্রেনেডের কায়দায় বেলুন ছুঁড়ে মাসাধিক কাল আমরা সেই সব মূঢ়, মূক বাঙালীকে ভাষা না দিতে পারি, চমক দিয়েছি। অনেকের চোখ কানা করে অর্ন্তদৃষ্টি খুলে দিয়েছি। যুগ যুগ জিও।

সাংসারিক প্রশ্নোত্তর

কবাবু আপনার চিঠি পেলাম। আপনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, তাই আপনাকে কবাবু বলেই সম্বোধন করছি। আপনি লিখছেন, সংসার চালানো ক্রমশই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠছে। বাজনার চেয়ে খাজনা বেশী। যা মাইনে পাই, তিনদিনেই খেল খতম হয়ে যায়। বাকি মাস কি ভাবে চলে, গড নোজ। মুদি মেরে দেয় শ তিনেক। দুধ খেয়ে নেয় শ দেড়েক। ঘরোয়ালীরা একালে বসন্তের ফুস্‌ বায়ু। ঘর থেকে ঘরে ফুরফুরিয়ে চলেন, পর্দা দুলিয়ে, ফলে কাজের লোকে কানটি মলে শ' খানেক নিয়ে যায়। এজুকেশানে শ' দুয়েক যায়। ইলেকট্রিক বিল মুখ কালো করে দেয়। বিলের অবস্থা হাইপার টেনশানের রুগীর মত। এ মাসে নর্মাল, তো পরের মাসে অ্যাবনরম্যাল। সব দিয়ে থুয়ে, হাতে হ্যারিকেন। নিজের জন্যে, লোকলৌকিকতার জন্যে, সামান্য আমোদপ্রমোদের জন্যে কিছুই

থাকে না। রবিবার বাড়িতে অসংখ্য ব্যক্তির আনাগোনা চলে। ক্ষেপে ক্ষেপে চা, জলখাবার। কি ভাবে যে কি করি ? কেমন করে সামাল দি ? প্রতিমাসেই হয় বিয়ে, না হয় অন্নপ্রাশন, ন হয় জন্মদিন, না হয় বিবাহ বার্ষিকী। আজকাল জলখাবারের খরচ কি ভাবে বাড়ছে দেখেছেন ? প্রধান আহারের চেয়ে বেশি। অফিসে টিফিন করতে পাঁচ টাকার মত লাগে, যদি ঠিক মত করতে হয় ! পঞ্চাশ পয়সার মুড়ি আর পচা বাদাম শব-যাত্রার খই ছড়াবার মত। এতখানি জালার মত একটা পেটের এক কোণে পড়ে থাকে, ছিঁচকে চোর যে ভাবে হাজতের এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে অনেকটা সেই ভাবে। কি করা যায় মশাই ! একটা পথ বাতলাতে পারেন ? কাট ইওর কোট, চিরকাল সেই এক নীতিবাক্য শুনে এলুম। কি করে কাটা যায় ? কোট তো আর মেয়েদের কাঁচুলি নয় ! আধছটাক কাপড়ে কোট হবে ? মামার বাড়ি !

কবাবু সাধ্যমত আপনাকে কয়েকটি টোটকা বাতলে যাই। দুধের খরচ আপনি সহজেই কমাতে পারেন। দুধহীন সাদা জলে যা আছে তা হল, দুধের সান্ত্বনা। দুধের বদলে, আপনি দুধের উৎস, সোর্সের দিকে চলে যান। অনেকটা ভাগীরথীর উৎস সন্ধানের মত ব্যাপার। দুধ কি থেকে হয়। মানে গরুর বাঁটে দুধ আসে কোথা থেকে ? গরুর খাদ্য থেকে। গরুর খাদ্য কি ? খড়, ঘাস, খোল ভুসি থেকে। সুতরাং দুধ না খেয়ে, দুধ যা থেকে হয়, সেই জিনিস খাবার অভ্যাস করুন। নেতারা বারবার বলছেন, আর কতবার বলবেন, ফুড হ্যাবিট পালটান। খড় খান, ঘাস খান, খোল ভুসি খান। অল্প অল্প করে অভ্যাস করুন। কে বলেছে আপনি সায়েব ? অফিসে যারা আপনাকে সায়েব বলে, তারা আপনাকে বলে না। বলে আপনার চেয়ারকে। আপনার স্ত্রী আপনাকে কোনওদিন সায়েব বলেছে ? যেদিন বলবে, সেদিন সত্যিই আপনি সায়েব হবেন। মনে মনে তিনি সময় সময় যা বলেন, শুনলে আপনি দুঃখ পাবেন। চতুষ্পদের সঙ্গেই তিনি আপনাকে তুলনা করেন। সিংহ নয়, বাঘ নয়। আর এক ধাপ নিচে। ভাবছেন হরিণ, জিরাফ, জেব্রা ? আজ্ঞে তাও নয়। একেবারেই গোয়ালের জীব। বড় কত্তারা, নেতারাও তাই ভাবেন। লেকটাই পরা হাম্বা। আপনার বড় বড় বোলচালকে লোকে কি বলে, হাম্বড়াই ! তবে ! সকলে চোখ বুজিয়ে, স্ত্রীর মধুর বাক্যালাপ শুনতে শুনতে কাঁঠালপাতাও চিবোতে পারেন। ছাগলের দুধের উৎস কাঁঠাল পাতা। গাধার দুধ স্তন দুগ্ধের সমান। গাধা কি খায়, আমার জানা নেই তাই। মার খায়, স্বচক্ষে দেখেছি। দেখুন, লজিক ইজ লজিক। খাদ্যাভ্যাস বদলাতে লজ্জা কিসের ? সায়েবী কায়দায়, ডিম্ব, টোস্ট, মাছ, মাংস, জাম, জেলি, রোস্ট, কাবাব, কে খেতে বলেছে। দুধ, ঘি, রামরাজত্বে ছিল, বৈদিক যুগে ছিল। দুধের, পেছনে টাকা ঢালা মানে, জলের পেছনে ঢালা।

মানুষের বর্তমান আচার আচরণের দিকে তাকালে দেখবেন, দ্বিপদ হলেও আমরা চতুষ্পদ। ছাগলের মত পালে পালে ছুটছি, রাস্তায় গরুর মত গুঁতোচ্ছি, গাধার মত সারা জীবন বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। গাধা ঘোড়ার মিক্‌শচারও পাওয়া যাবে। এক আঁটি খড় এনে জানালায় বেঁধে রাখবেন। সময় পেলেই চোখ বুজিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ডগা ধরে চিবোবেন। মনে মনে বলবেন, আমি মানুষ নই, ছোটদা নই, বড়দা নই, আমি একটি বকনা বাছুর। ঢেঁকুর তুলে দেখবেন। যেই শুনবেন কেউ বলছে, 'এইরে, অ, বউমা বাছুর খুলে গেল ?' অমনি লাফিয়ে উঠবেন, আমি সিদ্ধ হয়ে গেছি, সিদ্ধ পুরুষ নই, সিদ্ধ বাছুর। গরু হবার কত সুবিধে, একবার ভেবে দেখেছেন ? খাদ্যাভ্যাসের ফলে দেহটিও যদি গরুর আকার পেয়ে যায়, মার দিয়া কেল্লা। গরুরা আর অত্যাচার করতে পারবে না। আজ চাঁদা দাও, কাল ভোট দাও, মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে দাও। সুন্দর লম্বা একটা ন্যাজ পাবেন। মশা, মাছি, তাড়াতে পারবেন। আরও ফিলি গুঁতোগুঁতি করতে পারবেন। গরুদের বউভাত নেই, অন্নপ্রাশন নেই, জন্মদিন নেই। কোনও রকম দুশ্চিন্তা নেই। বাত নেই, চোরা অম্বল নেই। চুল পড়ে যাবার সমস্যা নেই। কখনও কোনও চিন্তিত গরু দেখেছেন ? দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষের চেয়ে, চিন্তাহীন গরু হওয়া ভালো নয় কি ? নিজের স্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করুন। তাছাড়া শেষের সে দিনেও তাঁকে কিছু দিয়ে যেতে পারবেন। সারা জীবন, মানুষ হয়ে কষ্ট ছাড়া কিছুই তো দিতে পারলেন না। যাবার সময় তবু বলতে পারবেন—একশো জোড়া জুতোর সম্ভাবনা ফেলে রেখে গেলুম ডার্লিং। দাম জানো ! বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বানালে, একশো ইনটু একশো। তাছাড়া কেজি দশেক বোন মিল। শ্রাদ্ধেরও প্রয়োজন নেই। ভেবে দেখুন, কি করবেন ? চোখ বাঁধা কলুর বলদ খেতাব তো পেয়েইছেন। আর একটু এগোবেন, না ওই খেতাবধারী হয়ে বসে থাকবেন ? এগোনই তো মানুষের ধর্ম ! তবে ?

নেচে নেচে আয় মা

pathagar.net

এই পুজো এলেই বোঝা যায় আমরা কোন্ ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছি ! পায়ের তলায় সত্যিই কি কোনও জমি আছে ? না চোরাবালি ? হুঁস হারালেই ভরাডুবি। স্ত্রী পুত্র পরিবার নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে শুধু চিৎকার ছাড়বে—'গেলো, গেলো, কত্তা ডুবে গেল ভড়ভড় করে।'

এত দিনে বুঝেছি, মা কেন আসেন ? না ডাকতেই কেন ছুটে আসনে কৈলাস থেকে এই আবর্জনাময়, গন্ধময়, রাজনৈতিক কীট অধ্যুষিত কলকাতায় ? মা

আসেন আমাদের জ্ঞান-নেত্র খুলে দেবার জন্যে। বাছা, সংসারটিকে চিনে নাও। আমার বউ, আমার ছেলে, আমার মেয়ে বলে হেদিয়ে পড়ো, কেউ কারুর নয় রে মুখপোড়া। সকলের হাতেই তিন হাত লম্বা গামছা। তোমার গলায় জড়িয়ে পাক মারার জন্যে প্রস্তুত। যতই নাকে কাঁদো নিষ্কৃতি পাবে না বৎস! মনের মত না হলেই ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেবে। আঁতে ঘা লাগলে, কে কার পিতা, কে কার স্বামী।

কিছু কাল আগেও বাঁশ থাকত ঝাড়ে। এখন স্কন্ধবাহিত হয়ে চলে আসে বাড়িতে।

পাশের বাড়িতে এক ভদ্রলোক এলেন এক গাঁট শাড়ি নিয়ে। হরেকরকম ডিজাইন, হরেক রকম দাম। পঞ্চাশ থেকে শুরু শ'য়ের ওপরে উঠে স্থিতি। নিচের দিকে ডিজাইন আছে জমি নেই। প্রায় উলঙ্গবাহার শাড়ি। এক বাড়িতে শাড়ির আগমনে আসে পাশের বাড়ি নেচে উঠল। দুদ্দাড় করে সব ছুটছে। ছোট ছুটছে, বড় ছুটছে। প্যাণ্ডেলে প্রতিমা আসেনি, এসেছে শাড়ি।

যে বস্তু বাড়ি বয়ে আসে তার দাম তো বেশি হবেই। কত্তারা গৃহ সামলাতে হিমসিম। 'আরে এই একই মাল বাজারে অনেক কম দাম।'

'হ্যাঁ তোমাকে বলেছে।'

'বলেছে মানে? বিয়ের উপহারের শাড়ি আনি, দ্যাখোনি। যেমন জমি, তেমনি ছাপা।'

'এ শাড়ি তার চেয়ে ঢের ভালো।'

'ঘোড়ার ডিম ভালো।'

'তোমার চোখ নেই।'

'চোখ থেকেও নেই।' মেয়ের মন্তব্য।

'তার মানে?'

'এখুনি দুম করে ষাট-সত্তর টাকা বেরিয়ে যাবে

যে বাড়িতে শাড়ি এসেছে, সেই বাড়ির বড় বউ একটা কোটা শাড়ি নেবেনই। বড়কত্তা বেঁকে বসেছেন। ছিলেন সোজা আড় হয়েছেন। 'নিতে হয় আসল জায়গা থেকে নেবো। শুধু শুধু বেশি দাম দিতে যাবো কেন? যা বাজার পড়েছে দু'জনে ঠুসঠাস চলেছে। সেই ঠুসঠাস বাড়তে বাড়তে রাত এগারোটায় দু'জনের মুখ দ্যাখাদেখি বন্ধ। এপক্ষে অনশন। ওপক্ষে ভূমিশয্যা। বেওয়ারিশ রান্নাঘরে হুলো এসে এক লিটার মাদারডেয়ারী চেটেপুটে সাফ। মেজ গিন্নি বড়র ওপর টেক্কা দিয়ে দুটি শাড়ি নিয়ে নিয়েছে। মেজর ঘরে বর্ষাতেও বসন্তের কোকিল ডাকছে। বড় বারোটার সময় সন্ধির প্রস্তাব তুলেছিল, ওপক্ষ মেঝেতে মুড়ি দিয়ে শবাসনে। দাঁড়কাকের গলায় বলে উঠল—'থাক খুব

হয়েছে, নিজের চরকায় তেল দাও।'

এই ধরনের আগুন নেবাবার দমকল নেই। এ জল হাইড্রাণ্ট থেকে আসে না। আসে দু'নম্বর নল দিয়ে কালো চাকতির চেহারায়। সে ট্যাপ তো আর সকলের বাড়িতে থাকে না। নিরীহ, সৎ সংসারীর অনেক জ্বালা!

গোদের ওপর বিষফোঁড়া। পাড়ায় এক করিতকর্মা দম্পতি এক্সপোর্ট কোয়ালিটির ফ্রক এনেছেন। ম্যাক্সি, মিডি, মিনি, সেমি। চোখ ধাঁধানো সব ডিজাইন। একশ' থেকে শুরু। বাড়িতে বাড়িতে সব ফ্যাশান প্যারেড চলেছে। ভদ্রলোক এক লট করে ছাড়ছেন। কত্তারা চায়ের কাপ হাতে বাসঠ্যাঙানো বিধ্বস্ত মুখে করুন হাসির রেখা টেনে বিচারকের আসনে বসেছেন, মেয়েরা এক একটি পরে সামনে দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। মেয়ের মায়ের প্রশ্ন—'কেমন?' 'কেমন?'

কত্তার ক্ষীণ উত্তর, 'উত্তম।' 'অতি উত্তম।'

মনে মনে ক্যালকুলেটিং মেশিন চলছে। সংখ্যার পর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। চা খাচ্ছেন, না পাঁচন খাচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না মুখ দেখে।

দুপুরের মহিলামহলে কত্তাদের সমালোচনা হয়েই থাকে। উটি নিবারণের কোনও রাস্তা নেই। স্বয়ং ঈশ্বরও পারবেন না তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি নারীজাতিকে খুশি করতে। সংসারে মেয়েদের ভূমিকা বিধানসভার বিরোধী দলের মত। 'হেলদি অপোজিসান'। নিজেরটি ছাড়া, আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্তং সবাই ভালো। অসাধারণ। ঈশ্বর যেটিকে জুটিয়ে দিয়েছেন, সেইটিই একমাত্র ডিফেকটিভ, ডিসপোজালের মাল। খুঁতখুঁতে, নাকউঁচু, স্বার্থপর, পরছিদ্রান্বেষী, উদাসীন, হাড়কেপ্পন, ওয়ানপাইস ফাদার মাদার, জীবনটাকে বেগুনভাজা করে ছেড়ে দিলে। সামনে দিয়ে ছুঁচ গলে না, পেছন দিয়ে হাতি গলে যায়। যতই করো না কেন বাবুর মন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।' বিশেষণের মালা বিশেষ্যের গলায় লম্বাই হতে থাকে। এতরফা বিচারে অসামীর অপরাধের ফিরিস্তি বেড়েই চলে। বিচারক যে কোনও মুহূর্তে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে দিতে পারেন, 'আহা, বাছারে, কার হাতে তুমি পড়েছ মাজননী, এর তো হাজতেই থাকা উচিত মা, তোমার করুণায় স্বামী হয়ে চষে বেড়াচ্ছে।'

মেয়ে বললে, 'বাবা, আমাদের কি আর দেয়? এই তো দ্যাখো না, গতবার দুটো ফ্রক দিয়েছিল, একটার দাম পঁয়ষট্টি, আর একটা পঁয়তাল্লিশ। ব্যাস্ পুজো হয়ে গেল। সব জমছে, ব্যাঙ্কে টাকার বাচ্চারা সুদে বাড়ছে। নাকে যেন কেঁদেই আছে, যা দিনকাল পড়েছে মা! দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমোতে পারি না। ওদিকে রোজ সাতটার সময় ঠেলে তুলতে হয়।'

মেয়ের মা ছাঁচি পান চিবোতে চিবোতে একটি লাইন যোগ করলেন, 'হাত

pathagar.net

দিয়ে জল গলে না।'

প্রবীণা প্রতিবেশী সেই অনুপস্থিত পরের-ছেলের পক্ষ নিয়ে বলতে গেলেন, 'মেয়ের বিয়ের টাকা রাখছে।'

ধমক খেলেন, 'রাখুন মেয়ের বিয়ে। আর যেন কারুর মেয়ে নেই। এদের কালে মেয়ের বিয়ে বাপকে আর দিতে হচ্ছে না। সে গুড়ে বালি।'

'উল্টে ফেললে মা, সে গুড়ে বালি নয়, সে বালিতে গুড়, বল।'

বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে এখন ঘরে ঘরে একটি মাত্র প্রশ্ন, 'কি গো হয়েছে?'

'কি হয়েছে? অম্বল?'

'অম্বল তো তোমার বারোমাসই। ও আর নতুন করে হবে কি? বোনাস হয়েচে, বোনাস?'

বারাণসীধাম

বাথরুমের মত শান্তির জায়গা আর দুটো নেই। অনেকটা আন্দামানের সেলুলার জেলের সেলের মত। চারপাশে চারটে খাড়া দেয়াল। অনেক উঁচুতে গোটা দুয়েক স্কাইলাইট বেয়ে আলো নামছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। একটু দামী বাথরুম হলে দেয়াল আর মেঝে হবে মোজাইক করা। মাথার ওপর ঠ্যাং বের করে থাকবে শাওয়ার। যেন চাঁদের আলোর স্বপ্নঘেরা রাতে রাজপুত্রের পক্ষীরাজ রাজকন্যার ছাতে নামার আগে একটি পা সবে নিচের দিকে নামিয়েছে। আর একটু দামী হলে চারপাশে ঝকঝক করবে শ্বেতশুভ্র সিরামিক টাইলস। শান্তির শ্বেত পারাবতের 'এসেন্স' যেন। কল আর শাওয়ারের ঠোঁট নিকেল মেখে উজ্জ্বল। তাকালেই মনে পড়বে অপারেশান থিয়েটারের কথা। সাদা অ্যাপ্রন পরা সার্জেন আর সিস্টারের হাতে হাতে ঘুরছে ঝকঝকে ফরসেপ, বোনকাটার, সার্জিক্যাল নাইফ, স্ক্যালপেল। টিপটিপ জলের আওয়াজ যেন স্যালাইনের ফোঁটা। বাথরুমের বুক-মাপ আয়নায় একটি মানুষের প্রশস্ত বক্ষদেশ। পিঞ্জরে একটি পাখি দিবারাত্র ধুকপুক করছে। খুলে দিলেই উড়ে যাবে স্কাইলাইটের আলো লক্ষ্য করে।

সাধারণ লাল সিমেন্টের মেঝে হলে ধারে ধারে মন মরা শ্যাওলা থাকবে। সেদিকে তাকালেই মনে হবে, এসেছি অনেক দিন। মুহূর্ত ঝরে চলেছে ফোঁটা ফোঁটা। তাকের ওপর নীল শ্যাম্পু যেন জীবনের হলাহল। সাবানের সাদা কেক যেন মিনিয়েচার কফিন। জলসিক্ত চাপা সুবাস থমকে আছে চারপাশে। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতার মত।

সব সময় আমরা বড় ছড়িয়ে থাকি। সংসার বারিধিতে নিষিক্ত তৈল বিন্দুর মত। জীবিকা, কেরিয়ার, পরচর্চা, পরনিন্দা, ভোগ, রোগ, লোভ, লালসা, ভেতরটা সবসময়েই অ্যামিবার মত ছেতরে আছে। বাথরুমের চারটে দেয়াল আমাদের চেপে ধরে। সঙ্কীর্ণ পরিসরে স্মরণে আসে দেহখাঁচা। খাঁচার ভেতর আমি, যেন মালাইয়ের খোলে ঢালাই জমাট আইসক্রিম। এই টাইট আমির সঙ্গে বাথরুমের একান্তেই একটু আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। অন্তরপুরুষের খবর কে আর রাখে! তরঙ্গশীর্ষে নাচানাচি করেই আমাদের জীবন কাটে। অন্যের সঙ্গে বকবক করেই এক সময় আমরা খাবি খেয়ে শেষ হয়ে যাই। নিজের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ মেলে নির্জন বাথরুমে। কি হে শ্রীমান আছো কেমন? এমন করে কুশল সংবাদ নেবার মত আপনজন ক্রমশই কমে আসছে। 'কি হে কেমন আছো?' বলে আজ কাল উত্তর শোনার অপেক্ষায় কেউই দাঁড়িয়ে থাকেন না। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে উত্তর ভেসে যায়, 'এই চলে যাচ্ছে একরকম।' হঠাৎ যদি পলাতক প্রশ্নকারীকে হাত চেপে ধরে শুনতে বাধ্য করা হয়, 'আর বলবেন না মশাই, পরশু চিংড়ির মালাইকারি খেয়ে প্রায় যাই যাই অবস্থা। সবাই হাল প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। বাজারের মাছ-অলা কেবল বুক ঠুকে বলেছিল, বাঙালী মহাদেবের মত নীলকণ্ঠ। কেউটে কামড়ালে সে ব্যাটাই লটকে পড়বে। পেট পটকে বাঙালী আর মরবে না। মরলে পেটোয়, কি কানপুরিয়ায়, কি থ্রম্বোসিসে মরবে। বিধুডাক্তার মশাই ধন্বন্তরি।' এরপর সেই ভদ্রলোক কাঁদো কাঁদো মুখে বলবেন, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।' মনে মনে বলবেন, "আর কোনও দিন আদিখ্যেতা করে প্রশ্ন করব না, 'কেমন আছেন?' খুব শিক্ষা হল।"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এক প্রৌঢ় খাজাঞ্চী ছিলেন। তিনি চাঁদিনীরাতে বারান্দায় বেরিয়ে এসে আলোর আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতেন। পায়ের কাছে আলো লুটিয়ে আছে। বৃদ্ধ তাঁর স্থূল শরীর নিয়ে নাচছেন। কাছা কোঁচা লুটিয়ে পড়েছে। আমাদেরও ভেতরটা সময় সময় নেচে ওঠে। প্রকাশ্যে নৃত্য করা যায় না। লোকে ভাববে পাগল। রাগে ধেই ধেই করে লম্ফঝম্প চলে। আনন্দের নাচ মধ্যবিত্তের বাড়িতে অচল। বিত্তবানের বাড়িতে ডিসকো চললেও, মধ্যবিত্তের বিধান খুন্তি নৃত্য। বাথরুমে নৃত্য চলতে পারে। গান তো চলবেই। বাথরুম প্রতিভার উৎসতল।

বৃদ্ধ আর্কিমেডিস বাথটাবে পড়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছিলেন। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আবিষ্কার করে নগ্ন বিজ্ঞানী মহানন্দে রাজপথে ছুটেছিলেন, ইউরেকা, ইউরেকা বলে। সেই থেকে বাথরুম আমাদের আত্মরক্ষার জায়গা। সংসারে সম্মুখ সমরে অনেক বীরই এক কোপে কচু কাটা হয়ে যাবেন। শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার একমাত্র পথ হল 'গ্যারিলা ট্যাকটিক্স'। 'হিট অ্যাণ্ড রান'। মেরেই

pathagar.net

সরে পড়ো। হাতের মার নয়, মুখের মার। আজকালকার কায়দায়, রান্নাঘর, খাবার ঘর, বাথরুম প্রায় পাশাপাশি। আমাদের লড়াই অধিকাংশ সময়েই রান্নাঘরের সঙ্গে। সেখানে যে প্রাণীটি দিবসের অধিকাংশ সময় থাকেন, তিনি আমাদের একমাত্র বন্ধু, একমাত্র শত্রু। ফ্রেণ্ড, ফো, ফিলজফার, গাইড, ভিটামিন, কোরামিন, অমৃত, গরল। 'তিনি সমুদ্র মন্থনের অসুরের অমৃত, দেবতার গরল।' কথাটা একটু ভেবে দেখার মত। আসুরিক ব্যবহারে তিনি অমৃত নিঃস্বারী, দেবোপম ব্যবহারে ফ্যাঁস্‌ফোঁস্‌। বাঙালীর সবচেয়ে বড় সংগ্রাম পরিবারের সঙ্গে। একই দুর্গে পক্ষ বিপক্ষ উভয়েই ঠাসাঠাসি। পাণ্ডবপক্ষ, কৌরবপক্ষ। শতবর্ষ ব্যাপী দুই গোলাপের যুদ্ধ এই ক্ষেত্রেই পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। পথিবীর প্রতিরূপ। শান্তিচুক্তি হয় আর ভাঙে। ইউনাইটেড নেশান্‌সের পিতার ক্ষমতাও নেই, কিছু করে। এই 'সিজফায়ার' এই 'ওপ্‌ন ফায়ার'।

কথার 'ক্লাস্টারবোমা' ছুঁড়েই ঢুকে পড়ো দুর্গোপম বাথরুমে। খুলে দাও ফুল ফোর্সে জলের কল। তেড়ে গান ধরো। কারুর আর কিছু করার নেই। প্রতিপক্ষের সব বাক্যবাণ চার দেয়ালে প্রতিহত। তোমার সঙ্গে তুমির এমন মিলনক্ষেত্র আর দ্বিতীয় নেই! আত্মদর্শনের পীঠস্থান। সংসারের বারাণসী। জন্মের পোশাকে খাড়া দাঁড়িয়ে সাধনভজন চলতে পারে। লেখক এখানে বসে প্লট ভাঁজতে পারেন। আইনজীবী আইনের নতুন ফ্যাঁকড়া বের করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের অস্ত্র শানাতে পারেন। গণিতের কঠিন সমস্যার সমাধান বাথরুমেই

খুঁজে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ হার্ট অ্যাটাক বাথরুমেই হয়। সংসারে যে প্রাণীটি গরিলা নামে অভিহিত, তিনি তুড়ুম ঠুকে বাথরুমে ঢুকলেন। ঘণ্টা পার হয়ে যায়। অবিরাম জল পড়ার শব্দ! দ্যাখ দ্যাখ কি হল! হোল ফ্যামিলি দরজার বাইরে তটস্থ। কর্তা কাত হয়ে পড়ে আছেন বারাণসীধামে। বাথরুমে আছাড় খেয়ে কত বৃদ্ধা ধনুক হয়েছেন! কত পুত্রবধূ মধ্যরাতে এই বাথরুমেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরেছেন! বাথরুমে ভূত আর ঈশ্বর দুইয়েরই দেখা মেলে।

যদি এমন হত

যদি এমন হত।

কোনও দেশনায়ক আমার মতই সাড়ে তিনশো টাকা ভাড়ার দেড় কামরার একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। পূব দিকের পুঁচকে জানালা দিয়ে সকালের প্রথম রোদ সোনালী পাখির মত উড়ে এসেই উড়ে চলে যায়। সারাদিনের জন্যে একটা পালকও ফেলে রেখে যায় না। ছোট্ট সুটকেসের মত রান্নাঘর আর বাথরুম। মাঝখানের প্যাসেজ প্রাইমারি সেকসানের মাপে। বেগ এলে সবেগে ধাবিত হলে দেয়ালে ঘষা লেগে শরীরের নুনছাল উঠে যাবে। প্রাচুর্যে, আনন্দে, স্বাস্থ্য ফুলে উঠলে ভয়ের কারণ। বাথরুমে অ্যাকোমোডেসান হবে না। দু'দেয়ালের মাঝে পশ্চাদ্দেশ আটকে যাবে, যেমন ডেকচির মধ্যে থালা আটকে যায় বেকায়দায়। জলের ব্যবস্থা ছোটো একটি হ্যাঁচকল। বার ছয়েক হ্যাঁচোর হ্যাঁচোর করলে এক চুমুক জল বেরোয়। যার ফলে ডান হাতটা আমাদের শালপ্রাংশু মহাভুজ, বাঁ হাত লিকলিকে। অথচ এ দেশের নিয়ম অনুসারে বামহস্তের স্বাস্থ্যই ভালো হওয়া উচিত ছিল। যাঁরা বাল্যে ঘুড়ি ওড়াতেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, টানটান বাতাসে ভস্ করে ঘুড়ি উবড়ে গেলে মনে আচমকা কেমন একটা শূন্যতা নেমে আসত! মাসের প্রথমে সামান্য উপার্জন থেকে সাড়ে তিনশো চলে গেলে, ভেতরটা নিজের অজান্তেই যাঃ করে ওঠে। মনের পুটো পা আকাশের দিকে তাকিয়ে, খানাখন্দ পেরিয়ে ছুটতে থাকে, সাড়ে তিনশো টাকার চাঁদিয়াল ঘুড়ির পেছনে। দোতলার বারান্দায় বিষম চেহারার গৃহস্বামী অনুচ্চারিত ইশারায় বলতে থাকেন, ধরে ফেলেছি বৎস। ঘুড়ি এখন আমার হাতে। সেবার আশ্বিন মাসে মজঃফরপুর থেকে শ্বশুর মহাশয় এলেন কন্যা-সন্দর্শনে। প্রথম ভোরেই বাথরুম-ব্যবহার-বিধি অবহেলা করায় বিষম কোণে এমন বেখাপ্পা আটকে গেলেন, সামনের দোকানের ভুজাঅলা এসে শেষ পরামর্শ দিলে, দেয়াল

উতারকে কত্তাকো নিকালনে পড়েগা। ভদ্রলোক আতঙ্কে চুপসে গেয়ে ঘণ্টাখানেক পরে নিজেই বেরিয়ে এসে বললেন, বাবাজীবন, এ যে দেখি কিণ্ডারগার্টেন বাড়ি, প্রমাণ সাইজের মানুষ থাকে কি করে ?

না, তা হয় না। দেশ নায়করা ঈশ্বরের 'রিবন-টায়েড বেবি।'

যদি এমন হত, একটি উত্তর পুরুষের আগমন সংবাদে কোনও দেশনায়ক আমার মতই মনে মনে, এই রে বলে, নিঃশব্দে একটি হেঁচকি তুলতেন ! মনের আকাশে সাঁঝের আঁধার দেখতেন, দেখতেন গোটাকতক দুঃশ্চিন্তার বাদুড় লাট খাচ্ছে। প্রথম চিন্তা, শিক্ষা। খাই না খাই মধ্যবিত্তের ছেলেকে লেখাপড়া তো শেখাতেই হবে। কিন্তু কোন্ বিদ্যালয়ে ? জন্মের আগেই যেখানে লাইন পড়ে আছে। প্রবেশ পথ যেখানে অতি সঙ্কীর্ণ। মহামানবের সন্তান ছাড়া যেখানে প্রবেশপত্র মেলা ভাগ্যের খেলা। অর্থহীন মানবের পিতা হওয়া যে সমাজে অর্থহীন সেখানে সন্তানের আগমনে শঙ্খ-ঘণ্টা আর বাজে না, বাজে বেহালা কাঁদুনে সুরে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে থাকে, আমি হেরেছি, জোর করে আর একজনকে টেনে এনেছি, পরাজিতের মিছিলে। কৈশোরেই যার বার্ধক্য নামবে। পথ না পেয়ে বিপথে ছুটবে। শৈশবের অচেতন হাসি সচেতন হতাশায় জীবিতের খোলে মৃত্যুকে ভরে দেবে, যার আধুনিক নাম, ফ্রাসট্রেশান।

না, তা হয় না। দেশ নায়করা অন্য কোটির মানুষ। সিংহাসন টলে গেলেও মরা হাতি লাখ টাকা।

এমন যদি হত, কোনো দেশ নায়ক মেয়ের বিবাহের দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে ছেলের সন্ধানে ঘুরছেন। মেয়েটি ডানাকাটা পরী নয়। চলনসই দেখতে। শান্তশিষ্ট এবং ভদ্র। আপস্টার্ট নয়। আধুনিকতার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে না। গৃহকর্মে প্রকৃত সুনিপুণা, বিজ্ঞাপনের কথা নয়। ছেলে পছন্দ হয় তো, ছেলের মেয়ে পছন্দ হয় না। সব হয় তো, দেনাপাওনার ফয়সালা হয় না। ছুটির দিন নীল শাড়ি পরে, সামান্য সেজেগুজে, বাইরের ঘরে ভীরু পায়ে গুঁফো গুঁফো এক দল শিকারীর সামনে এসে বসে। শিকারীরা ধূর্ত চোখে শিকারটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, চা, জলখাবার ধ্বংস করেন। পাকা পাকা প্রশ্ন করেন। কিছু প্রশ্ন ইডিয়েটের মত। তারপর উঠে চলে যান। সকলেরই মুখ বড় ডাক্তারের মত। বোঝার উপায় নেই রুগী বাঁচবে কি মরবে ? চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে বলা যাবে না। ডাক্তাররা যেমন বলেন আর কি ! ছেঁড়া চটি পায়ে দেশনায়ক এসে দাঁড়িয়েছেন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কাউণ্টারে। বিজ্ঞাপন কর্মীর পরামর্শ নিচ্ছেন, কি করলে খরচ আর একটু কমবে ? কমা, পূর্ণচ্ছেদ সব উড়িয়ে মণ্ড পাকিয়ে দিন। সুঃ মানে সুশ্রী, গৃঃ কঃ নিঃ মানে গৃহকর্মে নিপুণা। শিঃ, দঃ রাঃ কুড়ি। শিঃ পাঃ চাই। নিন লিখুন, সুগৃকনি শি দরা কুড়ি শিপা চাই।

এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত আর কি হবে ? খুঁত খুঁত করবেন না, হলে এইতেই হবে। চিঠি এখানে এসে কালেক্ট করে নিয়ে যাবেন। খরচ বাঁচবে। কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে দেশনায়ক অনেক ভেবে এক ভাঁড় চা খাবেন। চায়ে চুমুক দিতে দিতে একটি সিনেমা পোস্টারের দিকে তাঁর চোখ চলে যাবে। ছবিটির নাম হবে হয়তো এইরকম, প্রেম কি সৌগন্ধ। সুন্দর নায়ক আর নায়িকার মুখ বড় কাছাকাছি। স্বপ্নের মত রঙে আঁকা। দেশনায়ক তাঁর জীবনের অতীতে চলে যাবেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গঙ্গার ধার, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, অতীত ফিরে আসতে থাকবে ধোঁয়ার মত। চায়ের দাম মিটিয়ে তিনি গুটি গুটি হাঁটতে থাকবেন, ভাঙাচোরা শহরের উঁচুনীচু রাস্তা ধরে। স্বপ্নের মত শহরও হারিয়ে গেছে। জীবনের সঙ্গে তাল রেখে বিবর্ণ, হতশ্রী হতে শুরু করেছে।

দেশনায়ক সন্ধের মুখে ফিরে আসবেন। তাঁর কিণ্ডারগার্টেন ফ্ল্যাটে। এসে দেখবেন তাঁর পরাজিতা কন্যা একপাশে বসে রাতের রুটি বেলছে। ফর্সা রোগারোগা দুটি হাত, ক্ষয়া ক্ষয়া দুগাছা চুড়ি, সেফটিপিন ঝুলছে। যে হাত এই পৃথিবীর সঙ্গে লড়াইয়ের পক্ষে বড়ই দুর্বল। কিছু দূরেই জীবননায়িকা। জীবনের যত ভালো ভালা কথা বসন্তের উতলা বাতাসে শোনানো হয়েছিল সবই এখন স্বপ্নের পাখি। মরা আঁচের মত চেহারা। চুলের ধারে ধারে ছাই। সব আগুন চোখের মণিতে কেন্দ্রীভূত।

দেশনায়ক ঘরে এসে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পাবেন। অকাল বার্ধক্য নেমে এসেছে। কপালের মাঝখানে একটি শিরা উঠেছে কৃতদাসের রাজটীকার মত। পোস্টারের নায়ক পোস্টারেই রয়ে গেল, আয়নায় পরাজিত নায়ক। না, তা হয় না। সকলকে সচকিত করে, ওঁয়া ওঁয়া শব্দ তুলে দেশনায়ক ছুটছেন দূরে বহু দূরে, এই মর্তলোকের বাইরে।

যা হয় না

pathagar.net

যদি এমন হত, রোজ আমি যখন সকালে বিছানা থেকে নিজেকে টানা হ্যাঁচড়া করে তুলি, সেই সময় ঠিক একই ভাবে কোনও দেশনায়ক নিজেকে ঠেলে তুলতেন। আমারই মতন কোনও রকমে এক কাপ চা খেয়ে খালি দুধের বোতল আর খাস্তা একটি কার্ড হাতে বিষণ্ণ একটি দুধের গুমটির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন বুক ঢিপঢিপ করছে। যেন পরীক্ষার ফল বেরোবে। এসেছে না আসেনি। যদি এসে থাকে, ঠাণ্ডা একটি হড়হড়ে বোতল ব্যাগে ভরে বাজারের দিকে দৌড়। যদি না এসে থাকে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকো।

না, তা হয় ন।

যদি এমন হত, ঠিক যে সময় স্নান করতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় আলো আর জল দুটোই চলে গেল। আমিও যেমন যাঃ বলে প্রায়ান্ধকার বাথরুমে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, ঠিক সেই রকম কোনও দেশনায়কও দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে সেই অবস্থাতেই জামাপ্যান্ট পরে আহারে বসে পড়লেন।

না, তা হয় না।

সেই ঘিনঘিনে অবস্থায় মিনমিনে আহারের আয়োজন দেখে আমার মতই তিনি যদি আঁতকে উঠতেন, আর অদ্ভুত এক মানসিক শূন্যতায় গপাগপ গিলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘড়ির কাঁটা দেখে ঘরময় কাঁকড়া বিছের মত নাপ্‌চিয়েল ড্যান্‌স শুরু করতেন, আমার রুমাল কই, ব্যাগ কই, চশমা কই, ঘড়ি কই।

না, তা হয় না।

তারপর তিনি যদি ঊর্ধ্বশ্বাসে হোঁচট খেতে খেতে বাস স্টপেজের দিকে দৌড়তে দৌড়তে আমার মতই ভাবতেন, কি কর্পোরেশন, কি পৌর এলাকা, সব অঞ্চলের অবস্থাই প্রায় একপ্রকার। শ্রীহীন, বিবর্ণ। খানাখন্দ, ঢিপি, আবর্জনা, বারোমাসই জলকাদায় গদগদে। যে অংশে গাড়ি চলে সেখানে ধুলোর ঝড় বয়। পৌর অঞ্চলে সাইকেল রিকশার দাপট। যেন এথেন্‌সে চ্যারিয়ট রেস হচ্ছে। সব বেনহুরের বাচ্চা। আমার মতই তাঁর মনে হতে থাকবে দেশ শাসন করছে কারা ? রিকশাঅলা, ঠ্যালাঅলা, লরিঅলা, টেম্পোঅলা ! তিনি ভাবতে থাকবেন, না এভাবে চলে না। একটা কিছু করা দরকার ! আমি ওদের একটু কড়কে দেবো, যারা জনসাধারণের অর্থে জনসেবার সামান্য ছিটোফোঁটাও অবশিষ্ট না রেখে শুধু লুট লে, লুট লে করছে। আমার মতই তাঁর লজ্জা করতে থাকবে, এই শ্রীহীন জনপদ কোনও কৃতিত্বের কথাই ঘোষণা করছে না। শাসনের অঙ্গে কলঙ্ক লেপন করে চলেছে। দেশের মানুষকে সব কিছু সহ্য করানো যায়। তারা সহনশীল ভোটদাতা। কিন্তু বিদেশীদের বিচারে এই রাজ্য অবহেলা আর নোঙরামির শেষ সীমায় নেমে গেছে। বিদেশী বিমান এ শহর ঘৃণায় পরিত্যাগ করেছে। তিনি ভেবে আতঙ্কিত হবেন, আমি যখন বিদেশে যাব, তখন আমি কোথায় থাকি কেমন করে বলব ! বলার সাহস থাকলেও ভাবতে বিশ্রী লাগবে, তাঁরা মনে মনে ফুঃ ফুঃ করে উঠবেন। তখন আমার সব বড় কথাই মনে হবে বাতুলের প্রলাপ। আবর্জনার পাশ দিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যেতে যেতে তিনি সেই সত্যের সন্ধান পাবেন, সংগ্রাম বিপক্ষ দলের সঙ্গে নয়, সংগ্রাম হল মানসিকতার সঙ্গে, বিকৃত রুচির সঙ্গে, নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে।

pathagar.net

না, তা হয় না।

তারপর সেই দেশনায়ক আমার মতই ঘর্মাক্ত কলেবরে ভাদ্রের রোদে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াবেন। দয়াপরবশ হয়ে ধনিকসঙ্ঘ যে যাত্রীছাউনিটি করে দিয়েছিলেন, সেদিকে একবার তাকাবেন। বড় করুণ অবস্থা। যে দেশের বিরাট এক অংশের মাথায় শুধু আকাশের চাঁদোয়া, তাঁরা সেটি দখল করে নিয়েছেন। তাঁদের জীবনধারণের আয়োজনে চাকচিক্য না থাকাই স্বাভাবিক। ছেঁড়া চট, নোঙরা কাঁথা, কালো হাঁড়ি, পোড়া ইট, তালতোবড়ানো দু একটা কুড়িয়ে পাওয়া থালা বাটি। উদ্ধার করে আনা রুটি রোদে শুকিয়ে ভবিষ্যতের সঞ্চয়। বাজারের ফেলে দেওয়া পচা আনাজ। বন্ধু প্রতিবেশী নেড়িকুকুর দু একটা, গা ঘেঁষে বসে ঘা চাটছে। একটি পরিবার স্থির ব্যঙ্গচিত্রের মত রেলিঙে ঝুলছে। অপরপারে বিশাল হোর্ডিং। কোনও এক বস্ত্রপ্রস্তুতকারক সংস্থার। মোহিনী নারীর শাড়ির আঁচল উড়ছে, সিনেমার নায়কের মত একটি যুবক তেড়ে আসছে জাপটে ধরার জন্যে। বক্তব্য সেই আদি-অকৃত্রিম প্রেমের জগতে প্রজাপতির মত মুহূর্তে জন্মে মুহূর্তে মেলাও। দেশনায়ক অবাক হয়ে ভাববেন, এ বিজ্ঞাপন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের !

ইতিমধ্যে লুটোপুটি খেতে খেতে একটি বাস আসবে। আমার মতই তিনি জানের মায়া ছেড়ে আর পাঁচজন মারমুখী ভোটদাতাদের সঙ্গে ফুটবোর্ডে সূচ্যগ্র মেদিনীর জন্যে কুরুক্ষেত্র সমরে সামিল হবেন। হতে হতে ভাবেন, 'নাঃ, একটা কিছু করা দরকার। দিনের পর দিন এ ভাবে চলে না। সবাই কুস্তিগীর নয়। শিশুরা স্কুলে চলেছে। চাপে আধহাত জিভ বেরিয়ে পড়েছে। অসুস্থ মানুষের সংখ্যা কম নয়। ভাতভিক্ষের দায়ে পথে নেমেছেন। বৃদ্ধরা আছেন। সন্তানসম্ভবা রমণী আছেন। এ ভাবে কর্মস্থলে গিয়ে কারুরই আর কর্মক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না। সেই প্রবাদোক্ত পাওনাদারকে খাতক বলেছিল, ভাবছ কেন ? এই দেখ তোমার ব্যবস্থা আমি করে ফেলছি। এক মুঠো শিমুল বীজ এই আমি মাটিতে ছড়িয়ে দিলুম। গাছ হবে। বীজ আসবে। ফেটে তুলো উড়বে। ধরো আর পোরো। বেচলেই টাকা। মেট্রো, সার্কুলার, ডবলডেকার ট্রাম, আরও বাস, আসছে, আসছে মরীচিকার মত। শুধু এ যাত্রা বেঁচে থাকার চেষ্টা করো। তিনি ভাববেন, হাফবয়েল হতে হতে ভাববেন, নাঃ আর ললিপপে হবে না। কিছু করতে হবে।

না, তা হয় না।

পুরাকালে এক রাজা ছিলেন। নাম ফেলারিস। তিনি কিঞ্চিৎ অত্যাচারী ছিলেন। তাঁর অত্যাচারের কায়দাটি ছিল বড় অভিনব। পেট ফাঁপা বিশাল একটা পেতলের ষাঁড়ের মধ্যে প্রজাদের ঠেসে দিতেন। তারপর গনগনে আঁচের

ওপর ঝুলিয়ে দিতেন সেই বস্তুটিকে। প্রাণীরা ভাপে রোস্ট হতে হতে আর্তচিৎকার তুলত। সে চিৎকার রাজার কানে যেত না। তিনি শুনতেন পেতলের ধাতব ঝংকার। কানে এসে বাজত মধুর সঙ্গীতের মত।

ফুলমার্ক

যথেষ্ট হল কিনা এই ভেবে বড় দুশ্চিন্তায় আছি। ওই প্রুডেনসিয়াল কাপে জেতার পর আমাদের বিজয়োৎসবের কথা বলছি। জীবনে একবারই ক্রিকেট ব্যাটে হাত দিয়েছিলুম। জিনিসটা দেখতে বেশ তবে বেজায় ওজন। ক্রিকেট বল আরও সুন্দর। অনেকটা গ্রিনেডের মত। নিজে ফাটে না। তবে নাক ফাটায়। কোন ক্যাপটেনের যেন মাথায় লেগেছিল, তিনি স্মৃতিবিভ্রমে ভুগেছিলেন।

কলেজে পড়ার সময় ময়দানে একবার খেলতে গিয়েছিলুম। মোহনবাগান ক্লাবগ্রাউণ্ডের পাশে। তিনটি উইকেট যেন তিন সুন্দরী। বেল দুটি সেই অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের আমলের পার্কার কলমের মত। ব্যাট তোলার আগেই আউট। সবাই বললে 'ডাক' পেয়েছে। সেই 'ডাক', যে 'ডাক' ডিম পাড়ে না। ওমলেট ভেজে খাওয়া যায় না।

ক্রিকেট বড়লোকের খেলা। লর্ডসরা খেলতেন। ওদেশে মাঠের নামও লর্ডস, ওভাল। এ দেশে যেমন ইডেন। বহু দেশে ক্রিকেট খেলাই হয় না, যেমন, চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা। ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে লাভ নেই। ভারত গৌরবের এভারেস্টে উঠে হিমেল বাতাস খাচ্ছে। পাঁচ বছর পরে নেমে আসবে কিনা সে আলোচনাও বৃথা। সেই জয়ের মুহূর্তে এবং তার পরের দিন আমরা যা যা করেছি তা কি ইতিহাসে লেখা থাকবে ? তা কি নজির হয়ে থাকবে ?

যে দেশে ফুটবলে প্রিয় দল হেরে গেলে ক্ষুর চলে, সে দেশে ক্রিকেট সর্বোচ্চ সম্মান পেলে অ্যাটম বোমা ফাটা উচিত ছিল, তা কি ফেটেছে ! আমার এলাকায় সেই রাতে মাত্র আড়াইমণ ক্র্যাকার ফেটেছে। মরতে চাইছে না, মরলে ভাল হয়, ঈশ্বর কৃপায় এমন একটি মাল মাঝরাতে টেঁসে গেলে, পড়ে থাকলে বাতাস লেগে আবার যদি সাপের মত নড়ে চড়ে ওঠে, সেই ভয়ে তাকে যেমন তৎক্ষণাৎ খাটে চাপিয়ে, বিশাল সোরগোল তুলে, ব্যালো হ্যারি, ব্যালো হ্যারি করে নাচতে নাচতে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক সেই কায়দায় শবহীন মিছিল, মধ্যরাতের অন্ধকারে পল্লী পরিক্রমা করেছে। শ' দেড়েক নেড়িকুকুর তারস্বরে চিৎকার

BanglaBook.org

করেছে। আনন্দে নয় ভয়ে। কুকুর ক্রিকেটের কি বুঝবে। ভেবেছে বর্গী এল দেশে। হার্টের রুগীদের জন্য দুই যমরাজকে সেই রাতেই খবর দিতে ছুটে গেছেন—ফ্রম দি হর্সেস মাউথ। সকালের হেডলাইনের আগেই তিনি যাতে খবরটা পান। শরীরটা পরের দিনও গীতার খোলসের মত পড়ে ছিল। প্রতিবেশীরা যত বলেন, ওরে বাপ্ যে পচে ফুলে উঠল ! ছেলেরা বলে, বাপ মে কাম, বাপ মে গো, ভিকট্রি কামস ওনলি ওয়ান্স। কে আবার সংস্কৃত করে বোঝাতে চাইলে, নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রানী, নৈনং দহতি। বলতে গিয়ে ধমক খেলে, ওরে ব্যাটা সেটা হল আত্মা, দেহ নয়। যা পুড়িয়ে আয়। তখন ফেস্টিভ মুড ছিল। শব মিছিল শোকের চেহারা না নিয়ে আনন্দের চেহারা নিল। কাঁধে চেপে পিতা চলেছেন। মুখে বলো হরি নয়, জিতল কে ? ভারত ছাড়া আবার কে ? কপিলদেব। যুগ যুগ জিও।

তিনজন এখনও ইনটেনসিভ কেয়ারে রয়েছেন। ফিরবেন কিনা কে জানে। তাঁদের জন্যে কেক তোলা আছে। ফ্রিজে বিজয়োৎসবে রান্না চিকেনের ভাগও রাখা আছে। নির্বাচিত যে সব সঙ্গীত পরের দিন অষ্টপ্রহর বেজেছিল সে সব সঙ্গীত আবার বাজান যেতে পারে। সবই হিট গান। মানে হৃদয়ে এসে আঘাত করে। বিলাশের দোকানে ফাটা মাইকও আছে। তবে ফিরলে হয়। নাক থেকে নল খোলা যাচ্ছে না।

দু চারজন সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিসে প্যারালিটিক হয়ে গেছেন। একে বলে 'প্রুডেনসিয়াল প্যারালিসিস।' তাঁদের এই অবস্থার জন্যে ভারত-ই দায়ী। এই প্রসঙ্গে হিচককের সাইকো দেখতে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে ছবি দেখতে দেখতে এক সময় আতঙ্কে ভেতরটা এমন হয়ে গেল, সামনের চেয়ারের পেছনটা দু হাতে চেপে ধরে, নিজের আসনে শক্ত, খাড়া। মাঝে মাঝে ভয়ে আঁ করে উঠছি, আর পেছনের যিনি বসে আছেন তিনি মাথায় চাঁটা মারছেন। শেষে মনে হল, পয়সা খরচ করে কেন এই দুর্ভোগ। চোখ বুজিয়ে বসে রইলুম। সেই অবস্থায় মাঝে মাঝে পাশের দর্শককে জিজ্ঞেস করি—এখন কি হচ্চে মশাই ? এবার কি হল মশাই। শেষে অবশ্য সিনেমা হল থেকে আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কে সহ্য করবে আমার সেই উৎপাত !

এই ক্রিকেটে আমারও সেরিব্র্যাল হয়ে যেত। হোমিওপ্যাথিক ডোজে রান তুলে ভারত ফিল্ডিং-এ নেমেছে। মনের অবস্থা বিমর্ষ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে এ রান নস্যির মত। হাঁকাচ্ছেও তেমনি। ভটাভট মারছে। পাল্স রেট কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। বুকের বাঁদিক লাফাচ্ছে। মনে মনে ভাবছি—ভারতই এবার মারলে। এরপর শুরু হল হিচককীয় উত্তেজনা। প্রথম উইকেট পড়ল। পড়ল দ্বিতীয়। মাঝে মাঝে হার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে মরে যাচ্ছি ; কিন্তু

বুঝতে পারছি না। মরছি, বাঁচছি এর মাঝে খেলা চলছে, উইকেট পড়ছে, পড়ছে না। আর বুঝি হল না। যাঁরা সেরিব্র্যালে শয্যাশায়ী, তাঁরা আমার কায়দাটা নিলে সামলে যেতেন। আমি টিভির সামনে থেকে নিজেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলুম। ছোট্ট একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে, মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে রইলুম। মাঝে মাঝে দরজা ঈষৎ ফাঁক করে জিজ্ঞেস করি। আছে না গেছে!

কে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে? উত্তর এল ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণে। ফাটছে শুধু ফাটছে। নাচছে শুধু নাচছে। এরই ফাঁকে দু' একটা আসলবিস্ফোরণ হয়ে গেল। গান শুধু গান প্রাণ ভরে। আই অ্যাম এ ডিস্কো ড্যানসার। সাইকেল রিকশা, প্রাইভেটকার, ট্যাক্সির তলায়, বোমা ফেলে দেখা হল, আলোড়ন আরো হয় কিনা! হয়েছে। রিকশা উল্টে শিশুসহ মাতা হাসপাতালে। এরই মাঝে শ্রাদ্ধ হল, ক্যানসারে মৃত্যু হল, নারী নির্যাতন হল। সবই হল। তবু মনে হচ্ছে ঠিক যেন হল না। সেকালের এক জমিদার দোলের আগে চাঁচরের দিন আনন্দের তরল আতিশয্যে পুরো একটা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চ্যালাদের নিয়ে নাচতে লাগলেন—আজ আমাদের ন্যাড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল।

আরও একবার

আজ কাল মানুষের আর তেমন ভাবনা চিন্তার অবসর নেই। ছিঁচকে সমস্যা কেকের গায়ে লাল পিপড়ের মত জীবনকে এমন ছেঁকে ধরেছে, মৃত্যুর শীতল জলাসয়ে ঝপাং করে ঝম্প না মারলে একটা একটা করে ছাড়ান যাবে না। সেদিন খুব ঝেঁপে বৃষ্টি এল। বৃষ্টি অনেকটা স্মৃতির ধারার মত। মানুষকে অতীতে টেনে নিয়ে যায়। শৈশবকে তুলে আনে বর্তমানের জীর্ণ কোঠায়। জানালার ধারে বসে বসে লক্ষ্য করছিলাম প্রাচীন পল্লীটিকে। আমার শরীরের মত পাড়াটিও যৌবন হারিয়েছে। ছেলেবেলার গাছেরা প্রাচীন হয়েছে। কাণ্ড আর শাখাপ্রশাখায় সে তারুণ্য নেই। কালো হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় বড় বড় কোটর তৈরি হয়েছে। নির্বিচার অত্যাচারে বহু ডালপালা ভেঙে চলে গেছে। শুকনো ক্ষতের চারপাশে পত্রোদ্গম হয়েছে। হলেও বেদনার স্মৃতি মুছে যায়নি। বৎসারন্তে নবীন পত্রোদ্গমের যাদুটি আয়ত্তে থাকায় বৃক্ষ প্রাচীন হলেও মানুষের মত রিক্ত হয়ে যায় না। অতীতে বহু নারকেল গাছ চোখে পড়ত। চৈত্রের দুপুরে পাতা পিছলে সোনালী রোদ ঝরত, চরিত্রবান মানুষের তেজের মত, যোগীর শরীরের দ্যুতির মত। ভরা জ্যোৎস্নায় উদাস প্রেম কাঁপত ঝিরিঝিরি পাতায়। শৈশবে এ তল্লাটে ঘুড়ি উড়ত সরস্বতী পুজোর আগে।

মরশুম শুরু হয়ে যেত এক মাস আগেই। তুঙ্গে উঠত পুজোর দিন। জীবনে তখন অনেক ছোটোখাটো সুখছিল। এখনকার দিনের অনেক বৃহৎ সুখও তার কাছে ম্লান হয়ে যাবে। সে যুগের অনেক বৃহৎ ব্যক্তি ঘুড়ি নিয়ে ভীষণ মেতে উঠতেন। মানুষের মন যেমন বড় ছিল, ছাদও ছিল তেমনি প্রসারিত। সরস্বতী পুজোর দিন বোমালাটাই হাতে এক এক ছাদে তিন চারজন করে 'পতঙ্গবীর'। লাটাই ফুলে আছে গোলাপী মাঞ্জামারা সুতোর পরতে। কাঠচাপা দিস্তে দিস্তে রঙ বেরঙের ঘুড়ি। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি, তাই নিরেস জিনিসকে স্বাধীনতার পাওনা বলে, দেশাত্মবোধের পুলটিস লাগিয়ে নেবার প্রয়োজন হত না। ঘুড়ির কাগজ আসত জাপান থেকে। যেমন তার রঙ, তেমনি তার জমি। সুন্দর একটা গন্ধ ছিল। আমরা নাকের কাছে ধরে বাস নিতুম আর মনে মনে ভাবতুম, এই হল আকাশের গন্ধ। কিশোর মনে ঘুড়ির খুব দুরন্ত প্রভাব ছিল। মনকে এক ঝটকায় তুলে নিয়ে যেত আকাশের চাঁদোয়ায়। নীলে মাখামাখি করে দিত। মাটির দিকে ঘাড় নামাবার অবসর দিত না সারা দিন। নীলের গেলাসে, মাঘী-রোদের শ্যাম্পেনে মনটাই লাট খেত ঘুড়ি হয়ে। আকাশ বুঝতে হলে, বাতাস বুঝতে হলে ঘুড়ি ওড়াতে হবে। পুজোর আগের রাতে ঘুড়ির কল খাটানো হত। সে যে কি আনন্দের ছিল। কিছু দামী ঘুড়ি হত রুলটানা, পাশে সুতো মোড়া। পুজোর দিন ভোর চারটের সময় বাসীমুখেই, বিছানা থেকে নেমে ছাদে ছুটতুম। শীতল এক ঝলক বাতাস, শিশির ভেজা ছাদ। টবে টবে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা যেন স্নান সেরে উঠেছে। বৃহদাকার ডালিয়াকে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে—মাঘ এসে গেছে, আমাদের যাবার সময় হল, তোমরা ফাল্গুন শেষ করে, চৈত্রে চলে এসো। ফিকে সবুজ আকাশ ফাঁকা মাঠের মত মাথার ওপর ঝুলছে। আর সেই ভোরেই দক্ষিণ আকাশে, গাঢ় নীল, কি চাঁদিয়াল ঘুড়ি, খানছয় লাট খাচ্ছে, গোঁত মেরে নেমে আসছে নারকেল গাছের মাথায়, আবার উঠে যাচ্ছে সুতোর টানে আকাশের টঙে। মনের ভেতর আকাশ নেমে আসত। কি ভালই যে লাগত বেঁচে থাকতে, স্বপ্ন নিয়ে, কল্পনা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে।

বাসন্তী রঙের জামা কাপড় পরে ছেলেমেয়েরা অঞ্জলি দিতে যাচ্ছে। মন্ত্রটিও কানে ভাসছে—বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, বিদ্যাস্থানেভ্য এ বচ স্বাহা। পড়ায় গোলমাল হলে অভিভাবকরা ব্যঙ্গ করে বলতেন, এর আর কি হবে, ঠ্যালা, কি রিকশা চালাবে, বিদ্যাস্থানেভয় বচ স্বাহা। পুজোর প্রসাদে সব চেয়ে প্রিয় ছিল, ক্যাটক্যাটে বীজঅলা, গ্যাদগেদে পেয়ারা, কুল আর কদমা, কি বীরখণ্ডী। ওই তিনটিই এখন বৃদ্ধের দাঁতে ভয়ের বস্তু।

কৈশোরে ঘুড়ি ওড়াবার বয়েসে গাছ ছিল পরম শত্রু। বিশেষত নারকেল গাছ। পাতায় একবার ঘুড়ি আটকালে হয়ে গেল। খোলাও যাবে না, পেড়ে

আনাও যাবে না। তখন মনে হত সবকটাকে কেটে উড়িয়ে দি। আর এখন ? শেষ নারকেল গাছটি গতবছর বাজে পুড়ে গেছে। নির্মেঘ জ্যোৎস্নারাতে আকাশের গায়ে তার প্রেত শরীরটিকে দেখে চমকে উঠি। একটি কি দুটি পাতা ঝুলে আছে পোড়া কেশভারের মত। মনে হয় কোনও দজ্জাল শাশুড়ী পুত্রবধূর অঙ্গে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছে। সেই অপকর্মটি চেতনার মত লেগে আছে আকাশের গায়ে।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে জমে থাকা জলে। বুদ্বুদ ফুটছে, ভাসছে, ফেটে যাচ্ছে। সুখের বুদ্বুদ বড় ক্ষণস্থায়ী। কাগজের নৌকো ভাসাবার বয়েস চলে গেছে। সবুজ ঘাস উঠছে ফিনকি দিয়ে। কালো একটি গরু গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। প্রাচীন সব বাড়ির জেল্লা আর বোলবোলা কমে গেছে। অনেকে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। যাঁরা আছেন, তাঁরা বয়েসের ভারে নুব্জ। সময়ের বাঘ নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। জীবনের সব স্বপ্ন পুড়ে ছাই। কারুর বড় ছেলে বউ নিয়ে আলাদা। কারুর মেয়ে প্রেম করে অসম বিবাহ করে সম্পর্ক শূন্য। সকলেই প্রায় বিপত্নিক। শখের থিয়েটারে যিনি ভীম সেজে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে মাঝরাতে স্টেজ কাঁপিয়ে অট্টহাসি হাসতেন তিনি এখন নিজের উরুভঙ্গ করে নোনাধরা চারটি দেয়ালের খাঁচায় মৃত্যুর সাক্ষাৎকার প্রত্যাশী।

ছাদের জল বেরোবার টেরাকোটা নলগুলি এখনও আছে। অঝোরে জল উদ্গীরণ করছে, যেমন করত পঞ্চাশ বছর আগে। কোণের চক মেলানো বাড়ির বারান্দার লাল রাণীগঞ্জ টালিগুলি এখনও অটুট। বৃষ্টিতে ভিজে আরও লাল। যদিও পরিবারের একমাত্র ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে দশ বছর আগে। জানালার লাল নীল সবুজ কাঁচ এখনও রয়েছে। যে কাঁচ জন্মেছিল আগুনের উত্তাপে বিদেশী কোনও কারখানায়। পূর্বপুরুষ মুৎসুদ্দি ছিলেন। বাড়িটি করেছিলেন শ'খানেক বছর আগে বেশ খেলিয়ে।

এমন বাদল দিনে নিষ্কর্মা জানালার ধারে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ লাট্টুর কথা মনে পড়ছে। লাট্টুর কত রকম নাম ছিল—ঘোড়েল, খড়খড়িয়া। বড় লোভের জিনিস ছিল, রঙের জন্যে। কোনওটা গাঢ় বেগুনী, টুকটুকে লাল, হলদে, কমলালেবু। চকচকে গালাপালিশ করা। কোরা কাঠের অংশ, ঢেউ খেলছে সার সার প্যাঁচের পাকে। লেত্তিও হত কত শোভন ! কোনওটায় হলদে ঝুমকো, কোনওটায় নীল, লাল। আমার সেই স্বপ্নের টিনের বাক্সটা আর নেই। যার মধ্যে লাট্টু থাকত, থাকত রঙ বেরঙের কাঁচের গুলি। নানা রকম সিগারেটের প্যাকেট। সেই বয়েসের পরম সম্পত্তি, যা ছিল জীবনের চেয়েও দামী। আমার কৈশোরটিকে নিয়ে সেই ভাঙা টিনের বাক্স কফিন হয়ে গেছে।

বসে বসে খোঁজার চেষ্টা করি আমার প্রিয়জনেরা কোথায়। কোথায় সেই

নকাদা, যিনি কালীপুজোর সময় ঢোলা হাতা সিল্কের পাঞ্জাবি পরে, ধূপের আগুন ছুঁইয়ে একের পর এক উড়োন তুবড়ি ওড়াতেন অক্লেশে। কোথায় সেই বীর শিকারী মতিদা, যিনি সাতচল্লিশ সালের চোদ্দই আগস্ট, মাঝরাতে পাঁচতলার ছাদে দাঁড়িয়ে পর পর পাঁচবার রাইফেল ছুঁড়ে স্বাধীনতাকে আবাহন জানিয়েছিলেন। সকলেই প্রায় চলে গেলেন। আমাদেরও সময় হল। শুধু কলের কাছে জুতোসারাইঅলা কেবল মিঞা এখনও আছে। ফুঁয়ে আর তেমন জোর নেই তাই কর্নেট বাজাতে পারে না। তার ছেলে জুতো সেলাই করে, আর সে কাঁটা পেরেক ঠোকে কাঁপা কাঁপা হাতে। কলের মুখ চুরি হয়ে গেছে। দিবারাত্র জল বেরিয়ে যায় গলগল করে।

আরও একবার এই পৃথিবীতে আসতে ইচ্ছে করে শুধু এই শৈশব আর কৈশোর ফিরে পাবার জন্যে, আর মায়ের কোলের জন্যে।

প্যারালাল

যুগের নাম প্যারালাল। পরিধেয় ট্রাউজার এখন প্যারালালে নেমে এসেছে। বেলবটস আর দেখা যায় না। প্যারালাল কাকে বলে ? দুটি পাশাপাশি রেখা যা নাকি একমাত্র মহাদূরত্বে গিয়ে মেশে।

সেই প্যারালালের যুগে আমরা কি দেখছি ?

প্রথম, প্যারালাল শাসন ব্যবস্থা। নগর কোটাল ইনভ্যালিড। চাপরাশ আছে, পাইক, বরকন্দাজ আছে। কুর্সী আছে, শিলমোহর আছে। কিছু করার ক্ষমতা বড় সীমিত। মহল্লায়, মহল্লায় ভুঁইফোড় হিরোরা টহল দিচ্ছে। পাইপ, পেটো, পটকা, সমভিব্যহারে কুচকাওয়াজ। এর মুণ্ডু ধড় থেকে খসিয়ে দাও। ওকে আধমরা করে ফেলে রাখো। তাকে নুলো করে দাও। অজ্ঞ মানুষ হঠাৎ যদি প্রশ্ন করে ফেলে, 'তুমি কে হে বাপু ?' উত্তর হবে, 'তোর বাপও ঠিক সময়ে প্রশ্নকারীকে সামাল দিতে না পারলে, পরের দিনই বেচারা অদৃশ্য। ধরে নাও বৃদ্ধ বিকাশ বোম্বে গেছেন জিনাত আমানের বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে। রাস্তাজুড়ে বাজার বসবে। সাধারণ মানুষ পথ চলতে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়বে। প্রতিকার ? অসম্ভব। প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। শহরতলীর বাসস্টপেজে ন্যাজে ন্যাজে রিকশা লেগে থাকবে। সিটের ওপর ঠ্যাং তুলে চালক বসে ধূমপান করবে। অফিসের সময়ে বিশাল জ্যাম তৈরি হবে। দিশাহারা মানুষের ফাঁক দিয়ে গলতে গিয়ে চামড়া গুটিয়ে যাবে। অসন্তোষ প্রকাশ করা চলবে না। করছেন কি মশাই ? প্রতিবাদ ?

pathagar.net

'এরা সব হাবুদার প্যারালাল অ্যাডমিনিসট্রেশানের পদ্মফুল। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে গৃহিণী বিধবা হবে।'

'আসল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান কোথায় ?'

'আছে, আছে। মাঝে মাঝে একটা জিপ চলে যায়। ভেতরে ওয়্যারলেস যন্ত্র ঝাঁঝাঁ শব্দ করে। লিকলিকে অ্যান্টেনা গতির ছন্দে থিরথির কাঁপে। কি তার ভাষা ? এই আছি, এই নেই। আছি বটে, কিন্তু নেই।'

রিকশা থেকে নেমে যাত্রী রিকশাচালককে সসম্মানে বারো আনা পয়সা দিয়ে মাথা উঁচু করে চলে যাচ্ছিলেন। যা ভাড়া তাই দিয়েছেন। রিকশাচালকের কর্কশ প্রশ্ন, 'অ্যাই য়ে, কত দিলেন ?'

'কেন ভাই যা ভাড়া তাই দিয়েছি।'

'দেড় টাকা ছাড়ুন।'

'কেন ভাই, দেড়টাকা কবে থেকে হল ?'

'হয়েচে।'

'কে করেছে ? মিউনিসিপ্যালিটি ?'

'সে আবার কি ?'

pathagar.net

তাও তো বটে। সে আবার কি ? একটা ভবন মাত্র। দুটি মাত্র কাজ, করবৃদ্ধি আর কর আদায়। একটা সময় ছিল যে সময় পৌর-প্রতিনিধি কে কেমন কাজ করলেন, তার ওপর নির্ভর করত পরবর্তী নির্বাচনে ফিরে আসা। এখন ?

রাজনীতির টিকিটে একটা ল্যাম্পপোস্ট দাঁড়ালেও বিজয়ী হবে। কি কাজ করলেন আপনারা, এ প্রশ্নের অধিকার নেই। প্যারালালের যুগের পাশাপাশি প্যারালালে চলেছে সার্জারির যুগ। পাশ করা, অদৃশ্য লাইসেন্স-প্রাপ্ত সার্জেনরা ছোরাছুরি নিয়ে ঘুরছে। পিংপিং-এ শরীর হলে কি হবে ! পাকা হাত। চোখ সরষের তেলের মত লাল, 'বেশি বাতেলা !' দে ব্যাটার কণ্ঠনালী ওপ্ন করে। তাই হাবুদাকেই সেলাম বাজাতে হয়। তকমাপরা আসল প্রভুরা প্রশাসন-ফুলদানীর শোভামাত্র।

প্যারালাল আদালতের নাম গণ-আদালত। দিকে দিকে গণ-ধোলাই। ব্যাটাকে চিৎ করে ফেলে বুকে বাঁশ ডলে, চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে এসো। এক ধরনের জন্তু আছে, যার নাম—চোখ-খাবলা। অনেকটা গিরগিটির মত দেখতে। মানুষই এখন চোখ-খাবলা। বলা যায় না কালে, রূপান্তরের নিয়ম অনুসারে মানুষের শরীরও হয়ত গিরগিটির মত হয়ে যাবে।

প্যারালাল শিক্ষাব্যবস্থা তো চালুই আছে। কেতাবে যত বস্তাপচা জ্ঞান। আসল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বড় প্রাচীন হয়ে গেছে। কোঁদলে ভরা। গুরুমুখী জিনিস কি আর কাগজে কলমে হয়। হাতেনাতে অভ্যাস করতে হয়, হাবুদার ইউনিভার্সিটিতে। একজন ইঞ্জিনিয়ার, কি ডাক্তার সারা জীবনে কত আর রোজগার করবেন ? একটা ব্যাঙ্ক খালি করতে মিনিট পনের সময় লাগে। সন্ধের মুখে রাস্তায় দাঁড়ালে একঝুড়ি ঘড়ি পাওয়া যায়।

প্যারালাল হাসপাতাল চালু হয়ে গেছে। আর ভাবনা নেই। আসল হাসপাতালের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ক্লেদ। সেখানে ডিস্টিলারি হোক। রাতের আমোদ-প্রমোদ চলুক। প্রাচীনকে বিদায় জানিয়ে নতুনের আবাহন। নার্সিংহোম তো আছেই। যাঁদের বাঁচা-মরায় দেশের পাল্লা হেলে পড়ে, তাঁদের কজন আর হাসপাতালে পায়খানার পাশে মেঝেতে শুয়ে কতরাতে যান। তাঁদের জন্যে নার্সিংহোম। এ ক্লাস সিটিজেনরা সব নার্সিংহোমের আঁতুরেই ট্যাঁ করে ওঠেন।

বড় বড় দোকানের প্যারালাল ফুটপাত। সাবেককালের কমলালয়, বিমলালয় চোখে পড়ে না। ফ্রন্টলাইনে সার সার প্ল্যাস্টিকের চাদর ঘেরা পথ বিপণী।

প্যারালাল ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা এখন বেশ জমজমাট। সরকারী পরিবহণ ব্যবস্থা এখন গর্দভের নাকের ডগায় ঝুলে থাকা লাল-গাজরের মত। ছোটা যায়, ধরা যায় না। প্রাইভেট ট্র্যানস্পোর্ট কোম্পানীর টাউস গাড়ি এখন অগতির গতি। ছেলেকে দুধে মেরে সেই গাড়িতে চেপে পিতা ছোটেন চাকরি বাঁচাতে।

প্যারালাল টাঁকশালও এবার চালু হল। যার যার কারেনসি নিজেরাই তৈরি করে নাও। সরকারী ছাপ মারা পয়সা কোথায় গেল কে জানে ? গলে গয়না হল ? না কোনও যক্ষ মাটির তলায় যক্ষাগার তৈরিতে বসল। গণতন্ত্রের একটাই

সুবিধে, কিচ্ছু জানার উপায় নেই। ভোটের তারিখটি ছাড়া সবই অপ্রকাশিত।

বিমানবাবু ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট কিনলেন। ফেরত পাবেন পঁচিশ পয়সা। কমলা মেডিকেলের মালিক একটি লেমোনেডের বোতলের ছিপি ধরিয়ে দিলেন। নিজস্ব কারেনসি। ভেতর দিকে লেখা কে-পঁচিশ। এরপর যখন অম্বলের ওষুধ কিনতে আসবেন, তখন একটি টাকা আর এই ছিপিটি দেবেন।

প্যারালাল জিন্দাবাদ। ফাদারের প্যারালাল গডফাদার।

ছাত

আকাশের তলায় ছাত। ছাতের তলায় মানুষ। কখনও রাগে ফুঁসছে, কখনও আনন্দের উল্লাসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কোনও ছাতের তলায় বিবাহ-বাসর। ওই একই সময় কোনও ছাতের তলায় মৃত্যুর যন্ত্রণা। দেয়াল ঘেরা ছাত ঢাকা সংসার ফুটো বন্ধ চৌবাচ্চার মত। চোখের জল, নাকের জল, কামড়া কামড়ি, আঁচড়া আঁচড়ি, যা কিছু সবই ওই জীবন-চৌবাচ্চার মধ্যে। কিছু ডাকা-ঘুকো বেপরোয়া সংসার থাকে, যাদের জীবনরঙ্গ মাঝে মাধ্যেই উপচে পড়ে। প্রতিবেশীরা প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যান।

শার্লক হোম্‌স সহযোগী ওয়াটসনকে বলেছিলেন, কুকুর দেখে গৃহস্থের বাড়ির মেজাজ বুঝে নেবে। কুকুর যদি আনন্দোচ্ছল হয় বুঝবে সুখের সংসার। কুকুর যদি মনমরা হয় বুঝবে সংসারে গড়বড়। ছাতও সেই রকম এক জায়গা, যা দেখে বাড়ির অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

অনেক বাঁড়ি আছে, যে বাড়ির ছাতে সারিসারি ফুলগাছের টব শোভা পায়। মরসুমে ফুল ফোটে। দিনের কোনও এক সময়ে দু'একটি রঙীন শাড়ি ঝোলে। তারে পরিচ্ছন্ন পাজামা, দুপা ফাঁক করে হাওয়া খায়, ক্লিপ আঁটা তোয়ালে, সাদা ধপধপে গেঞ্জি। নির্দিষ্ট সময় পরে সেগুলি আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এক একদিন ঝাঁটার খচরমচর শব্দ পাওয়া যায়। ফুরফুরে ধুলো বাতাসে পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে। চারপাশের কার্নিস পরিষ্কার তকতকে। এমন একটি ছাত দেখলে বুঝতে হবে, তলায় যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁরা প্রাত্যহিকতার সামান্য ঊর্ধ্বে। পিত্তশুল, অম্লশুল, দন্তশুলে ভোগে না। একাধিক ভাই, ভাইয়ের বউ থাকলেও, কেউই যণ্ডমার্কা নন। চরিত্রে উদার। সারমেয় স্বভাব মোটামুটি কাটাতে পেরেছেন। সংসারে এমন একজন কেউ আছেন যিনি পরিবারটিকে বাঁধনে ধরে রেখেছেন। প্রচুর বিষয় সম্পত্তি নেই। প্রতিটি মানুষই প্রায় এক স্বভাবের। একজন মাছের ঝাল চান, তো আর একজন ঝোল চান না। সকলেই চায়ে সমান

মিষ্টি খান। আমির খোঁচায় কাতরে কাতরে ওঠেন না। তার মানে বাড়িটি গোশালা নয়। অষ্টপ্রহর হ্রেষাধ্বনি নেই। বাড়িতে অলসপ্রাণীর সংখ্যা কম। নেই বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। সকলেই সারাদিন ব্যস্ত থাকেন।

কিছু ছাত আছে, যার চেহারা অন্যরকম। কার্নিসে এক ফালি ন্যাকড়া ঝুলছে, যেন সারা সংসার ন্যাজ ঝুলিয়ে বসে আছে। বিচিত্র বর্ণের শাড়ি ঝুলছে। মেলার সময় যথেষ্ট যত্ন নেবার কথা মনেই ছিল না। প্রচুর জল সমেত কোনও রকমে মেলে দেওয়া হয়েছে। গুটিয়েপাকিয়ে আছে। কোনওটা সেদিনই ওঠে, কোনওটা ঝুলেই থাকে দিনের পর দিন, অনাথ শিশুর মত। ভাঙা কাঠকুটো আলসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে তার ওপর কাক বোসে খাখা করে খেয়াল শোনায়। দু একটি বটেরচারা রেনওয়াটার পাইপের পাশ থেকে সলজ্জ পাতা মেলে থাকে। এমন ছাতের তলায় যে সংসার, সে সংসারে অনবরতই ফুটবল খেলা চলেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এমন পরিবারের বাথরুমে সাবধানে পা না ফেললে পপাত হবার সম্ভাবনা। এক ঘরে রেকর্ডপ্লেয়ার চলে, তো অন্য ঘরে দাঙ্গা। এ ঘরে জপের মালা ঘুরছে, ও ঘরে মটন রোল। দরজা জানালা বন্ধের শব্দে প্রতিবেশীর পিলে চমকে যায়। বর্ষার দিনে কোনও কোনও ঘরের জানালা বন্ধ হয়, তো কোনও ঘরের হয় না। মাঝে মাঝে হয় সদরের, না হয় বাথরুমের আলো সারারাতই জ্বলে।

ছাত যেমনই হোক, তলার মানুষ যে ভাবেই ব্যবহার করুক না কেন, ছাত সাধকের উদাস প্রাণের মত। সারারাত চেয়ে থাকে তারাভরা আকাশের দিকে। সারাদিন বুক পেতে দেয় রোদের দিকে। দুঃখ সুখের সাক্ষী হয়ে ঝুলে থাকে মাথার ওপর। পুত্রের বিবাহে ভোজ খাইয়ে কর্তা একদিন নিঃশব্দে সরে পড়েন। যাঁরা ফুলের গন্ধে সানাইয়ের সুরে সেদিন ফ্রায়েডরাইস, ফিশফ্রাই খেয়েছিলেন, তাঁরাই এসে বসেন নিরামিষ পঙক্তি ভোজনে। একদিন যার মাথায় টোপর ছিল, সেই মুণ্ডিত মস্তকে দুঃখীর মুখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত জোড় করে বলে, কাকাবাবু ঠিক হচ্ছে তো। বাবা খুব এঁচড়ের দোলমা ভালোবাসতেন। বছর না ঘুরতেই আবার হয়তো সেই ছাতেই গিয়ে বসতে হয়, ছেলের অন্নপ্রাশন।

ছাত প্রেমিকের, ছাত বিরহীর, ছাত অত্যাচারীর, অত্যাচারিতের, ছাত চরিত্রহীনের, ছাত সাধকের। ছাত একেবারে খাঁটি সোস্যালিস্ট। ছাতের চিলেকোঠার আড়ালে কি জলের ট্যাঙ্কের পাশে কিশোর ফুসুর ফুসুর ধুমপানে অভ্যস্ত হয়। ছাত থেকে যুবক হয়ে সে রাস্তায় নামে। আর এক ধাপ এগিয়ে সংসারী হয়। স্ত্রী সহ ষষ্ঠীর দিন শ্বশুরালয়ে যায়। সেখানেও ছাত। গুরুভোজনের পর গুরুজনের আড়ালে ছাতে দাঁড়িয়ে ধূমপান। সহবত কে

pathagar.net

সহবত, সেই সঙ্গে একটু সেল্‌ফপাবলিসিটি। নিত্যবাবুর জামাইটি বেশ হয়েছে, ওই তো ছাতে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ফুঁকছিল। রঙ একটু চাপা হলে কি হবে, একেবারে কেষ্ট ঠাকুর।

ফুলগাছের টবের আড়ালে ছাতে বসে প্রেম জীবনে পুরোনো হয়েছে কিনা জানি না, সাহিত্যে পচে গেছে, 'হ্যাক্‌নিড'। প্রেম আর ছাতে নেই। হনুমানের মত লাফিয়ে সশব্দে বারান্দার টিনের ঢাল বেয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। পার্কে গড়াচ্ছে। সিনেমার অন্ধকারে হাতে হাত রেখে পাকছে। স্বর্গত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাস্থবির জাতকে প্রেমিক ছাতকে অমর করে রেখে গেছেন।

মানিনী নববধূর ছাত ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও যাবার জায়গা ছিল কি? ননদের চিপটেন, শাশুড়ীর ঝামটা, শেষে সাশ্রুনয়নে ছাতে পলায়ন। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে গোল থালার মত। রাতচরা পাখির ডাক। অঙ্গে নববধূ, নববধূ গন্ধটি তখনও লেগে। বউ থেকে গিন্নি হতে তখনও অনেক দেরি। তারপর! দিগন্তের বড় চাঁদ আকাশের গা বেয়ে উঠতে উঠতে ক্রমশই ছোট টিপের আকার ধারণ করছে। নিচে সংসারের শব্দ, ঘটিতে বাটিতে, ধোঁয়াতে ওপরে উঠে আসছে। সিঁড়িতে অস্পষ্ট পায়ের শব্দ। সংসার ভেঙে লাজুক দুটি পা উঠছে। যাকে নিয়ে সংসার, তার আগমন। এ কি তুমি এখানে। যে জল চোখে ধরা ছিল, সে জল নেমে এল আর একজনের বুকে। চাঁদ এ সব অনেক দেখেছে। ছাত এ সব অনেক সহ্য করেছে।

এ যুগে ফ্ল্যাট আছে। ছাত নেই। ছাতে তালা। ছাত এখন কারুর নয়। বাড়িঅলার। থাকার মধ্যে বুকের ছাতি আছে।

বাঙলাড্

হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। এসিয়াডে বাঙালীর তেমন প্রতিপত্তি দেখা গেল না। কারণ একটাই। বাঙালী যে সব খেলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, দুঃখের বিষয় সে সব আইটেম, আমাদের এসিয়াডে নেই। সবই এক ঘেয়ে মামুলি ব্যাপার। বিশাল দুটো ওজন নিয়ে সাংঘাতিক চেহারার এক মানুষ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হুপহাপ শব্দ করতে করতে উঠে দাঁড়াবেন। তারপর দুম্ করে ফেলে দিয়ে হাত তুলে সরে পড়বেন। এক গাদা অল্পবয়সী মেয়ে জমি থেকে তিড়িং করে ঠিকরে ব্যাঙের মত লাফ মেরে, শূন্যে, সাত আটবার লক্কা পায়রার মত ডিগবাজি খেয়ে আবার নেমে আসবে। দুটো খোঁটার মাঝখানে বাঁধা একটা ডাণ্ডা ধরে হাড় গোড় ভাঙা জীবের মত চরকিপাক দেবে। দিতে দিতে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই

গুলিখাওয়া বিমানের মত লাট খেতে খেতে নেমে আসবে। গুড়ুম করে গুলির শব্দ, ঝপাং করে জলে, হাবুডুবু খেতে খেতে ভোঁদড়ের মত এ মাথা থেকে ও মাথা, ও মাথা থেকে এ মাথা। ইলেকট্রনিক ঘড়ির সেকেণ্ডের সংখ্যা টিভি'র পর্দার ডান দিকে লাট্টুর মত খালি ঘুরতেই থাকবে। বিশ্রী চেহারার ন্যাড়াবোঁচা একটা সাইকেলে কুঁজো মত একটি মানুষ। প্যাডেলে পাগলের মত পা চালাচ্ছে। গোল হয়ে ঘুরেই চলেছে, ঘুরেই চলেছে। জল্লাদের মত সন্দেহজনক চেহারার মানুষ, প্রাণদণ্ড দেবার মত চেহারার এক প্রান্তরে সার সার নিশান সাজিয়ে ঠাঁই ঠাস্ গুলি মেরে সময় আর অর্থ দুটোই নষ্ট করে চলেছেন।

যত সব ফ্যাশানেবল, জীবন বহির্ভূত কাজ। আমাদের ফিল্ডে নেমে এসো, আমরা কান কেটে ছেড়ে দোবো। আমাদের ট্রেনিং নেই, ট্রেনার নেই, প্রোটীন নেই, ভিটামিন নেই, র‍্যাশানের খুদকুঁড়ো খেয়ে, অন্ধকারে, খানাখন্দে মানুষ, তাইতেই আমরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে, এক একজন, এক এক দিক্‌পাল। এসিয়াডের মত আমরা যদি বাঙলাড্ করার সুযোগ পেতুম তাহলে বিদেশী কোনও প্রতিযোগীকে হিট্ ছেড়ে আর ফাইনালে উঠতে হত না।

আমাদের আইটেমের মধ্যে প্রথম আইটেম হবে, ল্যাঙ মারা।

ফুটবলে ল্যাঙ চলে। সে ল্যাঙে হুইস্‌ল বাজে, ফাউল হয়। আমাদের আইটেম হবে নির্ভেজাল ল্যাঙ। ল্যাঙ মারাটা কোনও কৃতিত্ব নয়, ল্যাঙ খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। প্রতিবেশীর ল্যাঙ, আত্মীয়-স্বজনের ল্যাঙ, কর্মক্ষেত্রের ল্যাঙ। দেখি বাঙালী ছাড়া আর কোন দেশের প্রতিযোগী দাঁড়িয়ে থেকে সোনার পদক গলায় ঝুলিয়ে, সগর্বে মাথা তুলে দেশে ফিরতে পারে! কত রথী মহারথীকে আমরা কাত করে দিয়েছি। বাঙালী বীরের ল্যাং খেয়ে কত তাবড়, তাবড় বাঙালী চিৎপাত হয়ে পড়েছেন। সেই লেঙ্গির তেজ কত, নেতা জানেন, সাহিত্যিক জানেন, সঙ্গীতজ্ঞ জানেন, জানেন প্রোফেসানাল ম্যান। এই আইটেমটি হবে ক্রিকেট খেলার মত। স্পিনের মত, গুগলির মত ল্যাঙ আসবে, ক্রিজে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

আর একটি আইটেম হবে চিলের পেছনে কাকের ঠোকর।

চিল যখন আকাশে ওড়ে পেছন পেছন কিছু কাকও ওড়ে। এপাশ থেকে ওপাশ থেকে ঠোকরাতে থাকে। কোনও কোনও চিল অতিষ্ঠ হয়ে ডানা মুড়ে বসে পড়ে। কোনও চিল ওরই মধ্যে নিজের কাজ করে যায়। ঠোকোর সহ্য করার ক্ষমতা বাঙালীর যেমন বাড়ছে, ঠোকরাবার ক্ষমতাও সেইরকম বাড়ছে। এই আইটেমটি হবে সাঁতার আর ডাইভিং-এর কম্‌বিনেশান। অনেকটা ওই নতুন খেলা, কিক দি বলের মত। শূন্যে সাঁতার, চোঁ করে নিচে নেমে এসে আবার ওঠা আবার নামা। মাঝে মাঝে ডজ করে বেরিয়ে যাওয়া।

BanglaBook.org

এ খেলায় স্বর্ণপদক কার গলায় ঝুলবে ? আমাদের।

নেক্স্ট আইটেম, ব্যাক বাইটিং। পেছন থেকে খ্যাঁক করে কামড়াবে। কামড়ে যত জনকে আউট করা যাবে তত পয়েন্ট। এই খেলায় দাঁতের জোর আর সহ্য শক্তি দুটোই থাকা চাই। এর সঙ্গে ফুটবলের টাইব্রেকারের মিল থাকবে। এ পক্ষ ছ'বার কামড়াবে, ও পক্ষ কামড়াবে ছ'বার। যে পক্ষ কামড় খেয়েও খাড়া থাকবে সেই হবে উইনার। বাঙালী হলে লড়াই হত সমানে সমানে। ব্যাক বাইটার আর ব্যাকবিটন দু'পক্ষই সমান শক্তিশালী। অন্য দেশের প্রতিযোগী হেরে ভূত হয়ে যাবে।

নেক্স্ট আইটেম, গলায় গামছা।

কে কতরকমের কত পাক সহ্য করতে পারে। পাওনাদারের পাক। পরিবারের পাক। ট্যাক্সের পাক। উৎসব, পালাপার্বণের পাক। দায়দায়িত্বের সাধ্যাতীত পাক। একেবারে পুরোপুরি গলার খেলা। চারশো টাকায় সারা মাস সংসার চালিয়ে, ছেলের এডুকেশান, মেয়ের বিয়ে, বৃদ্ধপিতামাতার চিকিৎসা। এ দেশের অসংখ্য মানুষের স্থায়ী কোনও উপার্জন নেই। দিন আনি দিন খাই। কি খাই তাও জানা নেই। এই প্রতিযোগিতার জয় পরাজয় এক আধ ঘণ্টায় ফয়সালা হবে না। হিমালয়ান র‍্যালি বা ওয়ার্ল্ডকাপ ফুটবলের মত তিনচার বছর ধরে চলবে। দেখি কে পারে আমাদের সঙ্গে।

এ সবই হোলো স্পিরিচ্যুয়েল আইটেম। বাংলা অনুবাদ আধ্যাত্মিক করলে চলবে না। স্পিরিট মানে ভূত। এই গ্রুপকে বলতে হবে ভৌতিক বিভাগ। ভূতের খেলা। দ্বিতীয় গ্রুপে স্থান পাবে সেই সব আইটেম যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে শরীর। সোস্যাল জিমন্যাসটিক। এই বিভাগের প্রথম আইটেম, কোমরের কসরত বা মাঝার মাঝাকি। রাষ্ট্রীয় অথবা বেসরকারী পরিবহণ সংস্থার বাসে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন হবে। সরকারী পরিবহণ সংস্থা অ্যানিভারসারির সময় দাঁত বের করা এক একটি বাসকে যেভাবে আলোকমালায় সজ্জিত করে, পথে পতকা উঁচিয়ে ছেড়ে দেন, বাঙলাড উপলক্ষে আমরাও সে ভাবে সাজাতে পারি।

প্রতিযোগিতা শুরু হবে সকালে অফিসটাইমে। দৌড়, লংজাম্প, হার্ডলরেস, ট্রাপিজের খেলা, রেস্টলিং সব কিছুর সমন্বয়ে এই আইটেম। বিদেশীদের জন্যে নাম রাখা যেতে পারে—ক্যাচ দি বাস। পয়েন্ট দেওয়া হবে এই ভাবে—এক, এক চান্সে হাতল ধরা। ক্ষিপ্রবেগে সকলকে টাটুঘোড়ার মত টপকে এসে, এর, ওর, তার বগলের তলা দিয়ে গলে, ফস করে হাতল ধরে, চলমান বাসের চেয়েও দ্রুত বেগে ছুটে, দক্ষিণ অথবা বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিকে বাসের মচমচে ফুটবোর্ডে স্থাপন করতে হবে দুই, ফুটবোর্ডে পা ঠেকানোর ওপর নম্বর থাকবে। জোড়া

জোড়া পায়ের জটলা। পা রাখার তিল পরিমাণ স্থান থাকবে না। আগে থেকেই যে সব পা স্থান করে নিতে পেরেছে, সেই সব পা নতুন কোনো পদাঙ্গুষ্ঠের অনুপ্রবেশ আন্দাজ করে অতিশয় শত্রুভাবাপন্ন। কৌরব পদ সমন্বয়ে ফুটবোর্ড এক চলমান কুরুক্ষেত্র। সূচ্যগ্র মেদিনী বিনা রণে ছেড়ে দিতে নারাজ। ওরই মধ্যে নভোচরের মত মসৃণ পদস্থাপন সম্ভব করতে হবে। ডাইভিং-এ যেমন জল ছিটকে গেলে নম্বর কাটা যায়, এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। ঝুলন্ত মানুষ মারমুখী হয়ে উঠলে বুঝতে হবে পায়ের আঙুল খোঁচা মেরে ছাল ছাড়িয়ে, মারাত্মক ফাউল করে বিপক্ষের এলাকায় প্রবেশ করেছে। এ খেলার রেফারি জনগণ। বাঁশী বাজবে না। পেনাল্টি গণধাক্কা। প্রতিযোগীর হাত ছেড়ে পতন এবং বাসের চাকায় চিঁড়েচ্যাপ্টা হওন। অর্থাৎ নিজেকে ফুটবলের মতন করে চলমান বাসের গোলের দিকে ছুঁড়ে দিতে হবে। এ বল সে বল নয়। এ বলের সেণ্টার ফুটবলের মত মাঠের মাঝখানে নয় বাসের ভেতরে। সেখানে দু'হাত তুলে, কোমর সোজা রেখে ঘণ্টা দেড়েক, কম অক্সিজেন, বেশি কার্বনডাইঅক্সাইড যুক্ত আখড়ায় কুস্তিগীরের মত লড়তে হবে। দু'কাঁধে জনগণের কনুইয়ের চাপ। ঘাড়ে অনবরত রদ্দা, আর কোমরে পার্শ্বচাপ। এই চাপাচাপির মধ্যে আপ্‌পুসোনার মত কসরত দেখাতে হবে। নামার পর, প্রতিযোগীকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে, আপনার নাম, পিতার নাম, কোন্ দেশ, কত সাল।

আমাদের তালিকায় দৌড়ও থাকবে। ট্র্যাক। শেয়ালদা ভায়া বৌবাজার টু ড্যালহাউসি। সব টপকে, খানাখন্দ ডিঙিয়ে, লেট বাঁচাবার জন্যে দৌড়। এক মিনিট এদিক ওদিক। লাল ঢ্যারা। তিন ঢ্যারায় একটা সি· এল· হিসেব থেকে খারিজ।

বাঙালী তো সব সময় ফিল্ডে নেমেই আছে। সাজুগুজুর কি দরকার! আর পুরস্কার! কণ্টকশয্যা, অনিদ্রা, অকালবার্ধক্য। ওইটাই তো খাঁটি সোনা।

পশু নিষ্কাশন পরিকল্পনা

pathagar.net

রেনেসাঁ টেনেসাঁ নানা ব্যাপার এসে, বেদবেদান্তের চুনকাম পড়ে মানুষ নিজের অজান্তেই দেবতার কাছাকাছি একটা জায়গায় উঠে বসল। আর তাকে নামায় কে! বিজ্ঞান এসে ঘাড়ে চাপল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী উলটে পালটে গেল। বিশ্ব তিন ভাগে টুকরো হয়ে গেল, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, নানা রকম বৈপ্লবিক ঘটনা সোচ্চারে বলতে লাগল, মানুষ আমরা নহিতো মেষ। তৃতীয় আর দ্বিতীয় বিশ্বের এধারে ওধারে দু-এক টুকরো

মানুষখেকো ডিক্‌টেটার রয়ে গেল। তা থাক। পৃথিবী মোটামুটি স্বর্গ হয়ে গেল। প্রথম বিশ্বের মানুষ সম্পদে, প্রাচুর্যে লুটোপুটি খেতে লাগল। তৃতীয় বিশ্বে শুরু হল, 'ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি' খেলা।

আমরা দুম্ করে স্বাধীন হয়ে গেলুম। মার মার, কাটকাট ব্যাপার। নেতারা খেচরে ওড়াউড়ি শুরু করলেন। ভূচরেরা উটমুখো হয়ে রইল। এই বুঝি আমেরিকা আসে, এই আসে জার্মান, ফ্রান্স, জাপান। পাতার পর পাতা পরিকল্পনা ঝরতে লাগল। চিমনির খোঁচা লাগল নীল আকাশে। স্ট্যাটিসটিসিয়ানরা মাইলের পর মাইল পরিসংখ্যান কণ্টকিত রিপোর্ট লিখে চললেন। আর্টিস্টরা আঁকতে বসলেন পাই-চার্ট, বারচার্ট, লিনিয়ারগ্রাফ। উৎপাদন বাড়ছে, আয় বাড়ছে, মাথাপিছু কনসাম্পসান বাড়ছে, শিক্ষার পান্‌সি তর তর এগোচ্ছে। বেকার সমস্যা চায়ের তলানি। মানুষ আর মরছে না। ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যে ডগমগ করছে। ফাটাফাটি ব্যাপার।

সব খতম। যাদুকর বললেন, খেল খতম, পয়সা হজম। এবার তা হলে অন্য পরিকল্পনা। মানুষকে ম্যানেজ করা বড় কঠিন কাজ। দেবতাদের দাবির শেষ নেই। কত আবদার সহ্য করা যায়। ডেমোক্রেসির ডামাডোলে এককালের ন্যাংটো বাবাজীদের লম্ফ ঝম্প খুব বেড়েছে। এই চাই, ওই চাই। ভালো গ্রাম চাই, গ্রীণ রেভোলিউশান চাই, ডেকরেটেড শহর চাই, উন্নত যানবাহন চাই, এ ক্লাস হাসপাতাল চাই, বিদেশ যাবার ফরেন একসচেঞ্জ চাই, ইলেক্‌ট্রিক চাই, জাতীয় সড়ক চাই। মাঝে মাঝে আবার হুমকি আছে, ভোট দোবো না। দু-একবার সত্যি সত্যি উইকেটও ফেলে দিল। ব্যাটিং-সাইড প্যাভেলিয়ানে ফিরেও গেল।

না এভাবে হবে না। খামারের মালিকের কাছে ম্যানেজমেন্টের কায়দা শিখতে হবে। মুরগী প্রতিপালন। ছাগ প্রতিপালন, ভেড়াপালন। ঠিক সেই কায়দায় প্রজাপালন। ফিডিং, বিটিং, কিলিং, প্রফিটিয়ারিং। ফার্মিংও ভাল ব্যবসা

সমস্যা একটাই। মানুষকে কি করে পশু করা যায়। চেতন স্তর থেকে গোঁত্তা মেরে অবচেতন স্তরে যেমন করেই হোক নামাতে হবে। তারপর সবই সহজ। সায়েবরা, আমাদের এক সময়ের মাস্টাররা বলে গেছেন, হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়। দেশটা যখন মুফত হাতে এসে গেছে, উপায় একটা বের করতেই হয়।

প্রাণী তত্ত্ববিদরা দেখেছেন, এক প্রজাতির অনেক প্রাণীকে এক জায়গায় ঠাসাঠাসি করে রাখলে তাদের স্বভাব পালটে যায়। নিরীহ প্রাণীও মারমুখি হয়ে ওঠে। ক্যানিবলিস্টিক স্বভাব দেখা দেয়। কলোনিতে খুনখারাপি শুরু হয়। জন্মের হার দ্রুত বাড়তে থাকে। রমরমা অবস্থা। মানুষও তো প্রাণী।

তা হলে মেথডটা কি হবে ? সব ব্যাপারেরই একটা বিজ্ঞান আছে। মেথড নাম্বার ওয়ান হোলো, ঘনত্ব বাড়াও। এক জায়গায় একগাদা মানুষকে ঠেসে দাও। ঈশ্বর সহায় হলে পথ আপনি খুলে যায়। দুটো দেশের মানুষ রাজনীতির এক চালে এক জায়গায় এসে পড়ল। জ্ঞানীর যুক্তি হোলো, ওয়েট অ্যাণ্ড সি। বাঙলায়, সবুরে মেওয়া ফলে।

সেই মেওয়া গত তিরিশ চৌত্রিশ বছরে ভালই ফলেছে। দ্রাক্ষাকুঞ্জে এখন থোলো থোলো আঙুর। সে আঙুর আবার শৃগালের নাগালের মধ্যে। টক বলে ন্যাজ গুটিয়ে পালাতে হয় না। পেড়ে খাওয়া যায়।

দু নম্বর প্রক্রিয়া হোলো ধীরে ধীরে সব তুলে নাও। একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি করে ফেলো। রাস্তাঘাট তুলে নাও, জল তুলে নাও। বাসস্থান নড়বড়ে করে দাও। নিরাপত্তা সরিয়ে নাও। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গোলকধাঁধাঁয় ফেলে দাও, জীবিকা অনিশ্চিত করে ফেল। সর্বত্র একটা বাবারে, মারে অবস্থা ছেড়ে দাও। আর, তারপর ?

কেউ কারুর বন্ধু নয়, সবাই শত্রু। মার মার কাট কাট তোলপাড় কাণ্ড। বাঙালী কর্মস্থলে জীবিকার সন্ধানে যাচ্ছে, না খণ্ডযুদ্ধে যাচ্ছে বোঝার উপায় নেই। কি ঘরে, কি বাইরে মেজাজ সব সময় চড়া সুরে বাঁধা। চোখে মুখে একটা আক্রোশের ভাব, যেন লড়ুয়ে মোরোগ, পায়ে বাঁধা ছুরি। সব সময় ককফাইট চলেছে। বাস আসছে, যেন আইখম্যানের খাঁচা। দূর থেকে দেখামাত্র স্টপেজে মুরগীর লড়াই। যেতেই হবে, অথচ ভদ্র, মানবোচিত ব্যবস্থা নেই। শিশু অথবা মহিলা দেখলে প্রাণে সহানুভূতি জাগে না। যুদ্ধের অবস্থা। কে মরলো, কে বাঁচলো দেখার দরকার নেই। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। রান্নাবান্না করে,

pathagar.net

ছেলে, মেয়ে, স্বামীর তোয়াজ করে লো প্রেসারের মধ্যবয়সী মহিলা ধুঁকতে ধুঁকতে অফিসে চলেছেন। বাসের ফুটবোর্ডে কোনও মতে পায়ের আঙুল রেখেছেন, পেছনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মানুষ পরস্পর পরস্পরকে কনুইয়ের গুঁতো আর ল্যাং মেরে চলেছেন। জমি দখলের লড়াই। মার গোঁত্তা। লাইন উলটে গেছে, মেষ আমরা নহি তো মানুষ। বেড়িয়ে ফেরার সময় হোল্ডলে মাল ঠাসার মত মহিলার পশ্চাদ্দেশে মারো ঠ্যালা। সভ্যতা ভদ্রতা, এ সব হল মনুষ্যসমাজের কথা। ছাগসমাজে ও সব হল শালপাতা। মুখে পুরে ফ্যালফেলে চোখে চিবোও। খাঁচার ভেতর রাশি রাশি কৃষ্ণের জীব। ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে আছে। মনস্তত্ত্ব বলে, ভদ্র ব্যবধানে না থাকলে প্রেয়সীকেও কলসির কাণা ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করে। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো, আধবুড়োর দলাপাকানো অবস্থা। একই ঘরে হোল ফ্যামিলির ঠাসাঠাসি। এর কাশি, ওর হাঁচি, এর হাসি ওর কৌতপাড়া। পশুর জন্যে নির্জনতার প্রয়োজন নেই। পথচলার আইনকানুনও বদলে গেছে। বলং বলং বাহু বলং। এসথেটিকস আজ বহু দূরে নির্বাসিত। দেবতা আজ খাটে উঠেছে। শুধু একবার—হরি বলো।

অরণ্যে রোদন

মাঝ রাতে অচেনা গলার ভেউ ভেউ কান্নায় গৃহস্বামীর ঘুম ছুটে গেল। মশারির ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন কে বটে ?

আজ্ঞে আমি।

অ্যাঁ, সে কি রে ? চোর আবার কাঁদে নাকি ? এখন তো চোরদেরই হাসার যুগ।

আজ্ঞে সে এ ঘরের বাইরে। এমন জানলে কে ঢুকতো স্যার এ ঘরে ! ছেঁড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

তুই কোথা থেকে কথা বলছিস এখন ?

আজ্ঞে কোথায় আছি বুঝতে পারলে তো নিজেই বেরিয়ে যেতুম মাল হাপিস করে। ঘণ্টাখানেক ধরে চেষ্টা করছি, সব জড়িয়ে মড়িয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছি।

যে ঘরে এই নাটক হচ্ছে, সেই ঘরের একটু বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। আয়তন তেরো বাই বারো, একপাশে দেয়ালের সঙ্গে সাঁট হয়ে আছে বিশাল এক বোম্বাই খাট। বিবাহের প্রাপ্তিযোগ। ঢোকার দরজার ডানপাশে জাইগানটিক এক স্টিল

pathagar.net

ক্যাবিনেট। খাটের একটা পাশের সঙ্গে চেপে বসে আছে। এমন ভাবে চেপে আছে যেন খাট আর ক্যাবিনেট 'শিয়ামিজ টুইন'। কোনও দিন সরাসরির প্রয়োজন হলে সার্জেন ডেকে অপারেট করে সেপারেট করতে হবে। ঠিক তার উল্টো দিকে খাটের পাশ চেপে বুক চিতিয়ে পড়ে আছে ড্রেসিং টেবল। তার আয়নাটি আবার ত্রিফোল্ড,ঘরের খাঁচায় ডানা মেলে উড়তে চাইছে। তার সামনে খোঁদল করা একটি বসার আসন। ঘরে এপাশ ওপাশ করতে গেলেই ল্যাং মারে ড্রেসিং টেবলের বাঁ পাশে একটি দেয়াল আলমারি, তার পাশ থেকে ঘুরে গেছে এক সেট সোফা। কর্নার টেবিল দুটি যেন ভিড়ের বাসের যাত্রী। মেঝেতে ঠ্যাং ঠেকাতে পারেনি সোফার হাতলে ভর রেখে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি', গোছ হয়ে আছে,খাটের পায়ার দিকে যেটুকু জায়গা ছিল সেখানে ধুম্বো একটি টিভি, তার মুখ দেখলেই মনে হয়, অনবরত বলে চলেছে প্রাণ যায় পাঁচু।

এইবার খাটের তলায় কি আছে দেখা যাক। যৌথ পরিবার ভাঙতে ভাঙতে এই পরিবারটি কোনও রকমে মাথা গোঁজার মত এই বাসস্থানটি সংগ্রহ করেছে। এক বছরের ভাড়া অগ্রিম দিতে হয়েছে। বাড়িঅলা সেই টাকায় ঘরের বাইরে একটি রান্নাঘর বানিয়ে দিয়েছেন। সে এক আজব জিনিস। বসে রান্নার কথা স্বপ্নেও ভাবা যাবে না। পাঠশালে পণ্ডিতমশাই অবাধ্য ছাত্রকে মাঝে মধ্যে শাস্তি দিয়ে বলতেন, চেয়ার হয়ে থাক দেড় ঘণ্টা। সেই চেয়ার হয়ে থাকার কায়দায় পুচকে তোলা উনুনে সংসারের পিণ্ডি চট্‌কাও। থোড়বড়ি খাড়া, খাড়াবড়ি থোড়। তরকারির রঙ দেখতে গিয়ে সামনে ঝোঁকার সময় পেছনের দেয়ালের কথা ভুলে গেলে মুখ থুবড়ে উনুনে পড়তে হবে।

পেতলের বাসনের মধ্যে অতি অবশ্যই থাকবে গোটা দুয়েক পেতলের ঘড়া আর থাকবে সে যুগের মানুষের খাওয়ার আয়তন অনুসারে গড়ের মাঠের মাপের কানা উঁচু কয়েকটি থালা। সে যুগের মানুষ খুব পান খেতেন, সুতরাং একটা পানের ডাবর থাকবে, থাকবে গোটাকতক গোল ডিবে, খাঁজে খাঁজে আটকে সেই গোদা ডিবে বন্ধ করার এক দিশী কায়দায় অনেক পানাবলাসী কেতরে পড়তেন। খুললে বন্ধ হয় না। বন্ধ হলে খোলে না। অনেক সাবেক বাড়িতে এখনও পেতলের ঘড়ার বা কলসিতে জল রাখা হয়। কেলে কিসকিন্দে সেই সব পানের ডিবে চাপার কাজ করে। সুগৃহিণীরা নিয়ম করে পুরনো তেঁতুল দিয়ে ঘড়া মাজিয়ে ঝকঝকে করে রাখেন। আর উদাসীবাবার আখড়ায় সেই সোনার চাঁদ চেহারা থাকে না, কলঙ্ক লেগে ভূত হয়ে বসে থাকে। পাওনার মধ্যে আর থাকে গোটাকতক গম্বুজ গেলাস। জল ভরলে ওজন যা দাঁড়ায় ভীমভবানী ছাড়া কারুর তোলার ক্ষমতা থাকে না। এই সব মাল গিয়ে ঢোকে খাটের তলায়। সেলাইয়ের হাতমেশিন। প্যাকিং বাক্স, প্যাটরা, ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি, খালি

বোতল। মশামারা তেলের টিন, স্প্রেয়ার। খাটের তলা এক সাংঘাতিক জায়গা, যেখানে ঢুকে রোদন মানে অরণ্যে রোদন, অ্যানটার্কটিক এক্সপিডিসানের চেয়েও কঠিন ব্যাপার। জনৈক ভদ্রলোকের পুত্র হামা দিয়ে খাটের তলায় ঢুকেছিল। দেড়দিন তার কোনো সন্ধান মেলেনি। এদিকে জনতিনেক নিরীহপ্রাণী ছেলে-ধরা সন্দেহে কচুকাটা হয়ে গেল। শেষে ফোঁস করে জলের ধারা বেরিয়ে আসতে কার যেন সন্দেহ হল ভাঙা সিন্দুক তো হিসি করতে পারে না, নবকুমার নিশ্চয় ওইখানেই আস্তানা নিয়েছে। বেবিফুডের আতঙ্কে শুরু হল এক্সপিডিসান দেখা গেল দশ বছরের ঝুলে বালগোপাল দোলায় চাপার মত আটকে বসে আছে, খাদ্যদ্রব্যেরও অভাব ছিল না। ঘরে বসে যত মুড়ি চানাচুর, বিস্কুট খাওয়া হয়েছিল, সেইসব ছড়ানো ছেটানো টুকরো টাকরা, বাড়ির কর্তব্যপরায়ণ কাজের লোকটি ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে, ঝেঁটিয়ে ঝেঁটিয়ে খাটের তলায় ডামপ্ করেছিলেন। নয়া জমানার হিরো সেই ফুড ডাম্পকে কাজে লাগিয়েছে। শিশুতে আর মুরগীতে সামান্য ইতর বিশেষ, পিকিং আর ইটিং হ্যাবিট।

গৃহস্বামী মশারির ভেতর উঠে বসে বললেন, দাঁড়াও কি করা যায় দেখি!

ঘর অন্ধকার, মেঝেতে আড়াআড়ি আরও দুটো বিছানা পড়েছে, দুটো মশারি। হাই টেনসান লাইনের মত মশারি খাটাবার দড়ি দেয়ালের দিকে যেখানেই হুক বা পেরেক পেয়েছে সেইদিকে ছুটেছে। এ দড়ির ওপর দিয়ে সে দড়ি। সে দড়ির ওপর দিয়ে এ দড়ি।

pathagar.net

এর নাম মডার্ন লিভিং। বেশির ভাগ জামাকাপড় লন্ড্রিতেই পড়ে থাকে। বাড়িতে স্থানাভাব, আশেপাশে এমন কোনও গাছ নেই যেখানে ডালে ডালে ঝুলিয়ে রাখা যায়। ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে কমিউনিটি হাউসে ঘর ভাড়া নিয়ে দিতে হয়, নিমন্ত্রিতরা ভুল করে, উদোর জায়গায় বুধোর এলাকায় পাতা পাড়েন, খেয়ে উঠে বলেন, কই, তোমার কাকাকে তো দেখছি না। আজ্ঞে, আমার কাকা তো কোনো কালে ছিল না! আরে ছিল ছিল, কাজের বাড়ি তো! ভুলে গেছো।

জানলা

কারুর জানালার দিকে না তাকালেই হলো। বড় বদ অভ্যাস। ইংরেজীতে এই অভ্যাসের মানুষকে বলা হয় পিপিংটম। কবিরা তাকাতে পারেন কাব্যের খাতিরে। ছাড়পত্র দেওয়া আছে। জানালর ধারে খোলা এলোচুলে সে এক ইনস্পিরেসানের মত।

আজকাল আধুনিক বাড়ির জানালার বাহার খুব বেড়েছে। আগেকার কালে ফালি ফালি লম্বাটে জানালা ছিল। তাতে আবার জেলখানার মত শিক লাগান, যাকে বলা হত গরাদ। গৃহ ছিল গারদের মত। মানুষ ছিল আব্রু সচেতন। সংসারকে যত দূর সম্ভব ঢেকেঢুকে রাখার চেষ্টা হত।

একালে সে প্রয়োজন আর নেই। মানুষ এখন 'এগজিবিসানিসম্' ব্যাধিতে ভুগছে। ব্যক্তিগত সাজগোজ যেমন বেড়েছে, বাড়ির বাহারও তেমনি খুলেছে। জানালা হল বাড়ির বাহার। ডবল উইনডো, প্রায় সাত ফুট, সাড়ে সাত ফুট প্রশস্ত। তায় আবার গ্রিলের ঘটা। হাজার রকম ডিজাইন। কোনও ডিজাইন আবার চাইনিজ পাজলের মত। রঙমিস্ত্রীর পেছনে একজন পরিদর্শক লাগাতে হয়। মিস্ত্রীর চোখে ঘোর লেগে যায়। এই কেরামতিতে রঙ পড়ে তো, ওই কেরামতি মিস হয়ে যায়। কুড়ি টাকা রোজ, হাফ গ্রিলে রঙ ধরাতেই দিন কাবার। কর্তা চিতিয়ে পড়েন, টু কস্টলি, টু কস্টলি। একেই তো কোনও রকমে বাড়ি তৈরির পর মধ্যবিত্তের বছর ছয়েক আর হাঁড়ি চাপাবার সঙ্গতি থাকে না। এখানে ধার, ওখানে ধার। গৃহিণী ছেঁড়া ছেঁড়া শাড়ির আঁচলে রান্নার হাত মুছতে মুছতে বলেন, এখনও অনেক কাজ বাকি ঠাকুরপো। জানি না শেষ হবে কি না। ইনি তো রিটায়ার করে বসে আছেন, মেয়ের এখনও বিয়ে বাকি! নতুন বাড়ির আনন্দে কর্তা কোথায় হাসবেন, তা না মুখ চুপসে বসে আছেন একপাশে চোরের মত। ব্যবসায়ীরা ওই জন্যে বলেন, বাড়ি একটা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। কোনও

রিটার্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু কথায় বলে, সায়েবের গাড়ি, বাঙালীর বাড়ি।

যাক, বাড়ি করে পপার হয়ে যাবার কথা তোলা থাক। সে হল ভাসমান সমুদ্রে জলকষ্টে শুকিয়ে মরার মত ব্যাপার। যাঁদের অঢেল পয়সা, তাঁদের গ্রিলে পরী ওড়ে, হরিণের পেছনে শকুন্তলা ছোটে। এক এক পিস গ্রিলের খরচে গরীবের একটা আটচালা হয়ে যায়

আজকাল আবার বক্স প্যাটার্নের জানালা হয়েছে। ফ্রেম ছেড়ে গ্রিল এগিয়ে গিয়ে একটি খাঁচা তৈরি করে। তাতে কি যে বাহার খোলে আর্কিটেকটরাই জানেন। কলকাতায় ইদানীং পূর্বপুরুষ পোষার শখ বেড়েছে। অনেকের বারান্দাতেই আজকাল হাতিবাগানের বাঁদরদের বসে বসে দাঁত খিচোতে দেখা যায়। অনেকে আবার সাত সকালে সাইকেলের সামনে অপত্য স্নেহে বসিয়ে বাজার করতে বেরোন। তিনি আবার যেতে যেতে, সুযোগ পেলেই পথচারীর কান ধরে টান মারেন। ভাল অভ্যাস এই বাঁদর পোষা। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমাদের হারানো অভ্যাসসমূহ ফিরিয়ে আনা উচিত। যেমন দাঁত খিচোনো, চতুষ্পদের ব্যবহার, এক হাতে লাট খাওয়া, আঁচড়ানো কামড়ানো। কলা খাওয়া। কলা-ই তো একদিন আমাদের দেখতে হবে, তার আগে যদ্দিন পারা যায় খেয়ে নেওয়া যাক। একদিন আমাদের জীবিকাই হবে হয়তো অন্যের মাথার উকুন বাছা। বাঁদর আবার একসপোর্টেবল কমোডিটি। বিদেশে জাহাজ বোঝাই একস্‌পোর্ট করলে ব্যবসায়ীদের দু পয়সা হবে। মানুষ এখনও চালান হয় লুকিয়ে চুরিয়ে। এই নিয়ে হইচইয়েরও শেষ নেই। মাঝে মধ্যেই কাগজে ফাঁস হয়ে যায়। সমাজসেবীরা চিৎকার জোড়েন, পাকড়াও, পাকড়াও। কে কাকে পাকড়াবে! পুলিস চোরকে, না চোর পুলিসকে! বলা যায় না এমন দিনও হয়তো দেখবো, দুটো চোর চারটে পুলিসকে কোমরে দড়ি বেঁধে পেটাতে পেটাতে ফাটকে নিয়ে চলেছে। বিচারে বসেছে নিমু ওস্তাদ। জেল ভাঙতে ভাঙতে সব জেল ময়দান। মূল্যবোধ এখন রিভার্সিবল গিয়ারে চলেছে। 'সু' 'কু' হবে, 'কু' 'সু' হবে।

যাক, সে যবে হবে, তবে হবে। আপাতত ওই খাঁচায় বাঁদর লটকে দেওয়া যেতে পারে। নিমাইবাবু বাড়ি আছেন? বাঁদর অমনি খ্যাঁক খ্যাঁক করে নাচতে লাগল, লাথি দেখাতে শুরু করল। নিমাইবাবু, আহ্লাদে আটখানা, কি ইনটেলিজেন্ট ক্রিচার দেখেছেন? কেমন উত্তর দিচ্ছে! কি বলছে বুঝতে পারছেন?

আজ্ঞে না।

বলছে অসময়ে এসে পড়েছেন। নাচছে দেখেছেন! ঠিক যেন ডিসকো ড্যানস।

অনেক আলুথালু পরিবার ওই খাঁচা জানালায় লেপ কাঁথা ডাঁই করে রাখেন। দেখলো তো ভারি বয়েই গেল। 'আমার পাঁঠা' গোছের ভাব। আজকাল আবার স্বামীস্ত্রী দু'জনেই চাকরিতে বেরোন। কোনো কোনো জানালায় পা তুলে খাঁচায় ঢুকে বসে থাকে বিমর্ষ শিশু। সন্ধের পথ চেয়ে সারাটা দিন যার কাটে একা একা। কলকাতার পরিবহণের যা ছিরি, অফিস কখন যে তার পিতামাতাকে ফিরিয়ে দেবে, কোনও নিশ্চয়তা নেই। কোনও কোনও জানালায় বৃদ্ধাদের বসে থাকতে দেখা যায়। পৃথিবীর সব কাজ শেষ, যেতে পারলেই হয়। দুটি আঙুল দিয়ে শনের মত একটি একটি চুল টানছেন আর ছিঁড়ছেন।

জানালয় আবার পর্দার ল্যাঠা আছে। কোনও পর্দা স্প্রিঙে টানটান, কোনও পর্দা দড়িতে। মাঝখানটি ঝুলে আছে বড় বেদনার মত। অনেক পরিবার আবার পর্দা সচেতন। এ সপ্তাহে হলদে ঝোলেতো ও সপ্তাহে গোলাপী। সায়েবী মেজাজের মানুষের জানালায় সাদা। পর্দার কাপড় কেউ কেনেন নিউ মার্কেট থেকে। কেউ কেনেন গ্র্যান্ট লেন থেকে। কেউ কেনেন হাট থেকে। এমন জানালাও আছে যেখানে ঝোলে উদাসীনের পর্দা। ওষুধের মত, ডেট এক্সপায়ার করে গেছে, তবু ঝুলে আছে বিবর্ণ চেহারা নিয়ে।

দিনের জানালায় ঘর দেখা যায় না। রাতের জানালায় শিল্যুয়েট ভাসে। ভয় করে তাকাতে। বলা যায় না আধুনিক জীবনের কখন, কোন দৃশ্য চোখে পড়ে যায়।

সর্‌রি

মেজাজ খারাপ না করে মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারলে, পৃথিবীটা এমন কি দুঃখের! আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। সব কিছুরই একটা কায়দা আছে। লিভিং ইজ অ্যান আর্ট। জীবন-শিল্প। আমরা সব শিল্পী। শিল্প-সম্মত বাঁচার ধরনটাই আলাদা। সব সময় মনে রাখতে হবে, আমরা সভ্য মানুষ, বড়বাজারের ষাঁড় নই। সব রকম পশু, অল্প অল্প স্বভাবে থাকলেও আসলে আমি মানুষ। আমার আধারটি মানুষের। দুটি হাত, দুটি পা, একটি মাথা বা মুণ্ডু, দুটো গোল গোল চোখ। ন্যাজ নেই। অতীতের স্মৃতি ভেতরে আছে। অপারেশন করলে সেই স্মৃতিটি দৃশ্যমান হতে পারে। মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে ইঞ্চিখানেক একটি অংশ, ন্যাজের 'শকেট' হিসেবে এখনও রয়ে গেছে। সেটিকে ন্যাজ ভেবে আস্ফালন চলে না। পশুরা চ্যালেঞ্জ করলে প্রমাণ করতে পারব না, ওইটাই আমার ন্যাজ। যা প্রমাণ করা যায় না, তা আদালত মানবে না। আর একটি পশুজীবনের স্মৃতি,

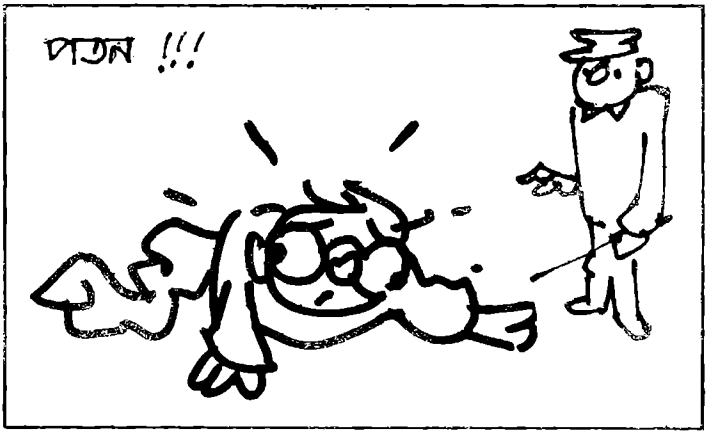

অ্যাপেনডিক্স। যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া ওই লেজুড়টির এখন আর কোনও ফাংশনও নেই। পূর্ব পূর্ব জীবনে ছিল। যখন আমাদের হাত দুটো পা ছিল। চারপায়ে পরানো ছিল কালো কালো চামড়ে ক্ষুরের হাইহিল। মুখটা আর একটু লম্বা ছিল। নাকের ফুটো দুটো আরও বড় বড় ছিল, কালো আর ভিজে ভিজে। নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আরও জোর ছিল। চোখ দুটো ছিল ড্যাবড্যাবা। চোখের পাতা ছিল না। আজানুলম্বিত, ভূমিস্পর্শী দোদুল্যমান একটি লেজ ছিল। মশামাছি তাড়াবার ঈশ্বরপ্রদত্ত হাতিয়ার। অতীত দেখার সাধনোচিত ক্ষমতা যাঁদের আছে। [যেমন শিক্ষক মহাশয়, বড়কর্তা, সাধক এবং স্ত্রী] তাঁরা তাকালেই স্পষ্ট দেখতে পান, আরে শ'খানেক বছর আগে, এ ব্যাটাই তো ধনগোপালের গোয়ালে বাঁধা থাকত। ভেলিগুড় মাখা জাবনা খেত কাঠের কেট্‌কো থেকে। তখনকার কালে অ্যাপেনডিকসের ফাংশান ছিল, শস্পভোজনের সহায়ক। তবে হ্যাঁ, আমার অ্যাপেনডিকস অন্যের কাজে লাগে। কারুর সর্বনাশ কারুর পৌষমাস। তিন হাজার টাকা রোজগারের ব্যবস্থা। পটলের মত ফুলে ঢ্যাঁপ হয়ে উঠলেই হল। দূতাবাসে গেরিলা বোমা বিস্ফোরণের মত অ্যাপেনডিক্স যদি ফাটে, দেহদূতাবাস হয়ে গেল খতম, ফিরে চলো আপন ঘরে, পেরিটোনাইটিস ? যাও বাছা নার্সিংহোমে। সাড়ে তিন থেকে চারের ধাক্কা।

শাস্ত্রে একটা পথ আছে, নেতি, নেতি। আমি এই নই, ওই নই, করতে করতে, আমিকে সঠিক ভাবে জানা। ঠিক সেইরকম, তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার

pathagar.net

আগে আমরা যদি একবার ভাবি, আমি পাঁঠা খাই, মাংস হলেও, রেঁধে সুস্বাদু করে খাই, সুতরাং আমি বাঘ নই, সিংহ নই। আমি যানবাহনে ওঠার সময় মাথা দিয়ে স্বজাতিকে নির্বিচারে ঢুঁস মারলেও, আমি কাজিরাঙার গণ্ডার নই কিম্বা গুঁতুস্তে ধেড়ে রামছাগলও নই। পরপর সাত দিন খেউরি না হলে চিবুকের তলায় যে চরিত্রটি তৈরি হয়, সেটি অজধর্মী হলেও আমি ছাগল নই। চোখ বুজিয়ে চোয়াল নেড়ে নেড়ে রোব্বার, রোব্বার যখন চচ্চড়ি চিবোই তখন পরিবারস্থ কেউ কেউ, আমার ওপর অকারণে যারা রেগে আছে, তারা হয়ত মনে মনে আমাকে ছাগল ভেবে আনন্দ পেতে পারে, তা পাক, তথাপি আমি ছাগল নই। সে তো আমিও অনেককে মনে মনে পাঁঠা ভাবি, আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা না থাকলে চেঁচিয়েও বলি। অবশ্য সে একেবারে নিতান্তই কাছেরদের, তা না হলে যাকে তাকে রেগে গিয়ে পাঁঠার মত, পাঁঠা বললে আজকাল শরীর খারাপের সম্ভাবনা আছে। লাশ ফেলে দেওয়াও অসম্ভব নয়। সত্যি পাঁঠা হলে গেরস্থের কল্যাণ হত। পঞ্চাশ কেজি তেইশ, কি চব্বিশ কি, জ্যাকেরিয়ার তিরিশের দরে নিদেন দেড় হাজার, মেটে আর গুর্দার আলাদা দাম। সরকারী হিসেবে মানুষের যা দাম, শুনলে ছাগলেও হাসবে। ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মরলে শ'পাঁচেক। বাস চাপা পড়লে কিছুই না।

মূল্যহীন এই মানব অস্তিত্বের একমাত্র অহঙ্কার, আমি মানুষ। পশুর মত আচরণ করে কখনও 'জেনুইন' পশু হতে পারব না। সে গুড়ে বালি। গরু হলে মরে জুতো হতুম। শূকর হলে মরে ভিস্তি হয়ে ভিস্তি-অলার কাঁধে চেপে পথে পথে ঘুরতুম। গর্ভে ধারণ করতুম জল। দিনে একবার করে কর্পোরেশনের বাথরুমে ঢুকে পিচিক পিচিক জল ছড়াতুম। বাঘ হলে মরে, সাধকের আসন হয়ে উদ্ধার পেতুম। স্যাবল হলে শিল্পীর তুলি। ফার ক্যাট হলে শীতপ্রধান ইওরোপের সুন্দরীর ফারকোটের গলার দুপাশে এলিয়ে থাকতুম। মানুষের কি-ইবা আছে। একমাত্র আত্মার অহঙ্কার ! দেহ নিয়ে 'পলিটিক্যাল-টার্গেট' হয়ে দিনগোণা।

আত্মার ঐশ্বর্যে বাঁচতে হলে মানবোচিত আচরণ বিসর্জন দিলে এ কুল, ও কুল, দু কুলই যাবে। পশুরা দলে নেবে না। ধ্যার ব্যাটা মানুষ, বলে চাঁট মেরে দূর করে দেবে, কি খেয়েই ফেলবে। মানুষেরা অবশ্য কিছু বলবে না ; কারণ 'লেটেস্ট থিওরি' হল আমরাও পশু। তবে অনেকদিনের আদর্শের 'নিউট্রিশানে' পুষ্ট বিবেক চোখ রাঙাবে, সেদিন তুমি মিনিবাসে ওঠার সময় এক প্রৌঢ়কে ষাঁড়ের মত গুঁতিয়েছ। ভদ্রলোক চাকার তলায় যেতে যেতে বেঁচে গেছেন। প্রথামত তুমি একটা 'সরি'ও বলোনি। পরশুদিন তুমি এক ভদ্রলোকের গায়ে দক্ষিণ আমেরিকার 'ল্লামা' জাতীয় প্রাণীর মত থুতু ছিটিয়েছ। এর আগের দিন

pathagar.net

গর্ভবতী গাই গরুর মত পেট মেরে, একজন প্রকৃত দাবিদারকে আউট করে বাসে আসন সংগ্রহ করেছ। সেদিন তুমি মিনিবাসে লাইন চালাচালির সময়, বেড়ালের মত সুট্ করে বেলাইনে ঢুকে পড়েছ। ব্রিফকেস মেরে মেরে এ পর্যন্ত ডজনখানেকের মালাই চাকতি খসিয়ে দিয়েছো।

বিবেক তুমি যাই বলো, ভূতের আক্রমণে যেমন রাম নাম, তেমনি পাশবিক আচরণের স্খালন একটি শব্দে 'সরি'। এই জীবনেই আমরা দেখে যাব, ঝড়াস্ করে মুণ্ডু নামিয়ে দিয়ে বললে, 'সরি' মুণ্ডু কাঁধ থেকে পড়ে যেতে যেতে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ'।

হাহাকার

ভীষণ লোভের কোনও ওষুধ আছে আপনার কাছে ? নানা রকমের লোভ সব সময় আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, ঘুণপোকার মত। হরেক রকমের বিজ্ঞাপন এক মুহূর্ত আমাকে তিষ্ঠোতে দেয় না। যেমন ধরুন কাপড়ের বিজ্ঞাপন। জামার কাপড়, প্যান্টের কাপড়। সুন্দর সুন্দর চেহারার পুরুষ বিজ্ঞাপনে কি সুন্দর সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে একবার দেখেছেন। বুকের কাছে সেঁটে থাকে সুন্দরী মহিলা। ও-রকম পোশাক পরলে সুন্দরীরা তো ছুটে আসবেই। তাদের আর দোষ কি, হইহই করে ছুটে আসবে, আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরবে। বড় ইচ্ছে হল, আমিও ওই রকম সাজি না কেন ? কত আর খরচ হবে ! ওম্মশাই, হগসায়েবের বাজারে একটা দোকানে ঢুকে দরদস্তুর করলুম। দাম শুনে ল্যাজ তুলে দৌড়। গাভী যেন ষণ্ড দেখেছে। অবাঙালী দোকানদারের সে কি হাসি। অ্যাসিসটেন্টকে হেসে হেসে বলছে—আরে ইয়ার দেখো দেখো, ক্যায়সে ভাগ রহে। বড় দাগা পেলুম মনে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, ভাঁড়ে হাফ প্লেগ, ফোটানো, বিহারী চা খেতে খেতে, মনে সেই শেয়ালটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলুম, যে বলেছিল, দ্রাক্ষা ফল টক। সে না এলেও পর-মুহূর্তেই বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমি কি গাধা ! নিজেকে স্বাধীন দেশের শিক্ষিত মানুষ ভেবে কি কষ্টটাই না পাচ্ছি ! আমি তো এক জানোয়ার। বিবর্তনে ন্যাজটা খসে গেছে বলে নিজেকে মানুষ ভাবছি। শাসকগোষ্ঠী আমাকে মানুষ ভাবে ? পরিবহণমন্ত্রী আমাকে মানুষ ভাবেন ? ভাবলে, প্রতিদিন আমাকে এইভাবে জ্যাম্বুবানের মত, ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফিরতে হয়। আমি কিন্তু সব রকমের ট্যাক্সো দি। পাঁচ বছর অন্তর ভোট দি। সময়ে অফিসে হাজিরা দি। কলম চালাই। উপবাসে থেকে ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করি। বিদেশের খবর

পড়ি, ছবি দেখি।

খাদ্যমন্ত্রী আমাকে মানুষ ভাবেন ? মনে তো হয় না। র‍্যাশানের চাল খেয়েছেন কোনও দিন ! গরু হলে বিদ্রোহ করত। শিং মেরে প্রশাসন উলটে দিত। মানুষ নিয়ে কারবার, না আছে শিং, না আছে গজদন্ত। ভাইটালিটির অভাবে মনেও সব ম্যাদা মেরে গেছে। চলছে চলবের শ্লোগানে চেতনা অবশ।

আচ্ছা পুরমন্ত্রী কি আমাকে মানুষ ভাবেন ? আরে না রে বাবা ! মানুষ ভাবলে, চারপাশে এত দুর্গন্ধ কেন ? পাঁক, আবর্জনা। বড় রাস্তার অবস্থা দেখলে গলির চেহারা সহজেই অনুমান করা যাবে। পারফ্যুম দ্য কালকুত্তা ফুরফুর করে উড়ছে, দালানে, শোবার ঘরে, খাবার ঘরে। ওদিকে পলিউশানের নেকচার চলেছে পাঁচ তারা হোটেলের বল রুমে। জ্ঞানগর্ভ থিসিস, স্পাইর‍্যাল বাউণ্ড, প্ল্যাস্টিকের কভারে হাতে হাতে ঘুরছে। থিসিস তো একটাই, সেই সহজ রাস্তা সহজে কারুর চোখে পড়ছে না—রাজনীতির ভাগ কমিয়ে, নীতির ভাগ একটু বাড়ানো। রাস্তা সহজে কারুর চোখে পড়ছে না—রাজনীতির ভাগ কমিয়ে, নীতির ভাগ একটু বাড়ানো।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাকে মানুষ ভাবেন ? ভাবলে হাসপাতালে আমার বিছানার তলায় কুকুর ঘুরে বেড়াতে পারত। বাথরুমের দরজার সামনে আমাদের উত্তর-পুরুষ গড়াগড়ি যেত। অচেতন রুগীর পিঠ খুবলে খেতে পারত লাল পিঁপড়ে। পারত না। আসলে বিজ্ঞাপনের মানুষরাই হল মানুষ। তাদের জন্যে নার্সিং হোম। পাঁচতারা হোটেল, ক্যাবারে, লাঞ্চ, ডিনার। এয়ারকুলার, প্লেন। বাকি সব জানোয়ার। ট্যাকস পেয়িং জন্তু। ইংরেজরা আমাদের মানুষ ভাবত না, তবু তাদের একটা গর্ব ছিল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশান। এঁদের কিছুই নেই। রিপোর্ট আছে, ভাষণ আছে, ঠাটবাট আছে, খোল আছে, হৃদয় নেই। পয়সা থাকলে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নাও। চার্টার্ড বাসের ব্যবস্থা করো আরামে অফিস যাবে। জেনারেটার কেনো, আলো পাবে। ট্যাংকি বসিয়ে পাম্প মেরে ছাদে জল তোলো দু ঢোঁক মিলবে। সাততলায় সংসার তোলো পচা গন্ধ কম পাবে। ফরেনে চলে যাও, সব পাবে, মাতৃভূমি ছাড়া।

কি পেলুম মশাই একবার ভেবে দেখেছেন ? উপেক্ষা, অনাদর, অবহেলা ছাড়া আর কি আমরা পেয়েছি ? রেল কোম্পানীর কমপ্লেন-বুকটা একবার খুলে দেখবেন। সাদা পাতার নীরব হাহাকার। কেউ আর কিছু লেখে না। প্রশাসনের চোখে ছানি, শ্রবণ শক্তি বার্ধক্যে ক্ষীণ। কি হবে লিখে। দূরভাষ গৃহশোভা। ডাক আর তার। আরোগ্যের জন্যে কোনও ডাকতার নেই ? আজকাল চিঠি আসে জলে ভিজে। টেলিগ্রাম ছোটে শম্বুকের গতিতে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—এমন কেউ আছো, যে এই মৃতপ্রায়, বয়েসের চেয়েও

BanglaBook.net

বৃদ্ধ, নিয়ত দগ্ধ মানুষের কথা একটু ভাববে। রবীন্দ্রনাথের মত লিখতে ইচ্ছে করে—তোমাকে দোহাই দিই, একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি। বড়ো দুঃখ তার।

যাক, লোভের কথা ছেড়েই দি। পৃথিবীর বহু জায়গাই তো দেখা হবে না। বহু খাদ্যই তো খাওয়া হবে না। হাঙ্গেরিয়ান ঘাউলাস, হর্স দ্যু ভর, মাটন কৈলাস, কনসোম কিপলিং, পপিয়েট দ্য রুজে মম। কত ককটেল ? জিনের সঙ্গে ভারমুথ তার সঙ্গে ডিমের সাদা তার সঙ্গে আনারসের রস তার সঙ্গে অ্যাঙ্গোস্টুরা বিটার। ভাঁচা খেয়ে [ভাঁড়ে চা] জীবন গেল 'ক্রিসেন্থিমাম-টি' শোনাই রইল। কত রকমের স্যুপ আছে—'বুদ্ধ জাম্পিং ওভার দি ফেনস', শুনেছি পৃথিবীর সবচেয়ে নামী আর দামী স্যুপ। সারা জীবন শুধু আলু, পটল, ঢ্যাঁড়স, পটল, আলু। গিমেশাক আর মুতোশাক। কুঁচো চিংড়ি লাউয়ের ঘ্যাট। বড় লোভ ছিল, আলপ্স দেখব, পামীর তুন্দ্রা দেখব, প্যারিসের ফলি বার্জার। কিছুই হল না। এ জীবনটা বিজ্ঞাপন দেখেই কেটে গেল।

আমি একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছি, আপনি কি আমার সেই হারানো জিনিসটি খুঁজে দিতে পারেন—সেটি হল আমার মুখের হাসি। আমার হাসি আমি হারিয়ে ফেলেছি।

সম্ভাবনা

প্রগতিশীল মানুষের মত আমাদের আর একটি চরিত্র ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে, সেটি হল প্রতিযোগিতাশীল। বেঁচে থাকাটা আর আগের মত সহজসাধ্য নেই। খেলুম-দেলুম আর গদাই-লস্করি চালে যা হয় একটা কিছু করলুম—সেই অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ চলে গেছে। পৃথিবীতে এক একটা যুগ এসেছে, চলে গেছে, যেমন ডার্ক এজ, প্যাপাল এজ, মিড্‌ল এজ, রেনেসাঁ, পোস্ট রেনেসাঁ, এজ অফ রিভাইভ্যাল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এজ, অ্যাটমিক এজ, সেই রকম আমাদের এ দেশে এখন চলেছে, ধস্তাধস্তির যুগ—এজ অফ ধস্তাধস্তি—এক ধরনের কুরুক্ষেত্র। সকলেরই মুখে ছোট একটি শব্দ, 'এই যাঃ হোলো না।' কি হোলো না, ছেলের প্রপার এডুকেশনের ব্যবস্থা হল না, মেয়ের ভালো বিয়ের ব্যবস্থা হল না, নিজের প্রোমোশান হল না, একটা মাথা গোজার ব্যবস্থা হোলো না। এ সবই হল, বড় বড় 'হোলো' না। ছোট আছে অসংখ্য যেমন, কেরসিন তেল আনা হল না, গ্যাসের জন্যে ধন্না দেওয়া হল না, রেশনে হঠাৎ ভালো চাল এসেছিল, তোলা হল না, লোডশেডিংয়ের আগে জল তোলা হল না। তার মানে এই যুগের আর

এক নাম—'এজ অফ হোলো না।'

আর একটি শব্দ, 'যাঃ বেজে গেল।' হয় নটা বাজল, না হয় বারোটা বাজল। অধিকাংশ মানুষই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। একটি বাজা সাংঘাতিক বাজা, সেটি হল নটা। সারা দেশ সাইরেনের কণ্ঠে আর্তনাদ করছে, অল ক্লিয়ার, যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, আবাসস্থল ছেড়ে, ছুটে বেরিয়ে এসো। লেট হয়ে গেল, লেট হয়ে গেল। কোনওরকমে তালগোল পাকিয়ে জীবিকার আসনে গিয়ে বসে পড়। হাজিরা ফাস্ট, কাজ ? তখন একটু ব্যাঙ্গের হাসি, 'যে ভালো করেছ কালী/ আর ভালোতে কাজ নাই। এবার ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা/ আলোয় আলোয় চলে যাই।' কাজের ঠ্যালায় সারা দেশ স্তব্ধ!

সাইরেন ন'টায় ককিয়ে উঠলে কি হবে, জাতির ঘড়িতে বারোটা বেজে বসে আছে। যাঃ বারোটা বেজে গেল, এ কথা এখন মুখে মুখে। বিদ্যুতের বারোটা, রাস্তাঘাটের বারোটা, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বারোটা, ট্রান্সপোর্টের বারোটা, পানীয় জলের বারোটা, জনস্বাস্থ্যের বারোটা, চতুর্দিকে বারোটা বাজার ধুম পড়ে গেছে।

পাশাপাশি আর একটি যুগও চলেছে, লাশ ফেলার যুগ। বিদেশ থেকে অনেক কিছুর মত এটিও আমাদের সাম্প্রতিক আমদানি। এমন মুড়িমুড়কির মত কথায় কথায় লাশ ফেলার রেওয়াজ কোনও কালে দেখা যায়নি।

বাঘ সাধাণত মানুষ খায় না। দুর্বল বাঘ কোনওক্রমে একবার মানুষ খেতে শিখলে ম্যানইটার হয়ে যায়। আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতা যত বাড়ছে, ততই আমরা আত্মঘাতী, নরঘাতী হয়ে উঠছি। যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি, সদাচারের পথ ছেড়ে আমরা ধীরে ধীরে দ্বিপদ জন্তু হয়ে উঠছি। যতদিন যাবে ততই এই জন্তুর বিকাশ সম্পূর্ণতার চেহারা নেবে।

তখন কি হবে ? আমরা বিলুপ্ত হয়ে যাব ? না তা হবে না। আমাদের সব কিছুর বিবর্তন হবে। আকার আকৃতিও হয়তো পাল্টে যাবে। গাছের উঁচু ডাল থেকে পাতা পেড়ে খাবার চেষ্টায় জিরাফের গলা লম্বা হয়ে গেল। শীতের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় শীতপ্রধান দেশের প্রাণীদের গায়ে লোম বেরুল। উট পেয়ে গেল গলায় জল ধরে রাখার গলকম্বল। কালে আমাদেরও তাই হবে। হয় তো কপালের দুপাশে দুটো শিং গজাবে। মনের আকৃতি পাল্টে যাবে। সারমেয় স্বভাব প্রবল হবে। দলবর্হির্ভূত কারুর সঙ্গে দেখা হলেই আস্ফালন, তর্জন-গর্জন, খেয়োখেয়ি। তখন আমাদেরও 'র‍্যাবিজ' হবে। কামড় খেয়েই ছুটতে হবে পাস্তুরে। গায়ে টিকস হবে। হাতের সমস্ত নখ সরু সরু হয়ে, আগা বেঁকে হুকের মত হবে। ক্যানাইন টিথ বড় হয়ে যাবে। মানুষের বাচ্চাকেও বেড়াল বাচ্চার মত আগলে রাখতে হবে, নয় তো হুলোয় মেরে দিয়ে যাবে।

জনপদ বলে কিছু থাকবে না। কমিউন্যাল ভায়োলেন্সে, পলিটিক্যাল

ভেনডেটায় সব মাঠময়দান হয়ে যাবে। কুকুরের মত নাচতে নাচতে ভীত মানুষ যখন যেখানে সুবিধে সেইখানেই আশ্রয় নেবে। চতুষ্পদের জগতে কিছু প্রাণী যেমন হিংস্র, কিছু আবার নিরীহ। দ্বিপদের জগতেও সেই শ্রেণীবিন্যাস অবশ্যই থাকবে। এখনও তাই আছে। একদল বাঁচবে গরুর মত। তারা হবে দোহনের বস্তু, নিপীড়নের বস্তু। একদল হবে ভারবাহী গর্দভ। একদল হবে ভীরু খরগোস। একদল হবে ধূর্ত শৃগাল। একদল হবে ফেউ। বাঘের পেছনে পেছনে ঘুরবে।

ধর্ম ঈশ্বর-বিশ্বাস ছাড়াও আরও কিছু। ধর্ম হল জীব-ধর্ম, স্বভাবের প্রকাশ। মানুষ আর পশুর মধ্যে দেহগত সীমারেখা ছাড়াও, আর একটি সীমারেখা ছিল, সেটি হল বোধ বা বোধি। মানুষকে বলা হয় 'থিঙ্কিং অ্যানিম্যাল'। এ যুগ হল 'অ্যাকসান' আর 'রিঅ্যাকসানে'র। মগজহীন, বোধ-বুদ্ধিহীন ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া।

আগামী শতাব্দীর শুরুতে কি হবে, বলা কঠিন। সুখই তখন হয় তো অসুখ হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ ওষুধ খেয়ে বিমর্ষ হবে, নেশায় বুদ হয়ে থাকবে। ওষুধ খেয়ে যন্ত্রণা চাইবে। নিজেকেই নিজে আহত করে তৃপ্তি খুঁজবে। এমনও হতে পারে মনুষ্য-বিজ্ঞানের চিকিৎসায় আর রোগ সারবে না, পশুবিজ্ঞানের পথ ধরতে হবে। সব হাসপাতাল আর স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়ে যাবে, 'ভেটেনারি হস্‌পিটাল'। মানব সন্তানকে 'ট্রিপল-অ্যান্টিজেনে'র বদলে দিতে হবে, 'অ্যান্টি-র‍্যাবিজ'! বলা যায় না কি হবে! Hanskoning-এর উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করি A barricade is more photogenic than a gas station. May be we have marched backward without knowing it ever since 1776.

থার্ডডিগ্রি

[ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বর্তমান। কিন্তু তিনি কি কলকাতায় বর্তমান! যদি বর্তমান থাকেন, আমার কিছু বলার নেই। যদি কোনওক্রমে মিস করে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কর্তব্যপরায়ণ প্রজা হিসেবে আমার কিছু জানাবার আছে। এদেশে অনেকেই অনেক রকম পরিকল্পনা তৈরি করে থাকেন, আমার এই পরিকল্পনাটি ঈশ্বরের জন্যে। তিনি গ্রহণ করলে সেবক হিসেবে আমি বাধিত হব। এর জন্যে আমি কোনও পুরস্কার বা অর্থের প্রত্যাশী নই। এ দেশের জনসেবকদের মতই আমি ঈশ্বরকে ফ্রি-সার্ভিস দিচ্ছি। তিনি পরমপিতা। আমি সন্তানের কর্তব্য পালন করছি। মৃত্যুর পর স্বর্গেও যেতে চাই না। যাবার উপায়ও

BanglaBook.org

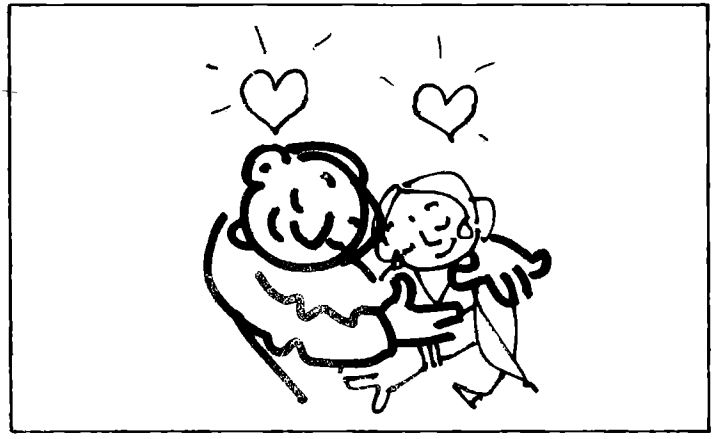

থাকবে না। ঈশ্বরের নিয়ম-কানুনও ভীষণ কড়া। অপঘাতে মৃত্যু হলে স্বর্গে স্থান হয় না। কিছুকাল ভূত হয়ে আনাচেকানাচে ঘুরতে হয়। সেই অবস্থায় কিছু ব্যক্তিকে ইচ্ছে মত ভয়টয় দেখান যায়। তারপর সোজা নরকে। কুম্ভীপাকে হাবুডুবু। মেয়াদ শেষ করে পুনর্জন্ম।

কলকাতায় যার বসবাস, তার মৃত্যু অপঘাতেই হবে। স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ।]

প্রতিবেদন হে প্রভো ! আপনি বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থ ব্যয়ে নানারকম নরক তৈরি করেছেন। সে সব নরকের বর্ণনা আমার শোনা আছে। পৌরাণিক হিন্দি ছবিতে দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে। আলকাতরা মাখা যমদূতের অট্টহাসি, কাঁটা খোঁচা গোল মুগুরের উত্তমমধ্যম প্রহার, সুন্দরী মহিলা হলে হাত ধরে টানাটানি, অনেকটা গণ ধর্ষণের মত, বিশাল কড়ায় তেল ফুটছে, তার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জন। সবই সেই গতানুগতিক ব্যাপার। ইম্যাজিনেশনের নাম-গন্ধ নেই। আপনি কি মডার্ন মেথড অফ টর্চারের এ· বি· সি·ও জানেন না !

শূকরকে কাদায় ফেলে রাখলে সে কি আকাশবাতাস তোলপাড় করে ফেলবে, কি নরক, এ কি নরক ? প্রথমে তাকে মানুষ করতে হবে, তারপর তাকে দিতে হবে শূকরের ট্রিটমেন্ট। যার অনাহারে থাকা অভ্যাস তার কাছে উপবাস তুচ্ছ ব্যাপার। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয় ! যে ভূরিভোজে অভ্যস্ত, তার এক বেলার আহার সরিয়ে নিলে তেড়েফুঁড়ে উঠবে।

তা হলে জেনে রাখুন, সাদার পাশে কালো খোলে ভাল। সবচেয়ে বড় টর্চার

হল প্রত্যাশার পাশে হতাশা। যিনি জুতো ছাড়া চলতে পারেন না তাঁর জুতো কেড়ে নাও। যিনি মখমলের শয্যায় অভ্যস্ত তাঁকে পাঁজাকোলা করে পাটাতনে শুইয়ে দাও। প্যাঁচা আপনারই সৃষ্টি। প্যাঁচাকে দিনের আলোয় ঠেলে দিলে, তার অবস্থা কি হতে পারে আপনি জানেন। তেমনি ভোরের পাখিকে রাতের আকাশে উড়িয়ে দিলে লাট খেয়ে পড়বে।

আপনি জানেন সব, কাজে লাগাতে পারেন না। কোনও কোনও ছাত্রের মত। জেনেশুনে গোল্লা খায়। সন্তানের কাছ থেকেও বৃদ্ধ পিতার অনেক কিছু শেখার থাকে। আমাদের জেলখানায় 'থার্ড ডিগ্রি' নামক একটি স্বাদু প্রয়োগবিধি অভিজ্ঞ মানুষের হাতে পারফেকশানে পৌঁচেছে। আপনার নরকে সবই ফার্স্ট ডিগ্রি। ধরুন, আমি যখন যাব, আমার জানাই আছে, যমদূতেরা ড্যাঙোশ মারবে। মেরে মেরে সর্ব অঙ্গ ঝাঁঝরা করে দেবে। মনে মনে আমি সেই ভাবেই প্রস্তুত হয়ে থাকব। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সহ্য করতে করতে এক সময় এমন 'কণ্ডিশাণ্ড' হয়ে যাব, যখন আপনার যমদূতেরা থামলেই আমি চেল্লাব, থামলি কেন ব্যাটা, চালা চালা।

আপনি 'ফুটবাথ-টেকনিক' জানেন ? কি করে জানবেন ! আপনার তো জীবনে সর্দি হয় না। আমাদের হয়। আপনি প্রভু সর্দি দিয়েছেন, ওষুধ দেননি। যাক সে ব্যাপারে আমার কোনও অভিযোগ নেই। ওই ব্যামোটি আমাদের প্রায়ই হয়। আমরা তখন এক বালতি গরম জলে খানিকটা নুন ফেলে পা ডোবাতে বসি। চেটো গরম জলে ঠেকিয়েই বাপ্ বলে শূন্যে তুলে দোলাতে থাকি। তদারকির জন্যে পাশে যমদূত অথবা দূতী স্থানীয় কেউ না কেউ থাকেন। সন্তান হলে মাতা, বলদ হলে স্ত্রী। তিনি অমনি ধাঁতাতে থাকেন, ডোবাও পা। পাপে ডোবার মত ধীরে ধীরে পা ডুবতে থাকে। শেষে সয়ে যায়। এমন সয়ে যায় যে, আধবুড়োরও শৈশব ফিরে আসে। দুটো পা জলের মধ্যে খলরবলর করে। তখন আবার আর এক প্রস্ত ধাঁতানি। মেঝেফেঝে জলে ভেসে যায়। তা আপনার ওই ফুটস্ত তেলের কড়ায় এই 'ফুটবাথ টেকনিক' রপ্ত করে, কত ঘাঘাবাঘা পাপী জেমস বণ্ডের মত সুন্দরীদের নিয়ে তেলকেলি করছে জানেন কি ? জানেন না। চিৎকার শুনে মনে করছেন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আজ্ঞে না। আমাদের উল্লাস, আর যন্ত্রণায় কোনও তফাৎ নেই। সমান আর্তনাদে আমরা দুটিকেই বরণ করে নি। বিশ্বাস না হয়, আমাদের বড় বড় উৎসবের দিনে, পথের পাশে এসে একবার দাঁড়ান। আনন্দের আর্তনাদ কর্ণে শুনে যান। আপনার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ যে কি মাল নিজের চোখে দেখে যান।

আর দেখে যান ম্যান মেড নরক। মেড ইন ক্যালকাটা। আমাদের অভিধানে হঠাৎ বলে একটি শব্দ আছে। আপনার অভিধানে শব্দটি মনে হয় নেই। এই

'হঠাৎ' দিয়ে আমাদের নরককে আপনার নরকের চেয়ে আরও পাওয়ারফুল করে তুলেছি। কুকুরের সোহাগ দেখেছেন ? আদর করতে করতে, আদর করতে করতে, কামড়। সর্বস্তরে আমরা সেই ব্যবস্থা চালু রেখেছি। সবাই তটস্থ। 'হঠাৎ' এর পাশে আছে, 'এই আছে এই নেই'। জল, জল, তেড়ে ফুঁড়ে পড়ছে, হঠাৎ নেই। সাগর থেকে মরুভূমি। আলো, আলো, ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তা রাস্তা গহ্বর। আর একটি থার্ড ডিগ্রি হল, 'গাছে তুলে মই কাড়া'। বঙ্গ পুঙ্গবদের অফিসে ঠেলে দাও। তারপর ঝাণ্ডাধারীদের রাজনীতির দম দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ রাজপথে খালাস করে দাও। সব অচল। সরব আস্ফালন, চলবে না, চলবে না। প্রভু, আপনার দানও অসীম। মৃদু শীত যেই গেল, এসে গেল ঘোর বর্ষা। কুঁচকি কণ্ঠা ডুবে গেল পেঁকো জলে। নরকের ভয় আর দেখিও না প্রভু। তোমার নরক আমাদের স্বর্গ।

ডাক্তারের দপ্তর

শ্যামা সেহানবিশ, মুচিপাড়া থার্ড বাইলেন। আপনি লিখেছেন, আমার গায়ের রঙ ছিল কালো। পাছে মনে দুঃখ পাই, তাই সকলে বলতেন, শ্যামা আমাদের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। পাত্র-পাত্রীর কলামে আমার জন্যে ইতিমধ্যেই দু-একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। তাতেও ওই একই কথা লেখা হয়েছে, গৃহকর্মে সুনিপুণা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি আপনাকে চিঠি লিখছি যে কারণে, তা হল, ওই বিজ্ঞাপনর গুণে কিনা জানি না, দিন দিন আমি সাদা হয়ে যাচ্ছি। কি রকম সাদা জানেন ? কেমন যেন ফ্যাকাশে, ইঁট চাপা ঘাসের মত। আয়নার সামনে দাঁড়ালে ভয় করে। চোখের মণিদুটোও বেড়ালের মত কটা হয়ে আসছে। চুলও আর তেমন কুচকুচে কালো নেই। হাতের লোম কেমন যেন বাদামী বাদামী হয়ে গেছে। এ আমার কি হল ? আমি কোনও ব্লিচিং এজেন্ট ব্যবহার করি না। রক্তশূন্যতা, তা-ই বা বলি কি করে ! মাথা ঘোরে না, দুর্বল লাগে না। আপনি অনুগ্রহ করে আলোকপাত করে আমার দুর্ভাবনা দূর করুন। আমার কি লিউকোমিয়া হয়েছে ?

শ্যামাদেবী, আপনার দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই। এই ঘটনা অনেকের জীবনেই ঘটেছে। মানুষ কেন, সব প্রাণীই প্রকৃতিনির্ভর। বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে জীবজগতে হাজার হাজার বছর ধরে একটু একটু করে পরিবর্তন এসেছে। জিরাফের গলা লম্বা হয়েছে। উটের পিঠে কুঁজ এসেছে। ক্যাঙারুর পেছনের পা দুটো লম্বা হয়েছে, ক্রমে ক্রমে বানরের ন্যাজ খসে মানুষ হয়েছে।

pathagar.net

সব গতিরই দুটো দিক আছে, অনেকটা গাড়ির মত, সামনেও এগোতে পারে, পেছনেও যেতে পারে, কোনও বাধা নেই—ফরোয়ার্ড মুভমেণ্ট, ব্যাকওয়ার্ড মুভমেণ্ট। গিয়ারের খেলা। জীব পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিছু চেষ্টা চলে সজ্ঞানে, কিছু অজ্ঞানে, অর্থাৎ আপনাআপনিই হতে থাকে। একটা ঘটনার কথা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমার এক বন্ধু তোলা উনুনকে তালাক দিয়ে গ্যাস নিয়েছিল। ভেবেছিল ব্যাপারটা বুঝি খুব সহজ। বেচারা আশির দশকের কলকাতাকে ঠিক চিনতে পারেনি। আসলে দেশটাকে তার কাছে, কাগজে কলমে, বক্তৃতায়, পরিকল্পনায়, বিজ্ঞাপনে যেভাবে হাজির করা হয়েছিল, সেটা ছিল অনেকটা একালের খাঁটি দুধের মত। তিনের চার ভাগই জল। রকের ভাষায় একে বলে গ্যাস খাওয়ানো। আমার সেই গ্যাসিফায়েড বন্ধুটির জ্ঞানচক্ষু যখন খুলল, তখন আর বুঝতে বাকি রইল না, যে গ্যাসে দেশ চলেছে, সে গ্যাস সিলিণ্ডারে নেই, সে গ্যাস জ্বলে না, সে গ্যাস হল ফুসফুসের গ্যাস, বক্তৃতার হাপরের টানে ফুসুর ফুসুর বেরোয়, কর্মহীন বাক্যস্রোতে পাকিয়ে পাকিয়ে আসে। আসল যে গ্যাস, তা একবার ফুরোলে, আর একটি সিলিণ্ডার কবে আসবে কেউ জানে না। আর গ্যাসের ধর্ম গ্যাসের মতই, এই ছিল, এই নেই। অনেকটা চামচাদের মত স্বভাব। বেশ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করছে। দাদা, দাদা করছে। হঠাৎ কোনও এক ফাইন মর্নিং-এ দেখা গেল কাকস্য পরিবেদনা। গ্যাসের গ্যাঁড়াকলে পড়ে, বেচারার প্রথম অভ্যাস হল, আধকাঁচা খাওয়া। চাল চাল ভাত, ক্যাঁচকেঁচে আলু। কাঁটা থেকে সহজে ছেড়ে আসতে চায় না এমন মাছ। দরকচা মারা ঢ্যাঁড়স। আর ঝিঙে। ভিটামিনে ভরপুর। আজ খেলে, কাল হজম হয়। আধকাঁচা মাছ আর মাংস খেতে খেতে স্বভাবের পরিবর্তন হতে লাগল। কেমন যেন মার্জার, শার্দুল শার্দুল ভাব। হাতপায়ের নখ ছুঁচলো হয়ে সামনের দিকে বেঁকে গেছে। চোখের মণি গোল থেকে ওপরে-নিচে লম্বাটে হয়েছে। কেউ কাউকে সোহাগ করলে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। সংসার থেকে রান্নার পাঠ উঠে গেছে একেবারে। এখন সেখানে ধরো আর খাও। সময় আর খরচ দুটোই বাঁচছে। সকলের চেহারাও বেশ ফিরে গেছে। একটাই কেবল অসুবিধে, প্রত্যেকের আচার আচরণ কিছুটা পাল্টে গেছে, তেমন আর নরম নরম, মানুষ মানুষ ভাব নেই।

শ্যামাদেবী, বিবর্তনের একটা ধাপে মানুষ দীর্ঘকাল আটকে ছিল। একই চেহারা, একই ধরনের স্বভাব। দ্বিপদ, দ্বিচক্ষুবিশিষ্ট লাঙ্গুলহীন এক জাতীয় বুদ্ধিমান প্রাণী। পরিবেশের চাপে মানুষে পরিবর্তন আসছে। চেহারায় ধরা না পড়লেও আচার আচরণে ধরা পড়ছে। মোটামুটি সকলেই বুঝতে পারছেন,

pathagar.net

মানুষ আর আগের মানুষ নেই। হয় অতিমানবের দিকে যাচ্ছে, না হয় যাচ্ছে অতিদানবের দিকে।

আপনি বিবর্ণ হচ্ছেন পরিবেশগত কারণে। অ্যানিমিয়া নয়, লিউকোমিয়াও নয়। এই ব্যাধির নাম ডার্কসিফার্সস। লোডশেডিং-এর অন্ধকারে দিনের পর দিন থাকার ফলে গাত্রবর্ণ কালো থেকে ছাইছাই হয়ে ক্রমশ সাদাটে হচ্ছে। অন্ধকারে চোখ চালাতে চালাতে, দেখার চেষ্টা করতে করতে, চোখের তারা ঘুরে গিয়ে বেড়ালের মত লম্বাটে হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ নীল কিংবা লাল কিংবা হলদেটে হয়ে যাবে। তখন আপনি রাতে স্পষ্ট দেখতে পাবেন। ইঁদুর দেখতে পাবেন, আঁস্তাকুড় দেখতে পাবেন, অন্ধকার ঘরে দেয়ালের গায়ে উইচিংড়ি দেখে নেচে উঠবেন। কেউ বেশি বিরক্ত করলে, ফ্যাঁস করে আঁচড়ে দিতে ইচ্ছে করবে।

এ তো ভাই শাপে বর। রঙ কটা হলে, বিয়ের ব্যাপারে সামান্য সুবিধা হওয়াই স্বাভাবিক। পাত্র ধরতে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা কম খরচ হবে। কালো জগৎ আলো, কাব্যের সান্ত্বনা। কালো সে যত কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। সে হল কবির দৃষ্টি। কবিরা সাধারণত বিবাহের চেয়ে কাব্যোচিত প্রেমকেই প্রশ্রয় দেন। আপনি বেঁচে গেছেন। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কালো বলে গঞ্জনা সহ্য করতে হবে না। বিয়ের পরের পরের দিন সকালবেলা ও মহল থেকে এ মহলে কেউ তেড়ে আসবে না, ও মশাই, গোটা দুই ওয়াশের পর আপনার মেয়ে আরও কালো হয়ে গেছে, একসট্রা ফাইভ থাউজেণ্ড ছাড়ুন। সেই ফাইভ ছাড়তে না পারলেই, আপনাকে হয় তো পাখার ব্লেড থেকে ঝুলতে হবে—টিকিটে লেখা থাকবে—মারার আগেই মরে গেছি, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চোষ।

॥ দুই ॥

বিমান সিংহ, বর্মন স্ট্রীট থেকে লিখছেন দিন দিন আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি। মনে নয় দেহে। আমার উচ্চতা প্রায় ইঞ্চিখানেক কমে গেছে। ঘেরেও অনেকটা কমে গেছি। উচ্চতা কমেছে কি করে বুঝলুম বলছি শুনুন। আমার শ্বশুর মহাশয় বিবাহের সময় যে খাটটি প্রথামত দিয়েছিলেন, তার দৈর্ঘ্য ছিল আমার স্ত্রীর মাপে। এর পেছনে নিশ্চয়ই তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি কাজ করেছিল কারণ তিনি ছিলেন ঠিকাদার। লম্বায় খাটের মাপ খাটো করায় শ' পাঁচেক টাকা নিশ্চয়ই কম লেগেছিল। সেই পাঁচশতে তিনি প্রথম জামাইষষ্ঠীটি সেরে প্রমাণ করেছিলেন জামাইয়ের তেলে জামাই ভাজা যায়। অবান্তর কথা কিছু বলে ফেললুম, ক্ষমা করবেন। একে বলে গাত্রদাহ। সেই খাটে শুলে আমার পা তিন

ইঞ্চি পরিমাণে বেরিয়ে যেত। স্ত্রীকে তাঁর পিতার মানসিক সঙ্কীর্ণতার কথা বলায় আমাকে সাধু ভাষায় বলেছিলেন—অন্যে সঙ্কীর্ণ হইলেও আপনে মহৎ হইয়া পা কিঞ্চিৎ হাঁটুর কাছ হইতে মুড়িয়া কুকুরকুণ্ডলী হইয়া শয়ন করিয়া প্রমাণ করহ, আপনি অনুদার হইলেও আমার উদার হইতে বাধা নাই। আপনার পদদ্বয় যন্ত্রদানবের ন্যায় লোহ নির্মিত নহে। শৈশবে অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন সেই অপূর্ব নীতি উপদেশ—যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় ন'জন, যদি হয় কুজন মান পাতায় একজন। দিন কয়েক হইল হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম [আমারও শুদ্ধ ভাষা আসিতেছে] আমি খাটের মাপে এসে গেছি। ডাক্তারবাবু আমার কেবলই ভয় হচ্ছে, এই রেটে কমতে থাকলে আমাকে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো হামা দিতে হবে। কেন এমন হলো ?

বিমানবাবু আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি অকারণে ভয় পাচ্ছেন। কলকাতার অনেকেরই দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ ধীরে ধীরে কমছে। এই ব্যাধির নাম—মিনিবাসাইটিস-বাঁটাইটিস। দীর্ঘকাল মিনিবাস নামক অদ্ভুত যানে চেপে ঘোরাফেরা করলে, দুটি অসুখ হতে পারে, প্রথমটির কথা বললাম, দ্বিতীয়টি হল—স্পণ্ডিলাইটিস। দ্বিতীয় ব্যাধিটি আরও যন্ত্রণাদায়ক এবং কুৎসিত। সারাজীবন গলায় বগলস পরে আলসেসিয়ানের মত ম্যানমেসিয়ান হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। এই ব্যাধি যে গ্রুপে পড়ে—সেই গ্রুপটির নাম প্রফেসানাল ডিজিজ্। যেমন যাঁরা বছরের পর বছর কোলে কুলো রেখে দুলে দুলে বিড়ি

BanglaBook.org

বাঁধেন, তাঁরা পরবর্তীকালে ওই পেশা পরিত্যাগ করলেও, কোথাও বসলেই দুলতে থাকেন, আর হাত দুটোকে বিড়ি পাকানোর ছন্দে ঘোরাতে থাকেন।

আপনারও হয়তো এমন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে, বাসে কিম্বা সিনেমায় যিনি আপনার পাশে বসেছেন, তিনি বিরক্তিকরভাবে পা নাচাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। জেনে রাখুন তিনি প্রফেসানাল ডিজিজে ভুগছেন—ভদ্রলোক হয় সেলাইকল চালান, নয়তো চালাতেন।

অনেকে দেখবেন কথা বলার সময় এপাশে, ওপাশে ভীষণ হাত নাড়েন। অনেক সময় আচমকা এই হাত নাড়ায় কারুর চোখের চশমা খসে যায়। যে চা নিয়ে আসছে তার চায়ের কাপ ছিটকে চলে যায়। জেনে রাখুন এও একই ব্যাধি। ভদ্রলোক এক সময় পুকুরে খ্যাপলা জাল ফেলতেন, মাথার ওপর হাত ঘুরিয়ে।

অনেকে দেখবেন কথা বলার সময় আচমকা চড়চাপড় মেরে দেন। বিশেষত মেয়েরা। জানবেন এঁরা এক সময় মোগলাই পরটা তৈরি করতেন। মোগলাই পরোটা তৈরির সময় খুব চড়চাপড় মারতে হয়।

যাঁরা দাঁত তোলেন, তাঁরা অন্য কোনও জিনিস তোলার সময় হ্যাঁচকা টান মেরে তোলেন। এমন ঘটনাও ঘটেছে, ছেলেকে হাত ধরে তুলতে গিয়ে, হ্যাঁচ করে এমন টান মারলেন, হাতের খিল খুলে গেল।

আমার কাছে এক যুবক একবার চিকিৎসার জন্যে এসেছিলেন। তিনি চলতে গেলেই পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে যেতেন। শক্ত সমর্থ যুবক। প্রেসার নর্মাল। হার্ট, লাংস, লিভার, পিলে সব নর্মাল, তবু কেন এমন হয়। প্রশ্ন করে করে জানতে পারলুম, তিনি সাত বছর একটানা, প্রতিদিন ঘণ্টা তিনেক করে একটা গাছতলায় তাঁর প্রেমিকার জন্যে, পায়ে পা জড়িয়ে, কেষ্ট ঠাকুরটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

বিমানবাবু আপনি যদি আবার আপনার পূর্বের দৈর্ঘ্যে ফিরে আসতে চান তাহলে মিনিবাস একেবারে বর্জন করুন। তা নাহলে আপনার আশঙ্কাই সত্য হবে। ক্রমে ছোট হতে হতে শিশুর আকৃতি প্রাপ্ত হবেন। গোঁফ আর দাড়ি অবশ্য থেকেই যাবে মাকুন্দ হবার সম্ভাবনা নেই। স্বভাবটি হয়ে যাবে নাসারী-বালকের মত। এই মানসিকতা এখনই এসে গেছে।

আমাদের চেতনাউদ্রেককারী জলাশয় নেই। এমন কেউ নেই, যে আমাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বলবে—ওই দ্যাখো, তুমি মানুষ। শুধু চেহারায় মানুষ না হয়ে মনে মানুষ হও। যাক, তা যখন হবার আশা নেই, গোটাকতক মুষ্টিযোগ আপনাকে শিখিয়ে দি—এক, রোজ দাড়ি কামাবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে

থাকবেন। প্রথমে হাসবেন, দেখবেন আপনার মুখও হাসছে। হাসি হাসি মুখ, হাসি হাসি চোখ, অনুভব করবেন নিজেই, দেখতে কত ভাল লাগে! দুই, এবার নিজেকেই নিজে চোখ রাঙাবেন, দাঁত খিচোবেন, দেখবেন বিশ্রী লাগছে। তিন, স্থির হয়ে নিজের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে, ধীরে ধীরে সাতবার বলবেন, আমি মানুষ, নরখাদক নই, আমি মনে পূর্ণ, দেহে পূর্ণ।

সাতবার বলা শেষ হলেই, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে জানালার গ্রিলের সবচেয়ে ওপরের পার্টিটা দু' মুঠোয় চেপে ধরে চোখ বুজিয়ে ঝুলে থাকবেন তিন মিনিট। তখন মনে মনে বলতে থাকবেন—আমি বড় হচ্ছি, আমি বড় হচ্ছি। সাবধান, ভুলেও ভাববেন না, আমি বাঁদর হচ্ছি।

দাম কমল

আমরা একেবারেই কিছু করতে পারিনি, ধেড়িয়ে বসে আছি, এ কথাটা কিন্তু সত্য নয়। এক ধরনের অপপ্রচার। হ্যাঁ, দাম বেড়েছে। অস্বীকার করছি না। চাল, ডাল, নুন, তেল, আলু, পটল, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, সব কিছুর দাম বাড়তে বাড়তে ফানুসের মত সাধরণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। সেটাও এক ধরনের সাফল্য। জীবনযাত্রার মান, তার মানে উন্নত হল। আমেরিকাতে পটল পাঁচ, এখানেও পাঁচ। অর্থাৎ এ দেশে আমেরিকা এসে গেছে? আমেরিকায় এক ডলার মানে ওদেশের এক টাকা, আমাদের দেশে এক ডলার মানে প্রায় ন'টাকা। অর্থাৎ আমেরিকার চেয়ে আমরা ন'গুণ বড়লোক। সবকিছু আমরা চড়া সুরে বেঁধে রেখেছি। এক জোড়া জুতোর দাম দুশো টাকা। দু'কামরার ঘরের ভাড়া চোদ্দশো। সাধারণ একটা শাড়ি পঞ্চাশ থেকে ষাট। কে উলঙ্গ হয়ে রইল, কার আধবেলা খাবার জুটলো, আমাদের দেখার দরকার নেই। বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে প্রতিযোগীরা যখন হাইজাম্প করতে নামে তখন লাঠিটাকে কি যে সবচেয়ে কম লাফাবে তার হিসেবে নিচু করে রাখা হয়? আজ্ঞে না। সেটিকে রেকর্ড উচ্চতাতেই আটকে রাখা হয়। লাফাতে পারো ভাল। না পারো হুমড়ি খেয়ে বিদায় নাও। জীবন হল হাইজাম্প। পটল ধরতে পারো, পাতে পড়বে। মাছ ধরতে পারো চোখে দেখবে। দুধ কিনতে পারো তো পেটে পড়বে। আমাদের বাবা সোজা নিয়ম। তুমি রোজগার করতে পারবে না সারাজীবন ফ্যা ফ্যা করবে, আবার স্বপ্ন দেখবে, আপেল খাবো, আঙুর খাবো, মুসুম্বির রস খাবো, মুরগীর ঠ্যাং চিবোবো। গোপাল আমার। আমরা কি তোমার মামা! আবার নাকে কাঁদা হয়, দেশে চাকরি নেই। ন্যাজাল কীর্তন। চাকরি কি

pathagar.net

গাছের পাকা পেয়ারা, না বারুইপুরের সবেদা, পেড়ে ঝাঁকায় করে সাজিয়ে রাখা হবে, না হরির লুঠের বাতাসা, না জলের মাছ, জাল ফেলে ধরা হবে। সব সাবালক হয়েছো, নিজেদের রোজগারের ব্যবস্থা নিজেরা করে নাও। পাখি চাকরি করে ? বাঘ চাকরি খোঁজে ? গরু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখায় ? গাধা কেরানী হতে চায় ? দেখে শেখার বয়েস হয়েছে সব। মুরগী কি করে ? আঁস্তাকুড় খুঁটে খাদ্য সংগ্রহ করে। জীবজগতের অন্য জীব যে ভাবে বেঁচে আছে, সেই ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো। না পারো পটল তোলো। প্যানপ্যানানি আর ভাল লাগে না। বাবুদের আবদারের যেন শেষ নেই। ফ্ল্যাট চাই, পাকা পায়খানা চাই, চব্বিশ ঘণ্টা জল চাই, আলো চাই, খাট চাই, নরম বিছানা চাই। বউ চাই, বেবীফুড চাই। হাসপাতাল চাই। একপা হাঁটার গতর নেই, বাস চাই, টেরাম চাই। জ্যাম হলে চেল্লাবে, ট্র্যাফিক পুলিশ ঘুষ নিচ্ছে ? বেশ করছে নিচ্ছে। যাদের কাছ থেকে নিচ্ছে তারা বুঝবে। তোমাদের নাক গলাবার কি আছে। তুমি কি রাস্তা পার হবার জন্যে ঘুষ দাও।

আমাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, আমরা খোদ মানুষের দাম কমিয়ে দিয়েছি। মানুষের আর কোনও দাম নেই। হাতিবাগানে বিলিতি কুকুরের দাম আছে। নিউমার্কেটে মুনিয়া পাখির দাম আছে। মানুষের বাজারে মানুষ এখন বিনাপয়সার মাল। যে কোনও হাটে নিজেকে বেচার জন্যে একবার ফেলে দ্যাখো, একটিও খদ্দের মিলবে না। তোমার পাশ থেকেই অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চা কিনে নিয়ে যাবে সাতশো টাকায়, তুমি সারাদিন বসেই থাকবে, গলায় 'ফর সেল' নোটিস লটকে। মানুষ ? ধুস, তার আবার কি দাম ?

আগে গ্রামাঞ্চলে খ্যাঁকশেয়ালে দাওয়া থেকে মানুষের বাচ্চা তুলে নিয়ে যেত। গ্রামের মানুষ লাঠিসোঁটা, লণ্ঠন নিয়ে হই হই করে বেরিয়ে পড়ত। এখন শেয়াল নেই মাস্তান আছে। যাকে খুশি তুলে নিয়ে যাবার হক আছে তাদের। চিরে চিরে অ্যানাটমি দেখতে পারে। জ্ঞানের কি শেষ আছে রে ভাই ! মানুষ যদি মানুষকে না দেখে, তাহলে নিজেকে চিনবে কি করে ? কোথায় লিভার, কোথায় পিলে, কোথায় হার্ট, কোথায় লাঙস। মেডুলা অবলংগেটা। ফ্যাসিও মেডুলা। সংবিধান বলছেন, সকলকেই জ্ঞানার্জনের সমান সুযোগ করে দিতে হবে। মানুষ তো আর ওয়াইলড্ লাইফ নয়, যে প্রিজারভেশানের আওতায় পড়বে। বুটিদার চামড়ার জন্যে কুমির মারা চলবে না। ডোরাকাটা ছালের জন্যে বাঘ মারা চলবে না। মানুষ না বাঘ, না সিংহ, না সাপ, না কুমির। থার্ডক্লাস একটা অ্যানিম্যাল, ফার্স্টক্লাস প্রিজনারের সম্মান পেতে চায়। কি আবদার রে ভাই ! পায়ের জিনিস মাথায় উঠতে চায় !

ও সব ভুলে যাও মিঞা। বাসে, ট্রামে, রাস্তায়, ঘাটে, হাটে-বাজারে তোমার

কি সম্মান। বোঝো না। পেছনে চাপড় মেরে বললে, যাঃ ব্যাটা খোলের ভেতর যা। নামার সময় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বললে, বেরো ব্যাটা। নামতে দেরি হলে ভেতরের জাতভাইরাই বলবে লাথি মেরে ফেলে দে। রাস্তায় দুই মানুষে মুখোমুখি দেখা হলে, কি নবীন, কি প্রবীণ, কেউ কাউকে পথ ছাড়ে ? বলশালী কনুই মেরে, ঠেলে একপাশে কাত করে দিয়ে, ডিসকো বানিয়ে চলে যায়। সহবত ম্যানারস্ এটিকেট ! সেসব ছিল যুদ্ধের আগে। পরাধীন যুগে। তখন পাখি গান গাহিত, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর খবর রাখিত। নবীন প্রবীণের সামনে সিগারেট লুকাইত। প্রথম ভাগের পাতায় গোপাল নামক একটি সুবোধ বালক বসবাস করিত। যাহা পাইত, তাহাই খাইত। দুষ্ট ভুবন মাসীকে কাছে ডাকিয়া, তাহার কান কামড়াইয়া আত্মদর্শনের কথা বলিত—তোমার আদরেই আমি এরূপ বাঁদর হইয়াছি। স্বাধীনযুগে সম্মানক আর সম্মানিতের ইতর ব্যবধান ঘুচে গেছে। এক ক্লাস। ইতরে জনা। যাও বৎস, প্রধান শিক্ষকের কাছা খুলে দিয়ে এসো। পিতার টেংরি খুলে টঙে টাঙিয়ে রাখো। ভাই সব হেঁকে বলো ডিস্কো সুরে—হাম সব জন্তু হো। কর্মযোগীর তিনটি কর্ম—আহার, নিদ্রা, মৈ।

যদি

বড় দুশ্চিন্তায় আছি মশাই ! মেয়ের বিয়ে দিতে হবে ? আপনি বলবেন, এতে আবার দুশ্চিন্তার কি পেলেন ? ট্যাঁকের জোর বুঝে, 'গ্রুম মার্কেট' থেকে তুরুম ঠুকে পছন্দ সই পাত্র কিনে এনে পাত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুখের সংসার সাজিয়ে দাও। সবই তো টাকার খেলা ভাই।

ঠিকই। দুনিয়া টাকার চাকায় বাঁধা। টাকার চাকা গড়ায় কিন্তু কোনদিকে, সুখের দিকে, না দুঃখের দিকে ? ধরা যাক ভিটে-মাটি-চাঁটি করে লাটে উঠে লক্ষ্মীমন্ত একটি বাবাজী আমি ধরে নিয়ে এলুম। বেশ দাপটের চাকরি কিম্বা প্রোফেসান। খুব শিক্ষিত। দেখতে শুনতে ভালো। ঘর সাজিয়ে দেওয়াথোয়া করলুম। কোনও কৃপণতা হল না। খুব সানাই বাজালুম। খুব লোক খাওয়ালুম। তারপর ! আমার মেয়ে সুখী হবে তো ?

মানুষের বাইরেটা দেখা যায়। ভেতরটা যে দেখা যায় না ? প্রথম রাতের হাসি, প্রথম রাতের সদাচার, রাত না পোহাতেই যদি কান্না আর কদাচারে কদর্য হয়ে ওঠে ! বলতে পারেন, যদির কথা নদীর জলে। যদির ভয়ে আতঙ্কিত হবার কোনও মানে হয় না। কিন্তু যদিই যে আজকাল বড় বেশি সত্য হয়ে উঠছে। মন বলে মানুষের যে আজকাল কিছুই নেই। পুরনো মন ভেঙে চুরে তাল তুবড়ে

pathagar.net

গেছে। নতুন মন নতুন আদর্শ নতুন বিশ্বাস তৈরি করছে।

কারুর হাতে একটা জীবনের দায়িত্ব তুলে দিতে বড় ভয় করে। দায়িত্বশীল মানুষের সংখ্যা ক্রমশই কমছে। বলবেন, মেয়েরা মানিয়ে নিতে জানে, সহ্য করতে পারে। বিয়ে তো আপনার নয়, আপনার কন্যার। যেখানে গিয়েই পড়ুক না কেন, ঠিক গুছিয়ে নেবে।

গুছোবার প্রশ্ন আসছে কেন ? মানাবার কথা উঠছে কেন ? যথোচিত মূল্যে আমি যখন একটি পাত্র কিনছি তখন সে কেনা তো অনেকটা জুতো, জামা কেনার মতই। খুঁত খুঁত করে মেনে নেবার প্রশ্ন আসে কি করে ? কেউ তো দয়া করে আমার মেয়েটিকে নেবে না। নাক দেখবে, চোখ দেখবে, চলন দেখবে, বলন দেখবে, কলম দেখবে, কালচার দেখবে, চুল দেখবে, নখ দেখবে। তারপর মেয়ের বাপকে দেখবে। বেশ ভাল করেই দেখবে। দেখার পর ভদ্রলোক দেউলে হবে। তারপর অনবরতই দেখতে থাকবে। লিভার তখন বাবাজীর হাতে।

জানা ছিল না। বাবাজীর একটা মুদ্রাদোষ আছে। শনিবার শনিবার ওই ময়দানের ওপাশে বড় মাঠে যান। ভিকটোরিয়ার টানে নয়। হ্রেষাকর্ষণ কেশাকর্ষণ করে নিয়ে যায়। ঘোড়া ছুটিয়ে বাবাজী কিঞ্চিৎ বিদেশী আনন্দ আহরণ করেন। পূর্ণ প্রাণে গিয়ে শূন্য প্রাণে ফিরে আসেন। আসার সময় সেই শূন্যতায় কিঞ্চিৎ আরক ঢালেন। দুই, তিন, চার। জীবন বড় যন্ত্রণারে বাপ্। ফিরে এসে তিনি স্ত্রীর ওপর তবলা সাধেন। দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর গর্ভধারিণী দেখেন। সোনার চাঁদ ছেলে পরের মেয়ের ওপর আড়া-ফাঁক-তাল অভ্যাস করছেন। গর্বে বুক দশ হাত, বাপকা বেটা। বাবাজীর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। শ্বশুরকে হতে হবে ব্যাঙ্কার। লিভারে চাপ মারলেই টাকা ছাড়তে হবে। নয় তো মেয়েটিকে ধামসে শেষ করে দেবে।

সকাল বেলা বোঝে কার বাপের সাধ্য ! স্যুটেড, বুটেড, ফুলকো টেরি, ব্রিফ-কেস, মন কেমন করানো পারফ্যুম। মুখে ইন্টারন্যাশনাল বুলি। সমাজ-চেতনা, বিশ্ব-চেতনা, স্পোর্টস, পলিটিকস। সূর্য ডুবলেই ফ্রাসট্রেসান। যোগ্যতার পুরস্কার মিলল না। প্রতিভাকে কেউ চিনল না। এক পালকের আর একটি পাখি বললে, ইয়েপ। দুই ইয়ারে, পার্ক স্ট্রিটের বারে বসে চাঙ্গায়িনী সুধাপান করে, সখি আমায় ধরো ধরো অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন। আমার পঞ্চাশ হাজারে কেনা হীরের টুকরো।

আমার প্রতিবেশীর কাহিনী শুনে ভয়ে মরি। বেশ শাঁসালো ঘরে একমাত্র মেয়েকে পাত্রস্থ করেছিলেন। পয়সার অভাব নেই, কিন্তু কুচুটে স্বভাব। বাবাজী বায়না ধরলেন, একটি স্কুটার চাই। মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক সর্বস্বান্ত। একটু

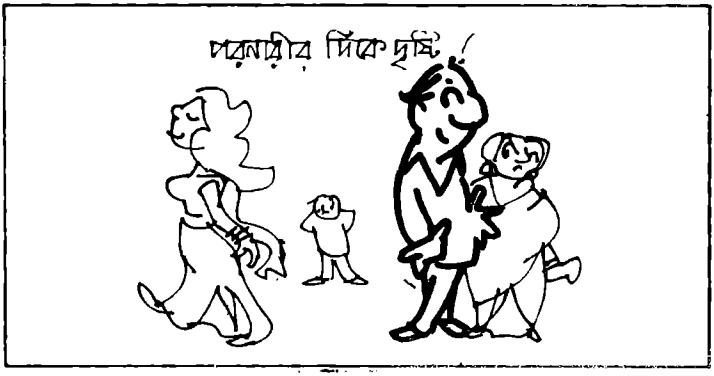

দম নিতে চেয়েছিলেন। মেয়েটি কিন্তু বেদম হয়ে গেল। দিন কতক কম্বল ধোলাই চলল। তাতেও যখন শ্বশুরমশাই স্কুটার প্রসব করলেন না, তখন এক শিশি কীটনাশক দিয়ে বলা হল, খেয়ে নাও তো মা। তুমি মরলে দ্বিতীয় পক্ষ স্কুটারে চেপে এসে পড়বে। মেয়ে আপত্তি করায় বলা হল, বঙ্গ ললনা, স্বামীর অবাধ্য হতে নেই, বাপ-মায়ের বদনাম হবে মা। তুমি কেমন বাপের মেয়ে। মৃত্যুটা আত্মহত্যা বলে বেমালুম চলে গেল।

আবার এমন ছেলেও আছে, যে বিশ্ব-প্রেমিক। বিয়ের পরও যার প্রেমে ভাঁটা পড়ে না। জোয়ারের স্রোত বইতে থাকে। একবার একে ধরে টানে, একবার ওকে ধরে টানে। সাতপাকের আসল বাঁধন শিথিল হয়ে আসে। বলতে থাকে, ঘরকা মুরগী ডাল বরাব্বর। পাখি অমনি উড়তে শুরু করল। ঘরেরটি রইল ঠোকোর মারার জন্যে। বাইরেরটি রইল প্রেমের জন্যে। বলবেন, পলিগ্যামি ইজ এ টেন্‌ডেনসি ইন ম্যান। পূর্বপুরুষের ইতিহাস নাড়াচাড়া করে দেখুন, কি সব ইতিহাস ছেড়ে রেখে গেছে! সাজ, পোশাক জীবিকা পালটেছে। শিক্ষার ধারা পালটেছে। মন তো সেই একই আছে। জরু আর গরুকে একই সারিতে ফেলে রাখা হয়েছে। কেতাদুরস্ত বৈঠকখানা, আলমারি ঠাসা বই, দাঁতনের বদলে টুথপেস্ট, কয়লার বদলে গ্যাস, স্টিরিও, টিভি, ফ্রিজ, ফোন, সংবিধান, ডেমোক্রেসি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিস, মুরগী-মটন-ফ্রায়েড রাইস, গ্রহান্তরে মানুষের বিজয় বার্তা, এদিকে বাঙালীর ঘরে ঘরে বঙ্গললনা চোলাই হচ্ছে, ধোলাই হচ্ছে, পুড়ে মরছে, ঝুলে মরছে। ঘরে ঘরে যেন আড়ং-ধোলাইয়ের ধোবিখানা বসে গেছে। সানাইয়ের সুরে পুত্রবধূ এনে কান্নার সুরে নির্বাসন। বাবাজীবনকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যেই তাঁর গর্ভধারিণী, পিতা, ভ্রাতা,

ভগিনী সবাই প্রস্তুত। বারান্দা থেকে ঠেলে ফেলে দাও, কেরোসিনে চুবিয়ে কাঠি মেরে দাও। সাধ করে কে মশাই মেয়েকে কষাইখানায় পাঠাতে চায়, তবু পাঠাতে হয়!

আমি কি সেই বোকা, যে যদির কথা ভেবে এত কাতর! গল্পটা তাহলে শুনুন। ভোরবেলা কুয়োতলায় জল তুলতে গিয়ে কর্তা হাপুসনয়নে কাঁদছেন। গৃহিণী ছুটে এলেন—কি হল কি তোমার?

কর্তা বললেন, এই সাংঘাতিক কুয়ো, কী ভীষণ গভীর! ওগো কি হবে গো! তোমার মেয়ের একটি ছেলে হয়েছে। সেই নাতিটি আমাদের বড় হবে, একদিন এখানে বেড়াতে আসবে, তারপর খেলতে খেলতে চলে আসবে এই কুয়োর পাড়ে, তারপর সে ঝুঁকে দেখতে যাবে কত জল, তারপর হঠাৎ পা ফসকে যদি উলটে পড়ে যায়, ওগো, তখন কি হবে গো!

গৃহিণীও সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরলেন, ওগো কি হবে গো।

আমিও কি সেই গল্পের বোকা, যদির আতঙ্কে যন্ত্রণা পাচ্ছি?

তন্ত্রসাধনা

পাঁচ রকম দেখে শুনে, পড়েটড়ে, আমার একটা আশঙ্কা হচ্ছে, এরপর কি হবে?

মাঝে শোনা গেল মানুষের ছাগল খাওয়ার ঠেলায় ছাগল শেষ হয়ে আসছে। মানুষ নির্বিচারে এত বাঘ মারছে যে বিশ্ব পশু সংরক্ষণ সংস্থা চিৎকার শুরু করলেন, আর বাঘ মেরো না। এই হারে বাঘ মারতে থাকলে বাঘ জাতিটাই লোপাট হয়ে যাবে। এইভাবে পৃথিবীর সব জিনিসই ক্রমশ কমে আসছে। কয়লা, পেট্রল, জল, জঙ্গল, খনিজ সম্পদ হু হু করে কমে আসছে। ভাবতে আতঙ্ক হয় এরপর কি হবে

আমি বাঙালী। আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা, যে হারে নিরীহ বাঙালীকে মারা হচ্ছে, এরপর মার খাবার মত, মরার মত বাঙালী পাওয়া যাবে তো? বাঙালী প্রজাতির পশু সংরক্ষণের জন্যে কোনও বিশ্বসংস্থা নেই। যতই মারো না কেন, কোনও প্রতিবাদ হবে না। বাঁচাবার জন্যে কেউ ছুটে আসবে না। বেওয়ারিশ মাল। কোনও কদর নেই।

বাঘের ডোরাকাটা সুন্দর চামড়া আছে, হালুম হুলুম আছে, অদ্ভুত একটা গ্রেস আছে। বাঘের সঙ্গে বাঙালীর তুলনা চলে না। কুমিরের সঙ্গে তুলনা করলে বাঙালী হেরে যাবে। কুমিরের কি সুন্দর গাত্রাবরণ। বুটিদার। কুমির মেরে সাফ

BanglaBook.org

করে দিচ্ছিল। এখন আইন হয়ে গেছে, কুমির মারলে আইনের বিধানে শাস্তি।

বাঙালী কাকাতুয়া নয়। দাঁড়ে বসে কপচায় না, কাঁচালঙ্কা খেতে খেতে রাধেকৃষ্ণ বলে না। বাঙালী ঝুমকো লোম স্পিৎস কুকুর নয়। কি স্ব-জাতির কাছে, কি বিজাতির কাছে বাঙালীর কোনও কদর নেই। এমন কি, নিজের পরিবারেও ঘৃণিত। কেউ সহ্য করতে পারে না। পরিবার উদয়াস্ত খিচোয়। সন্তান-সন্ততি বক দেখায়। ভাই দেয়াল তুলে পৃথক করে দেয়। প্রতিবেশীরা তেড়ে আসে। এমন কি পথে বাঙালী দেখে লেড়ি কুত্তারাও ঘেউ ঘেউ করে।

কিছু বাঙালী সেরেস্তায় কৃতদাসের মত উদয়াস্ত খেটে মরে। হয় মালিকের দাস, না হয় ইউনিয়ানের দাস। পদ লেহন না করলে অস্তিত্ব বিপন্ন। বৃহৎসংখ্যক বাঙালী বেকার। স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার ফলে দাস বাঙালীরা ঘৃণা করে বলে, ব্যাটা বেকার। কিছু বাঙালী ক্ষেতে-খামারে প্রকৃতই কিছু করেন—উৎপাদন, কিন্তু লাভের গুড় চালাক পিঁপড়ে খেয়ে যায়। মিছিলের সঙ্গে শহর কলকাতায় এলে দেখে বড় কষ্ট হয়। নানারকম বিদেশী ম্যাগাজিনে যেসব ছবি দেখি, আমেরিকার কৃষক, জাপানের শিল্পশ্রমিক, সুইডেনের মজুর, বালগেরিয়ার গৃহ-কর্মী। চোখ ট্যারা হয়ে যায়। যেমন সাজপোশাক তেমনি স্বাস্থ্য। আমাদের দেশের একটা ছবি তুলে, ওদের দেশের ছবির পাশে ফেললে লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। এদেশের নেতারা জমায়েতের সামনে যখন হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা করেন, তখন তো তিনি চোখ তুলে তাকান ? কি দেখেন ? এক একজন তো হাজার বার বিদেশ ঘুরে এসেছেন ! পোড়া কাঠের মত কৃষকবধূ কোলে শীর্ণ শিশু নিয়ে বসে আছেন। কৃষকের শঙ্কিত মুখে খরায় ফুটিফাটা মাঠের মত বলি রেখা। শয়ে শয়ে মানুষ সারা জীবন শুধু শুনেই গেল, সংগ্রামের জন্যে তৈরি হও। সংগ্রাম শেষ হলেই রামরাজত্ব এসে যাবে। কার সংগ্রাম, কিসের সংগ্রাম সেইটাই কেবল বোঝা গেল না। বাঙালীই এখন বাঙালীর টার্গেট। সকলেরই কেমন যেন সারমেয় স্বভাব। দুজনে দেখা হলেই গরগর করতে থাকে। বাসে, ট্রামে, বাজারে, কলতলায়, ভাড়াবাড়ির এক উঠানে, উদয়াস্ত বাঙালীতে বাঙালীতে সংগ্রাম চলছে চলবে। স্যুটেড-বুটেড বাঙালীরা আজকাল নিজেদের ব্যবস্থা করা লাক্সারি বাসে চেপে কাছারিতে যান। আরামপ্রদ, হওয়াই উচিত, কিন্তু মোটেই শান্তিপ্রদ নয়। পঞ্চাশজন যাত্রীর গোটা চারেক দল। বাসের ন্যাজে একটা, মাঝে একটা, ডগায় একটা। শুরু থেকে যাত্রার শেষ পর্যন্ত লাগাতার কোঁদোল। স্কুলবাসের শিশুরা এদের চেয়ে বুঝদার, শান্ত। ঘেউ ঘেউ করতে করতে শিক্ষিত বাঙালী মোটা মাইনের চাকরিতে চলেছে, চল্লিশ টাকা কিলোর মাছের ঝোল ভাত খেয়ে।

পারলে সকলেই আমরা সকলকে মেরে শেষ করে দি। প্রত্যেকেই মনে মনে

বলছি—মার শালাকে। বাঙালী খুব রেগে গেছে। লাখ লাখ ক্রোধী মানুষ ক্ষুদ্র এক ভূখণ্ডে গুঁতোগুঁতি করছে। চাল নেই, চুলো নেই, আলো নেই, বাতাস নেই, নিরাপত্তা নেই, শান্তি নেই। বন্ধ্যা ভাগ্যের কপাটে সবাই মাথা ঠুকছে, আর ছোট বড় আব নিয়ে ফিরে আসছে।

প্রকাশ্য দিনের আলোয় বাঙালী পিতা, রিকশা চেপে ফিরছেন, বাঙালী রাগী যুবক ডাণ্ডা, তরোয়াল ,পাইপ, ভোজালি নিয়ে অরণ্যে বাঘ মারার কায়দায় তাড়া করে চল্লিশ গজ ছুটিয়ে তাঁকে খতম করে রাস্তায় ফেলে রেখে যাচ্ছে। শ্রেণী-শত্রু খতম করার কি যে আনন্দ ! বাস যাচ্ছে, মিনি যাচ্ছে, দোকানপাঠ খোলা, শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে, বাঙালী বাঘ ঘায়েল হয়ে পড়ে আছে পথের পাশে।

প্রকাশ্য রাজপথে গলায় ফাঁস লাগিয়ে শিকারকে রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে থেতো করা হচ্ছে। এ সবই নিশ্চয় কোনও বড় কাজের প্রস্তুতি। এইভাবে দেশ নিশ্চয়ই একদিন সুজলা-সুফলা হবে। শিল্পর উৎপাদন বাড়বে। বন্ধ কলকারখানা খুলে যাবে। বাঙালী তার সব হৃত-গৌরব ফিরে পাবে। গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু। ভালো ডাক্তার, আইনজীবী, বিশাল ব্যবসায়ী। বাঙালীর প্রাচীন রমরমা আবার ফিরে আসবে। বাঙালী তখন সমবেত কণ্ঠে আবার গাইতে থাকবে—ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ।

মনে হয় এও এক ধরনের তন্ত্রসাধনা ! বাঙালী কত বড় সাধকের জাত ! কত মহাপুরুষের রক্তের ধারা বইছে জাতির রক্ত-প্রবাহে। ঘরে ঘরে মহাপুরুষের ছবি ঝোলে। মালা শুকিয়ে গেলেও, জন্মদিনে একবার অন্তত টাটকা মালা পড়ে। পার্কে, পথমোহনায় যেসব মূর্তি আছে, তাঁদের তেমন চেনা না গেলেও নিচে নাম

pathagar.net

লেখা আছে। সেই সব প্রতিকৃতির সর্বাঙ্গে কাকবিষ্ঠা থাকলেও, নেতারা নিয়ম করে বছরে একবার পুষ্প-স্তবক, গোড়ের মালা দিয়ে যান। কত ভালো বই আছে, বাঙালীর সংগ্রহে। কত উচ্চ চিন্তা, সু-উচ্চ আদর্শ বাঙালীর মগজে! বাঙালী যখন মুখ খোলে তখন মনে হয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এক সঙ্গে আধুনিক 'কারি-পাউডারে'র মত একই প্যাকেটে এসে ঢুকেছেন। কি তার ফ্লেভার।

কেবল একটাই আশঙ্কা। জবাই করতে করতে পাঁঠা শেষ, বলি হতে হতে বাঙালী শেষ। তান্ত্রিকরা তখন কি করবেন। নিজেরাই নিজেদের বলি দেবেন। না, শাস্ত্র যেমন বলেছেন, মধুর অভাবে গুড় দিয়ে কাজ সারা যায়। মানুষের অভাবে তখন কি কুমড়ো-বলি হবে।

বক-ধর্ম কথা

আমি এক মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির। সেদিন হঠাৎ বকরূপী ধর্মের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বক বললেন, 'তোমাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'প্রভু আমি মহাভারতের যুধিষ্ঠির নই। বউকে বাজি ধরে শকুনিমামার সঙ্গে পাশা খেলিনি।'

"তুমি ভারতের যুধিষ্ঠির। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের চেয়েও জীবন-যুদ্ধে তুমি অনেক স্থির। রাইট অ্যাণ্ড লেফ্‌ট মিথ্যে বলো ঠিকই, তবে প্রাণের দায়ে, তাতে তোমার মানব-ধর্মের হানি হয় না। সব সত্যই একালে অপ্রিয়। একদা আমিই বিধান দিয়েছিলুম—মা ব্রুয়াত সত্যমপ্রিয়ম। সেই বিধানেই কোনও সত্যই আর বলা চলে না। সত্য বলেছ কি মরেছ। পরিবার তোমাকে এক-ঘরে ক'রে দেবে। স্বপুত্র ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে বাইরে ফেলে দিয়ে আসবে দোহন শেষে। বাঁটের দুধ শুকোলেই তোমার শীর্ণ তরু মূলে সকালের চা-সিঞ্চন এলোমেলো হবে। তোমার কোলে-পিঠে চড়া কন্যা তোমার সমর্থন ছাড়াই কোনও এক লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে মোহব্বত করবে। তোমার প্রাণাধিক পুত্র তার প্রাণাধিকাকে নিয়ে ডিসকো ড্যানস্ চালু করবে। তুমি পড়ে থাকবে সংসার সমরাঙ্গনে কাটা সৈনিক হয়ে। বাতের ব্যথায় কুঁই কুঁই করবে। সকলে বলাবলি করবে—'আহা মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।' রাস্তায়-ঘাটে সত্য কথা বললে ডবল ডোজে জোলাপ ঠুসে দেবে। নিমেষে প্রাণ-বায়ু খাঁচা খালি করে সরে পড়বে। কর্মস্থলে সত্য ভাষণে কেরিয়ার চটকে যাবে। যেখানে শুরু সেইখানেই শেষ। তুমি যুধিষ্ঠিরের বাবা।"

'প্রভু বলুন তা হলে, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করি। জীবনে

শ'খানেক ইণ্টারভিউ দিয়ে একটি চাকরি পেয়েছি। বাঘের মত সব কর্মদাতা। প্রাণ-ঘাতী সব প্রশ্ন। আমি কি ডরাই প্রভু ভিখারি রাঘবে। কিন্তু প্রভু, মহাভারতের যুধিষ্ঠির আপনার সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে সরোবর থেকে জল-গ্রহণের অনুমতি পেয়েছিলেন। আমি কি পাবো ?'

'তুমি ? তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যে একটি এস মার্কা বাস পাবে। যার জন্যে তুমি এই আড়াই ঘণ্টা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো। তুমি প্রস্তুত ?'

'হ্যাঁ, প্রস্তুত।'

'তা হলে জবাব দাও, পৃথিবীতে কে প্রকৃত বোকা ?'

'প্রভু এক নম্বর বোকা হল সেই লোক যে ভাবে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ ভালো। সুদিন আসছে, এই কথা যে বিশ্বাস করে সে হল আহাম্মক নম্বর এক।'

'ফুলমার্ক। একশোর মধ্যে একশো দিয়ে দিলুম।'

'প্রভু, বোকা নম্বর দুই হল সে, যে পরিবারের কথা বিশ্বাস করে।'

'সাবাশ, সাবাশ।'

'প্রভু বোকা নম্বর তিন হল সেই ব্যক্তি, যে নেতাদের কথায় বিশ্বাস করে মাছের দাম কমেছে ভেবে ব্যাগ হাতে বাজারে ছোটে।'

'তোফা, তোফা।'

'বোকা নম্বর চার হল সেই জন যে নিজের জীবন নীতিবাক্যের আদর্শে গড়তে যায়, যেমন সদা সত্য কথা বলিবে, পরের উপকার করিবে, পরশ্রীকাতর হইবে না, জীবে দয়া করিবে।'

'ব্র্যাভো ব্র্যাভো।'

'পাঁচ নম্বর মূর্খ হল সেই ব্যক্তি যে যুগ যুগ জিও স্লোগানে বিশ্বাস করে গদিতে বসে পাবলিককে গান শোনায়, এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।'

'বহত খুব, বহত খুব।'

'সে-ই হ'ল বোকা যে ভাবে পুত্রের রোজগারে বার্ধক্যে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বাকি জীবনটা কাটাবে।'

'আচ্ছা এইবার বলো তো চালাক কে ?'

'প্রভু এক নম্বর চালাক হল সে যে ক্ষমতাশালী, প্রতিপত্তিশালী সমস্ত ব্যক্তিকে বলে, আপনি যা বলছেন সব ঠিক। এ যুগে চাটুকারের মত চালাক আর দ্বিতীয় কেউ নেই।'

'তারপর ?'

'দ্বিতীয় চালাক হল সে, যে সারা রাত ভোঁস, ভোঁস করে ঘুমিয়ে স্ত্রীকে বলে, সারারাত তোমার শরীরের চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।'

'তারপর ?'

pathagar.net

'প্রভু সেই চালক, যে কথায় কথায় বলে, আমি আছি, তোমার ভয় কি ? সেই চালাক, যে ডাক্তারকে দিয়ে প্রেসক্রিপশান করিয়ে বুক পকেটে রেখে দেয় ওষুধ কেনে না। যে কোনও সরকারী ইস্তাহারে বিশ্বাস করে না। যে নেতাদের কথায় মুচকি হাসে। যারা রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনের পাশে তোলা উনুনে কয়লা ঢেলে রান্না করে। যে কাঠের মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে না। সেই চালাক, যে কাউকে কোনও দিন প্রশ্ন করে না, কেমন আছ ? সে-ই চালাক যে অন্যের হাতে দুধের বোতল দেখে তবেই দুধ আনতে ছোটে। সে-ই চালাক যে বলে, আজকের দিনটা চালিয়ে দাও সব কাল হবে। চালাক সে, যে সব কথাতেই কেবল হুঁ হুঁ করে। আর সে-ই হল সব চেয়ে বড় চালাক, যে বলে, চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম হয় না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ যুধিষ্ঠির। এবার বলো সবচেয়ে জ্ঞানী কে ?'

'আজ্ঞে যে নিজেকে মনেপ্রাণে পাঁঠা ভাবতে পারে।'

'এনকোর, এনকোর। এবার বলো সুখী কে ?'

'আজ্ঞে, যারা সম্পূর্ণ পাগল। পাগল ছাড়া এ জগতে কেউ সুখী নয়।'

'বৎস, আমি সন্তুষ্ট। ওই তোমার এস আসছে। যাও, গুঁতিয়ে উঠে পড়ো।'

এক ঠ্যাঙে ধর্ম বকের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হয় ধর্মও এস বাস ধরতে চান। আমি ঝুলতে ঝুলতে, লাট খেতে খেতে কোনরকমে বাসের জঠরে প্রবেশের চেষ্টা করতে লাগলুম। আর হল্‌হলে দরজাটা আমার পশ্চাদ্দেশে চাপ্‌পড় মারতে লাগল। মনে হল আমি যেন রেসের ঘোড়া।

বুলেটিন

আবার ধেড়িয়েছে স্যার ?

এবার কি গেল ?

আবার সেই জল। পাইপ মাইপ ফেটে, জলের বারোটা বেজে গেছে। কল যেন ছুনু করছে। এইভাবে চললে স্যার ইলেকসানেও বারোটা বেজে যাবে। মানুষ আর কত সহ্য করবে। আলো নেই। শহরটা হয়ে গেছে চাঁদের পিঠের মত। সেদিন ঘূর্ণি ঝড়ে সাফোকেসানে কজন পটল তুলেছে কে জানে! পাতালের গর্ভ থেকে স্তম্ভের মত ধুলো উড়ে, কি সিন, যেন টেক্‌সাস ছবি। মিষ্টির দোকানে রসগোল্লার রঙ পালটে গেল। প্লেটে একজোড়া ফেললে মনে হচ্ছে, ব্লাডপ্রেসারের রুগীর ছানাবড়া চোখ। ফিসফিস করে বলছে, হাত বাড়ালেই মেরে লাশ ফেলে দেব।

বাজে বোকো না, বাজে বোকো না। ধুলো মানে কি ? শুকনো মাটি। মনে নেই কবি বলছেন, যে মানুষ আছে মাটির কাছাকাছি, তারি লাগি। তারি লাগি কী ? বলো না ?

কী স্যার ?

তোমার মাথা। মানুষমাটির কাছে যাচ্ছে না বলেই, মাটিকে আমরা মানুষের কাছে আনতে চাই। সেই গানটা মনে আছে,মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্ত পদধূলি, স্কন্ধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি। তারপর কী ?

কী স্যার ? আমি একটা গানই জানি, মুক্তির মন্দির সোপান তলে, ধাম্পু, ধাম্পু।

ধাম্পু, ধাম্পুটা কি জিনিস ?

ওটা মিউজিক স্যার। এখন ডিসকোর যুগ চলেছে। ডিসকো প্যান্ট, ডিসকো জামা, ডিসকো লাইট, ডিসকো নাইট, ডিসকো পলিটিক্স।

ডিসকো পলিটিক্সটা কী ?

এই যা হচ্ছে স্যার। জ্বলছে, নিবছে, জ্বলছে নিবছে। খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে, খুলছে। যাকে বলে চকাচম।

কোথা থেকে এই সব ভাষা শিখছো ?

রক থেকে।

হ্যাঁ, কি বলছিলে ? জল নেই ? নেই তো কি হয়েছে ? সারা জীবন সব কিছু থাকতে হবে ? মামার বাড়ি না কি ? ঠিক মত জনসংযোগের কাজ হলে মানুষ কখনই বিগড়োবে না, বিগড়োতে পারে না। নাও, একটা স্টেটমেন্ট ছাড়ো, লেখো, জলের অপকারিতা।

হ্যাডিং স্যার ?

হ্যাডিং নয়, হেডিং, জলের অপকারিতা। বাঙালীর সর্দিকাশির ধাত। আমার মা-বোনেরা টনসিলে বড় ভোগেন। টনসিলের কাশি শুকনো কাশি, রসকসহীন, খ্যানখেনে। মেয়েরা কাশলে ছেলেরা বড় অসন্তুষ্ট হয়। বিছানায় শুয়ে নববধূ যদি খ্যাঁক খ্যাঁক করে খ্যাঁক শেয়ালের মত কাশতে থাকে, তাহলে স্বামী বেচারার কি অবস্থা হয় ! প্রেমে সব সহ্য হয়, কাশি সহ্য হয় না। মাথায় খুন চেপে যায়। পাশের ঘরে শয্যাশায়ী বৃদ্ধ শ্বশুর, শাশুড়ীর বিরাগভাজন হতে হয়। ননদরা বিরক্ত হয়। বিরক্ত হলে কি হয়। দুপুরবেলা স্বামীর অবর্তমানে ধোলাইয়ের ব্যবস্থা হয়। বাঙালী শিক্ষিত,শান্তিপ্রিয়, প্রেমিক জাত হলেও রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান না থাকলে কি হয় ? অজ্ঞান শিশুর মত আঁচড়ায় কামড়ায়। আঁচড়ালে কামড়ালে মায়েরও জ্ঞান থাকে না, শিশুকে দু এক ঘা লাগায়। শ্বশুর, শাশুড়ী আর ননদে ধোলালে বধূমাতাও প্রতিরোধের চেষ্টা করে। প্রতিরোধে

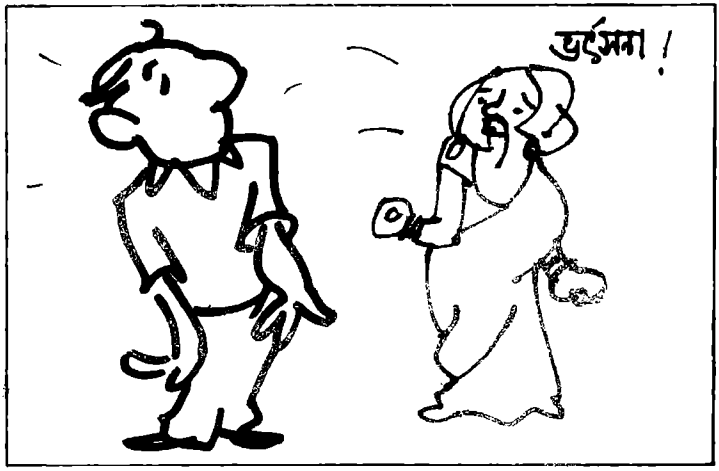

প্রতিরোধ বাড়ে। বাঙালীর সংসার শান্তির সংসার। ধূপ, ধুনো, গঙ্গাজল, জপের মালা, সত্যনারায়ণ, কথামৃত, মন্দির গমন, তা হলেও, পরের মেয়ে এসে বোলচাল মারলে প্রেসটিজে লাগে। শ্বশুরও তো বাপ, শাশুড়ীও তো মা, বাপকে বাপরে বাপ বললে কোন্ ভদ্রসন্তান সহ্য করবে ! প্রেমে ভেড়া জন্মায় না। প্রেমে মানুষের আত্ম-দর্শন হয়। শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাতেন, শয়ে শয়ে গোপিনীর সঙ্গে প্রেম করতেন, কিন্তু গরু ছিলেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সুদর্শন চালিয়ে কচাকচ কৌরব মেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু কি তেজ ? ডিস্‌কো দিওয়ানা হয়ে নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরতেন না। তিনি সেই প্রেম বিতরণ করতেন যে প্রেমে মানুষ জগৎ ভোলে। যে প্রেমের উদয় হলে, মানুষের আলো আঁধারের জ্ঞান থাকে না, ব্যাণ্ডেলে কি হল, সাঁওতালডিতে কি হল, টিটাগড়ে কি হল বলে বাজে মাথা ঘামায় না। পলিটিক্যাল জগাইমাধাইরা হ্যাণ্ডবল ছুঁড়লে, সমালোচনা করে না। বরং বলে, মেরেছে কলসির কানা তা বলে কি ভোট দোবোনা। তা সেই প্রেমিক স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী খামচানো বউকে কি করবে ? পুজো করবে ? আজ্ঞে না। বাঙালী ভোটের ব্যাপারে, নেতাদের ব্যাপারে উদার হলেও, কেশো কোনো বউয়ের ব্যাপারে উদার হতে পারে না। রাষ্ট্রভাষায় বলে, জরু আর গরু, তার মানে দুটোকেই পেটানো যায়। টু আর ইজ হিউমান, টু ফরগিভ ডিভাইন। সেটা আমাদের বেলায়। তার মানে উদ্ধত বউয়ের বেলায় নয় পেটাইয়ের দলে স্বামীও নাম লেখাতে পারে এবং কম্বল ধোলাইয়ের ব্যবস্থা

করতে পারে। শুধু তাই নয় আরো ক্ষেপে গেলে আগুনে সেঁকতেও পারে। পরে 'সরি' বলে বলেই আবার ভদ্রসমাজে স্থান পায়। এক টনসিল থেকে এত কাণ্ড ! টনসিল হয় বাথরুমে ঢুকে স্ত্রী হস্তীর মত জল নিয়ে মাতামাতি করলে। রাজস্থানে জলাভাব। ফলে মেয়েদের টনসিল নেই। ফলে কাশি নেই। ফলে দাম্পত্যজীবন সুখের। ফলে স্ত্রী হত্যার নজির কম। ডিভোর্স কেসও নেই। জলাভাব শাপে বর। জলে বাত, জলে হাজা, জলে শ্যাওলা। স্লিপ, দুম, ফ্র্যাকচার। জল পানীয়। আরে বোকা, বিয়ারও তো পানীয়। বিয়ার খাও ভুঁড়ি বাড়াও।

বুলেটিন দুই

আবার জল। ও অন্ধকার ফন্দকার কিছু যায় আসে না। মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। জলাভ্যাস এক বদ অভ্যাস। পি এ ?

বলুন স্যার ?

দারজিলিং-এ কি কেলোর কীর্তি হয়েছে দেখেছ তো কাগজে। নো ওয়াটার। সব শুকিয়ে গেছে। অ্যান্টিওয়াটার ক্যাম্পেন,অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ক্যাম্পেনের মত জোরদার করতে হবে। নাও লেখো-স্লোগান নম্বর এক—বোম নয় জল নয়। জলও নয় বোমও নয়। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি !

জলে জনডিস হয়। পরিশ্রুত জল একটা বড় রকমের ধাপ্পা। বন্ধুগণ ধাক্কা খেও না। মানুষের মত যেমন পরিষ্কার করা যায় না, জলও তেমনি পরিষ্কার করা যায় না। জল হল সেকসের প্রতীক। কামে যেমন সব শুদ্ধ ভাব দ্রব হয়ে যায়, জলেও তাই। লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য ব্যাকটিরিয়া হিলিহিলি, কিলিকিলি, বিলিবিলি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পি এ ?

বলুন স্যার ?

একটা করে মাইক্রসকোপ ফ্রি সকলকে দিয়ে দিলে কেমন হয় ? এক ফোটা করে জল তলায় ধরবে আর ভয়ে আঁতকে আঁতকে উঠবে।

রাজকোষে অত অর্থ নেই মালিক। ভাঁড়ে মা ভবানী তাহাতে আপনি। তাছাড়া শরৎচন্দ্র বলে গেছেন, তৃষ্ণার সময় এক অঞ্জলি ভালো জল না পেলে, মানুষ নর্দমার জল তুলে পান করে।

সেটা জল নয় গবেট সেক্স, সেক্স। উপমা বোঝ না। পলিটিক্স করে করে গাধা হয়ে গেছ !

boiRboi.net

এই তো বললেন, জল হল সেক্স, সেক্স হল জল।

আরে বোকা, আমি বলব কেন? পলিটিস্যানদের কথা আজকাল কেউ বিশ্বাস করে না। ধাপ্পা মেরে মেরে এমন ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে! কহতব্য নয়। ও কথা আমার নয় মনস্তত্ত্ববিদের। জলেরস্বপ্ন মানেই ক-এ আকার ম। যাক বাজে কথা থাক। জনসাধারণকে এতকাল হাইকোর্ট দেখিয়েছি এইবার একটু ট্রেনিং দেওয়া দরকার। লেখো, জলের ব্যবহার বিধি।

কম জলে স্নান পদ্ধতি এই পদ্ধতি আমাকে শিখিয়েছেন একজন ন্যাভাল অফিসার। সাবান না-মাখাই ভালো। কারণ সাবানের ফেনা ধুতে বেশি জল লাগে। বাঙালীর আর সে ত্বক নেই। পেটে ঘি, তেল, দুধ ছানা না ঢুকলে তেলা চেহারা হবে কি করে! সাবানে গায়ে খড়ি ফোটে। তবু যদি মাখতে হয়, বাড়তি জলের দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না। তবে নৌবাহিনীর অফিসারের পদ্ধতিতে স্নান করা যেতে পারে।

প্রয়োজন ছোট এক বালতি জল। একটি মাঝারি মাপের প্ল্যাস্টিকের মগ। একটি ডিশওয়াশিং ক্লথ বা পুঁচকে তোয়ালে। যে কোনও সাবান একখণ্ড। একটি বড় মাপের গামলা।

পদ্ধতি : গামলায় থেবড়ে বসুন। সাবধান গামলা যেন পেছনে আটকে না যায়। কেনার সময় এক সাইজ বড় কেনাই ভালো। সবধানের মার নেই। মারের সাবধান নেই। এক মগ জল মাথার ব্রহ্মতালুতে ঢালুন। টাক থাকলে, কেয়া বাত! না থাকলে বড় চুল কদম ছাঁটা করুন। বড় চুল বেশি জল টানে। মায়েরা সব 'মোক্ষদাপিসী' কাটে চুল ছাঁটুন। যস্মিন দেশে যদাচার। এইবার 'ডিশওয়াশিং ক্লথ' জলে ভিজয়ে, তাইতে সাবান মাখান। গায়ে নয়। অতঃপর সেই সাবানচর্চিত কাপড়ের টুকরোটি গায়ে ঘষুন। ঘর্ষনান্তে, গায়ে কয়েক মগ জল ঢেলে, গামলা থেকে উঠে পড়ুন। গামলার সঞ্চিত জল বালতিতে ফিরিয়ে দিন, পরবর্তী ব্যবহারের জন্যে। এই পদ্ধতির নাম, স্বল্প জলে পৌনপুনিক স্নান। স্নান না করা স্বাস্থ্যের পক্ষে আরও ভালো। ঘামের সঙ্গে এক রকম ইয়ে বেরোয়। কি বেরোয় পি এ?

নুন স্যার।

তোমার মাথা, আর একটা কি বেরোয় যেন। আমি একটা ফরেন ম্যাগাজিনে পড়েছিলুম। যাকগে মরুক গে! যার ঘাম, সেই মাথা ঘামাক। নাও লেখো। ঘামের সেই ইয়ে ত্বকের ওপর একটা ব্যাপার করে, একটা আবরণ তৈরি করে, যাকে বলে প্রোটেকসান, আর একটু আকর্ষণীয় গন্ধ হয়, যাক বলে গন্ধ গোকুল। ফুলের গন্ধ আছে, গন্ধ আছে মাটির, বনস্পতির, আলোচালের, বাঘের, বনতুলসীর। মানুষের কেন থাকবে না। ফ্রেভর-অলা চায়ের কি কদর! মানুষ

pathagar.net

বোঝে চরিত্রের ফ্লেভার। চরিত্র এক অদৃশ্য বস্তু, সাপের পাঁচপা, ডুমুরের ফুলের মত, স্বাতী নক্ষত্রের জলের মত। আমরা বুঝি দেহ, আমরা দেখি দেহ। সেই দেহ গন্ধময় রূপময় হোক।

বাসন ধোয়ার পদ্ধতি ছোট পরিবার হলে একটি। বড় পরিবার হলে দুটি কুকুর পুষুন। তাদের আধপেটা খেতে দিন। এঁটো বাসন পড়লে চেন খুলে ছেড়ে দিন। দেখুন কেমন চেটেচুটে পরিষ্কার করে দেয়। একবার এসে বাসনগুলো কেবল উলটে দিয়ে যান। কুকুরের হাত নেই। সাংঘাতিক জিভ আছে। স্টিলউলের বাবা। লালায় আছে ডিটারজেন্ট। এই পদ্ধতিতে গেরস্থের কাজের লোকের খরচ বাঁচবে। সেই পয়সায় শাড়ি কেনা যাবে। সারা মাস ফুচকা খাওয়া যাবে।খেচাখেচি কমবে। বাসনে টোল পড়বে না, আঁচড় পড়বে না। ঘেন্না ? ঘেন্নার কি আছে ! কুকুরকে চুমু খাওয়া যায়, তাকে বাসন চাটতে দেওয়া যায় না !

পানীয় সকালে প্রকৃতি ঠাণ্ডা থাকে। সেই সময় খামোকা জল খাবার মানে হয় না। অনেকে ঊষাপান করেন। আমাদের জীবনে ঊষা আবার কি। কোনও ভদ্রলোকের সাতটার আগে বিছানা থেকে ওঠা উচিত নয়। বেলার দিকে খুব তেষ্টা পেলে এক গেলাস খাওয়া যেতে পারে। তবে সাবধান জলবিয়োগ করা চলবে না। চেপে বসে থাকো কুম্ভক করে। নো লস, টোটাল গেন।

স্যার ইউরেমিয়া হয়ে যাবে।

মরুকগে, যার হবে তার হবে, তোমার আমার কি।

বুলেটিন তিন

আমাদের সমস্ত সমস্যার একটা লিস্টি তৈরি করেছ ?

করেছি স্যার।

অনুগ্রহ করে পড়ে ফেল।

এক, আলো। দুই, জল। তিন, যানবাহন। চার, পথঘাট। পাঁচ, পথ দুর্ঘটনা। ছয়, ল অ্যাণ্ড অর্ডার। সাত, প্রশাসনিক শৈথিল্য। আট, ইনটেলিজেনস গ্যাপ। নয়, দলগত সংঘর্ষ। দশ, উলটপালটা স্টেটমেন্ট।

ব্যাস, ব্যাস। আর না, আর না। সমস্যার সিকস্‌টি ফোর কোর্স লাঞ্চ বানিয়ে ছেড়েছ। অত খাবে কে ! আলো নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। ওটি ঈশ্বরের দান। তিনি বলেছিলেন, লেট দেয়ার বি লাইট অ্যাণ্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট। এখন তিনিই আবার বলছেন, লেট দেয়ার বি ডার্কনেস অ্যাণ্ড দেয়ার ইজ

pathagar.net

ডার্কনেস। ঈশ্বরের এলাকায় আমি অনধিকার প্রবেশ করতে চাই না। জলের ব্যাপারে আমি সব জলবৎ তরলং করে দিয়েছি। আমি এখন পথ আর যানবাহন সমস্যাকে একটু প্রাঞ্জল করতে চাই। নাও লেখো

বাঙালী এতকাল সমতল ভূমিতে হেঁটে হেঁটে, বেতো ঘোড়া, আরও ভালো ধোপার গাধার স্বভাবপ্রাপ্ত হয়েছে। বাঙালী নিতান্তই ভারবাহী জীব। সংসারের জোয়াল কাঁধে টুকুস টুকুস করে হাঁটছে তো হাঁটছেই। মাঝে মাঝে গাধার মত ঘাড় গোঁজ করে থমকে দাঁড়ায়। পেছন থেকে ঠ্যালা মারলেই আবার চলতে শুরু করে। বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি।বাড়ি থেকে দুধের ডিপো, ডিপো থেকে বাজার, বাজার থেকে বাড়ি। বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি। পায়ে পায়ে চটি টেনে টেনে যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে। বৈচিত্র্যহীন জীবন। সমতলের প্রাণীদের চরিত্র ওই জন্যে এলিয়ে যায়।

আমরা পাহাড় পাবো কোথায় ! কোথায় পাবো চড়াই, উতরাই আর খাদ। এতকাল আমাদের সব পরিকল্পনাই ছিল, সমতল, ফ্ল্যাট, চরিত্রহীন। হয় কৃষি, না হয় পশুপালন, না হয় শিল্প। অনেক চেষ্টায় আমরা সমতলকে অসমতল করেছি। দুটো পা কখনই যাতে এক লেভেলে না থাকে সে ব্যবস্থা আমরা করেছি। এখন কুঁচকি আউরেছে বলে নাকে কাঁদলে হবে না। ভগবান যা করেন সব মঙ্গলের জন্যে। চলতে, চলতে কিম্বা গাড়িতে যেতে যেতে এই ওঠো, এই পড়ো। কেন, বাঙালী, গান শোনোনি, ওঠা পড়া প্রেমের তুফান। যত উঠবে, যত পড়বে তত প্রেম বাড়বে। নিশ্ছিদ্র বাসে, ট্রামে, মিনিতে, ট্রেনে বাঙালী নর নারীর ঠাস বুনোন। ট্রাম আর ট্রেন লাইনে চলে তাই তেমন ঢেউ খেলে না। বড় আফশোস। ঠেসে দিলে, ঠাসাঠাসি ছাড়া আর বিশেষ কোনও অনুভূতি হয় না। ঠুস ঠাস চলতে পারে, কিন্তু সেই গানটি আর আসে না, প্রেম যমুনায় হয়তো বা কেউ, ঢেউ দিল ঢেউ দিল রে ! আকুল হিয়ার দুকূল বুঝি ভাঙলো রে ! বাসে আর মিনিতে বাঙালীর অনেক সুযোগ। কখনও মনে হচ্ছে, চাঁদের আলোয় সহস্র গোপিনীসহ নৌকাবিহারে চলেছি। কখনও মনে হচ্ছে ওয়েলার ঘোড়া চেপে যুদ্ধে চলেছি। প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে এ ওর ঘাড়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। বাঙালী রে ! এত প্রেম তোর কোথায় ছিল রে ! ও রে ভাই ! মুখে একবার হরি নাম বল। কীর্তনের সুরে না পারিস ভাই, ডিসকো সুরেই বল। সেই পাঁচশো বছর আগে একবার নদে ভেসে গিয়েছিল যে নামে, যাঁর নামে তাঁকে একবার স্মরণ কর। প্রেম দাতা নিতাই বলে, গৌর হরি, হরি বোল। সে যে গান গেয়ে গেয়ে পড়ে ঢলে ঢলে। আহা কী দৃশ্য ! চোখ জুড়িয়ে যায়। চার চাকার প্রেমরঙ্গ। জাগো বাঙালী। প্রেমে জাগো। খুনসুটিতে জাগো, ল্যাঙ মারায় জাগো, কনুই মারায় জাগো। ব্রিফ কেসের খোঁচা মারায় জাগো। ঘুমায়ে থেকো না আর।

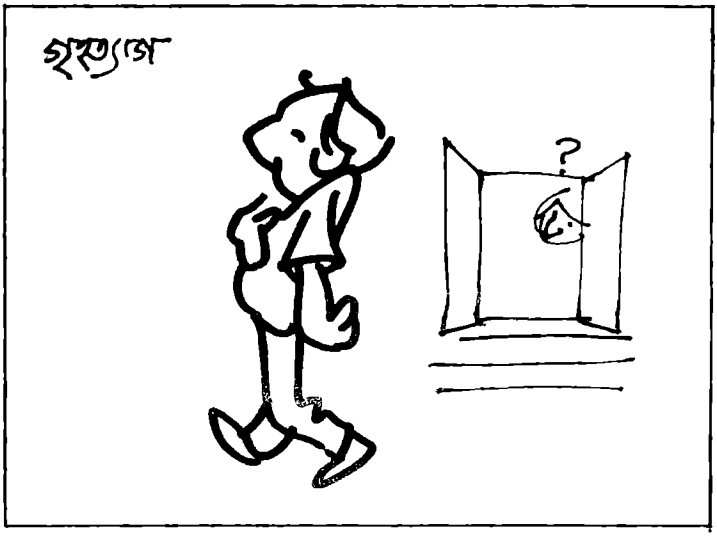

সমতলবাসী নিরীহ বাঙালীর চরিত্র বড় এলিয়ে ছিল। কোনও বীরত্ব ছিল না।পরচর্চা পরশ্রীকাতরতা, মামলা, তেল মালিশ আর বুট পালিশ করে বাঙালী দুশো বছর কাটিয়েছে। কবি দুঃখ করেছেন, রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করনি। কবি ! একবার এসে দেখে যান, বাঙালীকে আমরা মানুষ করেছি। পাহাড়ী জাত তৈরি হয়েছে। চোখ মুখ কটমট। দাঁত কিড়িমিড়ি। কোলের শিশুটি পর্যন্ত বলতে শুরু করেছে, মেরে লাশ ফেলে দেবো। ঘুনশিতে পাঁউরুটি কাটা ছুরি বেঁধে ঘুরছে। বলছে, প্র্যাকটিস করছি। এই তো চাই। এরই নাম হাইল্যাণ্ডার। মন শক্ত হচ্ছে, চামড়া কর্কশ হচ্ছে। বাপ বললে শালা বলছে। কথায় কথায় কোতল করছে। আগে ছিল, স্যাকরার ঠুকঠাক, এখন হয়েছে কামারের এক ঘা। চাপে থাকলে বাড়ার ইচ্ছে হয়, মাথা হেঁট করে থাকলে মাথা তোলার ইচ্ছে হয়। বাসে কি মনে হয় বাঙালী। মিনিতে ঘাড় হেঁট অবস্থায় কি মনে হয় বাঙালী ! গাছের ফলটিকে ন্যাকড়া বেঁধে রাখলে আয়তনে বাড়ে। বঙ্গবৃক্ষের বাঙালী ফলসমূহকে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছি, এবার তোমরা বড় হও। দেহে নয়, মেদে নয়, মনে।

ভাই সব, ইওরোপ, আমেরিকার কথা তুলো না। স্বাধীনতার এত বছর হল, অত বছর হল, ও সব অঙ্ক নাই বা করলে। শুধু শুধু নিজেদের উত্তেজিত করা।

উত্তেজনা মোটেই ভালো জিনিস নয়রে বাপ ! শরীর খারাপ হয় মানিক। ভোগ যে কত বড় দুর্ভোগ আমরা জানি। হার্ট ঝুলে পড়ে, রক্ত জমাট বেঁধে যায়, চিনি বাড়ে, চোখে চালসে ধরে। মালাই এক ধরনের খাপে মালাইঅলার হাঁড়িতে নুন মেশান বরফে কেমন ঠাস থাকে দেখেছ ! কি তার বাঁধুনি। খোল থেকে বেরলো, তো আতুরি সোনার মত গলে গেল। আমাদের প্রশাসনিক উদাসীনতা হল সেই নুন মেশান শীতল বরফ, তোমরা হলে ঠুঙির মালাই। ভাই সকল টাইট থাকো, টাইট। গলে যেও না। তোমরা আমাদের বড় আদরের ভাই। প্রেমে থাকো, প্রেম। প্রেম একটা ফ্রেম অফ মাইণ্ড। বলো, একবার বলে ফেল, সেই সুপ্রাচীন উক্তি, মেরেছ কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেবো না।

বুলেটিন চার

আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম ভোটদাতাগণ ! আপনারা সংখ্যায় কমে গেলে বড় দুঃখ পাব। যেমন করেই হোক, বালবাচ্চা নিয়ে আপনারা জীবিত থাকুন। আপনাদেরও প্রয়োজন আছে। গরুর জন্যে যেমন বিচিলি, গুরুর জন্যে যেমন শিষ্য, ডাক্তারের জন্যে যেমন রোগী, আকাশের জন্যে যেমন নক্ষত্র, ছাগলের জন্যে যেমন বটপাতা, শিশুর জন্যে যেমন মাতৃ দুগ্ধ, ঠিক সেই রকম নির্বাচনের জন্যে আপনারা। প্রতি পাঁচবছর অন্তর আপনাদের সংখ্যা হিসেবে আসে। একটি তালিকায় দেখবেন জ্বল জ্বল করছে, আপনাদের নাম, পিতার নাম, স্ত্রীর নাম, স্বামীর নাম। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখতে পাওয়া কত বড় সৌভাগ্য, কি ভীষণ উত্তেজনা ! লেখকরা জানেন। প্রথম লেখাটি প্রকাশের জন্যে তাঁরা যা করেন, ইংরেজী থেকে বাঙলা করলে দাঁড়ায়, কোনও পাথরই ওলটাতে বাকি রাখে না। ছাপার অক্ষরে নাম দেখার জন্যে কত লোক আত্মহত্যা করে। কাগজে পড়েননি, বিনয়কুমার একস, ওয়াই, জেড, বয়েস সাতাশ, পাখার ব্লেড থেকে ঝুলছে। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত। লেখা হয় অজ্ঞাত। মোটেই অজ্ঞাত নয়, ভেতরের কারণ, ছাপার অক্ষরে নাম দেখার ইচ্ছা। সেদিন একটি কাগজ বেশি বিক্রি হয়। কে কিনেছে ধরা যায় না, কারণ তিনি অদৃশ্য। কার্য আছে কারণ নেই।

শুনেছি, আপনাদের ভীষণ কষ্ট। নানা রকম সামাজিক ব্যাধিতে ভুগছেন। আমার বুক ফেটে যায়। বিশ্বাস করুন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও আমরা মানুষ। আমাদের হাত আছে, পা আছে, চোখ, নাক, মুখ, কান সবই আছে, ঠিক আপনাদেরই মতো। কেটে গেলে রক্ত বেরোয়। বদহজম হলে পেট ব্যথা করে,

pathagar.net

ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি হয়। খিদে পেলে খাবার ইচ্ছে হয়। কানের কাছে বোমা ফাটলে বুক ধড়ফড় করে। প্রিয়জনের মৃত্যু হলে দুঃখ হয়। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গও বোধ করি। বিবেকের গানগুনি নিদ্রাহীন মধ্য রাতে—মনে করো, শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর ! শুনি কিন্তু কিছু করতে পারি না ; কারণ কিছু করা বড় শক্ত। গড়গড়ায় তামাক খাওয়া চলে, গড়গড়া নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া চলে না। চটি পরে প্যাটপ্যাট করে অফিসে যাওয়া চলে, কুচকাওয়াজ করতে হলে বুট চাই। আপনারা আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমরা হলাম আপনাদের প্রত্যাশার ছায়া। আমাদের কায়া নেই। অনেকটা ভূতের মত।

যাক যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কাজের কথায় আসা যাক। কিছু টোটকা শিখিয়ে দি। মুষ্টিযোগও বলতে পারেন। এর নাম, সর্প হয়ে দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড়ো। সেই অলমাইটির খেলার মত। সন্ধের ঘূর্ণিঝড়ে সব উড়ে গেল, সকালে হেসে উঠল সোনালী রোদ। মারবো, আবার বাঁচার কৌশলও শেখাব।

ঘাড় বাঁচাও। বাঙালীর ঘাড়ের ওপর সকলের বড় বেশি নজর। প্রথম নজর নরসুন্দরের। অন্যমনস্ক হলেই ক্লিপ চালিয়ে, ক্ষুর বুলিয়ে শাঁস বের করে দেবে। ঘাড় চাঁচায় বড় আনন্দ। ইদানীং বিটলে চুল রাখার রেওয়াজ এসে বাঙালীর ঘাড় বাঁচিয়েছে। একেই বখাটে, তার ওপর বকমার্কা গলা। সে যা ছিরি হত ! এখন আর সে দৃশ্য দেখতে হয় না। পেছন থেকে দেখে বোঝা দায়, 'ম্যাড' না 'ম্যাডাম'। ঘাড় ঢেকেও কি ঘাড় বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ! হয়নি। ঘাড় ধাক্কা, ঘাড়ে রদ্দা সমানে চলেছে।

রদ্দা : রদ্দা কাকে বলে ? কুস্তিগীরের ভাষা। পুরোবাহু দিয়ে গদাম করে মারা। হাতেও মারা যায়, ভাতেও মারা যায়। অর্থনীতির সর্বক্ষেত্র থেকে মার খেয়ে ফিরে আসা, খেলার জগৎ থেকে ন্যাজে.গোবরে হয়ে ফিরে আসা, এক ধরনের রদ্দা। আর এক ধরনের রদ্দা একেবারে জাতীয় জিনিস। বাঙালী পরস্পর, পরস্পরকে মেরে চলেছে, বাসে, ট্রামে, ট্রেনে। ঘাড় তুলতে গেলেই কনুইয়ের চাপ। পেছনের জন সামনের জনকে মাথা সোজা করতে দেবেন না। একে বলে দমিয়ে রাখা। যার অন্য নাম ন্যাজ টেনে ধরা। ইতিহাস বলছে, এই এক জাত, যারা পরস্পর পরস্পরের ন্যজ টেনে ধরে টাগ-অফ-ওয়ার খেলছে। দড়ি বাঁধা ছাগল যেমন উলটো দিকে হিড়হিড় করে ছোটে। এক হাত এগোয় তো তিন হাত পেছোয়। বাঙালীর অগ্রগতিও অনেকটা সেই রকম। সকলেই ভাবছেন, এগোবি কি টেনে ধরে আছি। সোজা হবি কি দুমড়ে রেখেছি। ওই ধরনের রদ্দার টোটকা আমি বাতলাতে পারব না। স্বভাব শুনেছি চিতায় উঠলে তবেই পালটায়। তবে বাসে ট্রামে যা চলছে, সেও কম অস্বস্তিকর নয়। এর হাত থেকে

বাঁচার জন্যে একটি কবচের কথা বলি।

কবচ যুদ্ধে যাবার সময় বীরেরা মহাভারতের কালে, কবচকুণ্ডল ধারণ করতেন। জীবিকা-যুদ্ধে যাবার সময় আপনারাও ঘাড়ে এক ধরনের কলার ব্যাণ্ড পরতে পারেন। যে কোনও হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে বেশ মোটাদানার স্যাণ্ড পেপার সংগ্রহ করতে হবে। চাইলেই পাওয়া যাবে, দাম বেশি নয়। গলার বেড় অনুসারে এক টুকরো ভেলভেটে, আধুনিক আঠা দিয়ে মসৃণ দিকটি সেঁটে দিতে হবে। খড়খড়ে দিকটি থাকবে ওপরে। ভেলভেট লাইলিং লাগান এই কণ্ঠলেঙ্গুটিটি গলায় ধারণ করে বাসে, ট্রামে, ট্রেনে উঠলে ঘাড় মনে হয় বাঁচবে। কেন বাঁচবে, যার কনুই, কি পুরোবাহু লাগবে এক পর্দা ছালচামড়া উঠে যাবে। দাদা হাত সরান, দাদা হাত সরান বলে সারাটা পথ আর চুলোচুলি করতে হবে না। সায়েবরা যদি নেকটাই পরতে পারেন, স্পণ্ডিলাইটিসের রুগী যদি গলবন্ধনী পরতে পারেন, সাধারণ মানুষ ঘাড়ের স্বার্থে বালি কাগজের বকলশ পরতে পারবেন না! এই বকলশ পরিধান করলে বাঙালীকে আর ঘাড় হেঁট করতে হচ্ছে না। নিচু করলেই চিবুক ঘষে ছালচামড়া উঠে যাবে। খরচ অতি সামান্য? ফলাফল অসামান্য।

হাঁটু মিনির আসনে বসলে, হাঁটু বাঁচানো দায়। ধারের আসনে বসলে ব্রিফকেসের খোঁচায় মালাইচাকি ঘুরে যাবার সম্ভাবনা। হাঁটুতে মাপ মত দুটি স্টেনলেসস্টিলের বাটি ফিট করে নিন। অফিসে গিয়ে হাঁটু থেকে খুলে একশোগ্রাম চিঁড়ে ভিজিয়ে দিন। টিফিনের সময় দই দিয়ে মেরে দিন।

পায়ের আঙুল পায়ের আঙুলে লোহার ঠুলি পরুন। ফুটবোর্ডে দাঁড়ালে পায়ের ওপর লোক চাপবেই। চলমান বাসের পাদানীতে হুলোর ঝগড়া বড় অসম্মানজনক। ছিঃ বাঙালী ছিঃ। বয়েস হচ্ছে না!

বুলেটিন পাঁচ

অনেক কিছু শেখার আছে। সে যুগ আর নেই বাঙালীবাবু। তেল চুকচুকে শরীর। সামনে টেরি। দিশি ধুতির কোঁচাটি লুটোচ্ছে পদপ্রান্তে। মুখে একটি ছাঁচি পান। হাতে চুন লাগানো পানের বোঁটা। মাঝে মাঝে বকনা গরুর মত গুরু ভোজনের উদ্‌গার। দুর্গা দুর্গা বলে, গায়ে ফুরফুরে বাতাস মেখে সেরেস্তায় গমন। পুনঃ প্রত্যাবর্তন। দুগ্ধধবল পাথরের গেলাসে সরবৎ সেবন। সন্ধ্যায় বেলফুলের সুবাস সহ ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে বসে, গোলাপ জাম, ভিজে মুগ, আদার কুঁচিসহ, খরমুজা নতুন আখের গুড় সহ ভক্ষণ। বাবু বাঙালী, যুগটি

BanglaBook.net

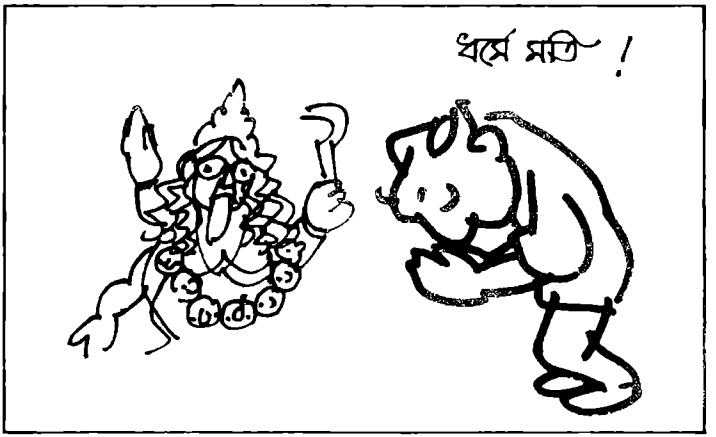

পালটে গেছে মানিক। নিজেকে তৈরি করো।

শিক্ষা মানে এ· বি· ডি নয়। আই অ্যাম আপ, আমি হই উপরে, ইউ গো ইন, তুমি যাও ভিতরে নয়। শিক্ষা হল বেঁচে থাকার কৌশল শিক্ষা। পরাধীন যুগে স্বদেশীরা. লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, বোমবাঁধা, চাঁদমারী ইত্যাদি শিখতেন। কেন শিখতেন ? বিদেশী শাসকদের সঙ্গে লড়ায়ের জন্যে। শাসক, সে বিদেশীই হোক আর স্বদেশীই হোক, শাসনযন্ত্রের সঙ্গে লড়াই না করলে কোনও কালেই বাঁচা যায় না। আমরা মাঝে মাঝে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ডেকে বসি। মেপে মেপে মিছিল ছাড়ি। লড়াই, লড়াই বলে মাথা ঝাঁকাই।

শিক্ষার ধরনটা তাহলে কি হবে ?

এই জগৎটা হল নাট্যমঞ্চ। জীবন হল নাটক। পৌরাণিক পালা নয়। আধুনিক নাটক। নাটক না বলে সার্কাস বলাই ভালো। সার্কাসের কলাকৌশলই শিখতে হবে। তাহলে শেখাই। মন দিয়ে শুনুন।

এক নম্বর পাঠ একটা নড়বড়ে বেঞ্চি, কি লগবগে চেয়ার যোগাড় করুন। কারুর সাহায্য ছাড়াই চটিপরা পায়ে তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে উঠুন উঠুন আর নামুন, নামুন আর উঠুন। টাল খেয়ে পড়ে গেলে চলবে না। পড়ে গেলেই শাস্তি হিসেবে দু হাতে নিজের দু'কান ধরে সর্বসমক্ষে দশবার ওঠবোস। বেশ রপ্ত হয়ে গেলে, দ্বিতীয় পাঠ।

দ্বিতীয় পাঠ স্ত্রী অথবা পুত্র-কন্যার সাহায্য নিতে হবে। দুর্দান্ত স্বভাবের একটি কিশোর থাকলে বড় ভাল হয়। একাধিক হলে তো আরো ভালো। তারা

ওই নড়বড়ে বেঞ্চিটিকে মনের আনন্দে হিড়হিড় করে টানতে থাকবে, আর আপনি সেই চলমান বেঞ্চিতে বারেবারে লাফিয়ে উঠবেন, আর নামবেন। আরোহণে ডান পা, অবরোহণে বাঁ পা।

তৃতীয় পাঠ আরোহণের সময় ধাক্কা মারতে বলবেন এই ধাক্কা মারার দায়িত্বটি স্ত্রীকে দিলে তিনি আনন্দ পাবেন। ধাক্কা বহুপ্রকার। পাশ থেকে, পেছন থেকে, বেঞ্চির ওপর থেকে। মাঝে মাঝে পা জড়িয়ে কাঁচি। এই বাধা অতিক্রম করে ওই চলমান লগবগে বেঞ্চিতে উঠে দাঁড়াতে হবে।

চতুর্থ পাঠ পরিবারস্থ সকলকেই এই পাঠে অংশ নিতে হবে। বড় পরিবার হলেই ভালো হয়। ছোটো হলে চালিয়ে নিতে হবে। প্রত্যেকেরই হাতে কিছু না কিছু জিনিস নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ান। সুটকেশ, ডেকচি, টিফিন ক্যারিয়ার, হাতা, খুন্তি, ফোল্ডিং ছাতা। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়। কোনও বাছবিচারের প্রয়োজন নেই। রেশন ব্যাগে ভাঙা কাঠকুটো এমন কি একটি কাটারি ভরে হাতে ঝোলানো যেতে পারে।

এইবার যে কেউ একজন 'ওই আসছে' বলে একটা চমক তুলে, হরির লুঠের বাতাসা যে ভাবে সংগ্রহ করতে হয়, সেই কায়দায় সবাই মিলে, তালগোল পাকিয়ে, জড়াজড়ি, গোঁত্তাগুঁত্তি করে বেঞ্চিতে ওঠার চেষ্টা করুন। ওরই মধ্যে একজনকে বলে রাখুন, এই চেষ্টা যখন চলছে, তখন আচমকা বেঞ্চি ধরে মারবে হাঁচকা টান। এই পাঠ নেবার সময় কেউ কাউকে আপনজন ভাবলে চলবে না।

এই চারটি পাঠ একসঙ্গে ভালো ভাবে রপ্ত করতে পারলে, অত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড বেড়ে যাবে। সামান্য কাটা-ছেঁড়ার দিকে আর মন যাবে না। অনায়াসে বলা যাবে, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। রোজ অফিস বেরোবার সময় প্যানপ্যান করে কাঁদতে হবে না। বেঁচে ফিরতে পারবো কিনা, জানি না মাধু। আমার নাম করে মাছের টুকরোটা আর তুলে রেখো না, যদি চাকার তলায় চলে যাই!

পঞ্চম পাঠ এর জন্যে প্রয়োজন আস্ত একটি সুপুরি বা নারকেল পাতা। শৈশবে ফিরে যান। মনে পড়ে পাতার ওপর থেবড়ে বসে আছে শিশু গোপাল আর বলাই পাঁঠা টানছে হিড়ড়ি করে। ধেড়ে বয়েসে সেই মজাটিকেই ফিরিয়ে আনুন। বসবেন না, প্রান্তভাগে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকুন। স্ত্রী পুত্র পরিবারকে বলুন আগা ধরে টানতে। হ্যাঁচকা টান। টাল সামলান। আবার হ্যাঁচকা টান, টাল সামলান। লাগাতার টান। কদম কদম টান। স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করুন। পয়সা বের করে অদৃশ্য কণ্ডাকটরকে ভাড়া দেবার চেষ্টা করুন। ব্যালেনস বুঝে নিন। এই পাঠটি রপ্ত হয়ে গেলে চলমান বিশৃঙ্খলাকে মনে হবে স্থির শয্যা। অনন্ত নাগের মত কারণ সলিলে ভাসমান।

ষষ্ঠ পাঠ ভাঁড়ার ঘর বা খুপরি ঘরের শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ান। পরিবারকে বলুন যাবতীয় বস্তু, লেপ, কাঁথা, তুলোর বস্তা, চেয়ার টেবিল, কাঠকুটো, ঘুঁটের বস্তা, জলের ড্রাম, যা পাওয়া যায় সব দিয়ে আপনাকে প্যাক করে দিক। এইবার আপনি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন। বেরোন আর ঢুকুন, ঢুকুন আর বেরোন। একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে ভিড় বাস থেকে ওঠা আর নামা মনে হবে নস্যি, নস্যি।

সপ্তম পাঠ এক আঙুলে জানালার গরাদ ধরে, একপায়ে গোবরেট থেকে তারে আটকানো চাঁদিয়াল ঘুড়ির মত লাট খান, পাক খান, আর চিৎকার করুন, ড্যালাহাউসি, ড্যালাহাউসি। মনে রাখবেন ট্রেনিং-এ যেমন মানুষ তৈরি হয়, ট্রেনিং-এ তেমনি বাঁদরও তৈরি হয়।

ন্যাজের সাধনা

যুদ্ধ শেষ। মা অসুর নিধন করে হিমালয়ে চলে গেলেন। খুব নর্তন কুর্দন হল। আসছে বছর আবার হবে। এইবার আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের একটা হিসেব নেওয়া যেতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞান শিখিয়েছে এনার্জি হারায় না। রূপান্তরিত হয়। যেমন ময়দানে মনুমেন্টের তলায়, ব্রিগেডে যত বক্তৃতা হয়েছে, সব বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ট্রপোস্ফিয়ারে ঝুলে আছে। যে কোনও দিন বজ্র হয়ে ফিরে আসবে। পুজোয় আমরা যত নেচেছি, ট্যাং ট্যাং করে ঘুরেছি, সব রূপান্তরিত হয়েছে ন্যাজে। কালে প্রকাশ পাবে। লাঙুলের আয়তন দেখে বোঝা যাবে, কে কোন দরের মানুষ। আমাদের ভেতরে অল্প একটু অলরেডি প্যাক করা আছে। সাধনায় একদিন সেই বস্তু আত্মপ্রকাশ করবেই। জীব বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না, এদিকে সে বস্তু গোকুলে বাড়ছে। যেদিন ছপ্পর ফুঁড়ে বেরোবে, সে দিন হই হই পড়ে যাবে। ন্যাজ দিয়ে শ্রেণী চেনা যাবে, ন্যাজ দিয়ে নেতা চেনা যাবে। বার্ডস অফ দি সেম ফেদারের মত এক ন্যাজের মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে, দল গঠন করবেন, মন্ত্রিসভা করবেন, দল-ত্যাগের ভয় থাকবে না। সাধারণ মানুষ এখন হাত দিয়ে হাতল ধরে বাসে ঝোলেন। হাত টনটন করে। হাত খুলে চিৎপাত হয়ে অনেকে ভবসাগরের পারে চলে যান। হাতের গ্রিপ আর ন্যাজের আড়াই প্যাঁচে অনেক তফাৎ। আমরা সব ন্যাজ ঝোলা হয়ে অফিস করবো। পরিবহণ মন্ত্রীকে আর স্মরণ করার প্রয়োজন হবে না। তিনি সুখে অকাতরে নিদ্রা দিতে পারবেন। মাঝে মাঝে স্টেটমেন্ট, চক্ররেল ভাবা হচ্ছে, বাইপাস ভাবা হচ্ছে, জল পরিবহণ হল বলে, দোতলা ট্রাম, ভালসা কাঠের

মডেল রেডি, বি টি রোড ধরে ট্রাম ছুটবে, প্রপিতামহ শুনে গিয়েছিলেন, নাতিদেরও দেখা হল না, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রুতিশ্রুতি আমরা পেয়েই চলেছি। গোটা পঞ্চাশ সরকারী বাস ড্রেসিংরুমে মেকআপ নিয়ে রেডি হয়ে আছে। কোন্ অঙ্কের, কোন্ দৃশ্যে পথে নামবে নাট্যকার, প্রযোজক পরিচালক কারুরই জানা নেই।

কিছুদিন আগে একটি শিশু ইঞ্চি ছয়েক ন্যাজ নিয়ে জন্মে ছিল। কবে যে ঘরে ঘরে ন্যাজালো মানুষ তেজালো হয়ে উঠবে ! ন্যাজ ভাবপ্রকাশের কত বড় একটা বাহন ! জীবজগতের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। একটা হুলো আর একটা হুলোকে দেখলেই ধনুকের মত বেঁকে যায়, ন্যাজ অটোমেটিক ফুলে ওঠে। তখনই বোঝা যায় একজন আর একজনকে সহ্য করতে পারছে না। শত্রুভাবাপন্ন। মনের ভাব চাপার উপায় নেই। ন্যাজেই তার প্রকাশ। ন্যাজ সরাসরি মনের সঙ্গে যুক্ত। মনই নাড়ায়, মনই ফোলায়, মনই নেতিয়ে রাখে। আমরা না জেনে কত শত্রুকে বন্ধু ভেবে বসে থাকি। হেসে হেসে কাছে এসে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে সরে পড়ি। প্রাচীন একটা গানই আছে, জগতে লোক চেনা ভার মুখ দেখে। ন্যাজ থাকলে আর এ আক্ষেপ থাকত না। কবি গাহিতেন না জগতে লোক চেনা ভার ন্যাজ দেখে। সুকুমার রায় গোঁফ সম্পর্কে লিখেছিলেন

গোঁফকে বলে তোমার আমার
গোঁফকি কারো কেনা ?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি,

তাই দিয়ে যায় চেনা।

ন্যাজের কাছে কিন্তু গোঁফ লাগে না। ন্যাজের কি বিউটিফুল একসপ্রেসান। এই যে আমরা বলি, ন্যাজে গোবরে অবস্থা। কি অসাধারণ অভিব্যক্তি! ন্যাজে গোবরে গরু দেখলেই বোঝা যায়, কি চমৎকার বিপর্যয়! বিদ্যুৎমন্ত্রী অ্যাসেমব্লিতে এলেন, সভ্যরা দেখেই বুঝে গেলেন, আবার লিক, আবার নিম্নমানের কয়লা। শিল্পমন্ত্রী এলেন, এক অবস্থা, পরিবহণ এলেন, পর পর যাঁরাই ঢুকছেন, ন্যাজ দেখে যায় চেনা। ভাষণের এই করেছি, সেই করেছি, পরিসংখ্যানের কারচুপি, সব ধরা পড়ে যাবে ন্যাজ দেখে। বিরোধী নেতা বলবেন, মাননীয় মন্ত্রী আজ থাক, এখন থাক, ন্যাজ আগে নর্মাল কনডিসানে আসুক।

বড় কর্তার মেজাজভালো ছিল না, ছুটি চাইতে গিয়ে ধাঁতানি খেয়ে ফিরে আসতে হল। ন্যাজ থাকলে অধস্তনকে আর এমন দুর্বিপাকে পড়তে হবে না। বেয়ারা এসে খবর দেবে, ফাইল রাখতে গিয়ে দেখে এলুম চেয়ারের পেছনে ন্যাজটি পুট পুট করে নড়ছে। মেজাজ ভালো আছে এই বেলা আর্জি পেশ করুন।

ন্যাজ থাকলে দাস চেনারও সুবিধে হবে। যাঁরা জেনুইন দাস, প্রভুকে দেখলেই তাঁদের ন্যাজ আন্দোলিত হতে থাকবে। মুখের দ্যাখন হাসির মত নয়। ন্যাজ মনের আসল ভাবপ্রকাশ করে। বহু ফিকিরে লোক হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ করে ক্ষমতাশালী লোকের চারপাশে ঘুর ঘুর করে, আপনার মত লোক হয় না স্যার, আপনি এই পৃথিবীতে এক পিসই জন্মেছিলেন স্যার, মোসাহেবি করে, হাতে পায়ে ধরে, ছেলের চাকরি জামাইয়ের পদোন্নতি, পারমিট, লাইসেন্স, ইত্যাদি আদায় করে, উপযুক্ত সময়ে ক্যাঁত করে একটি লাথি মেরে সরে পড়ে। এদের নাম সুখের পায়রা। ন্যাজ থাকলে টেস্ট করে নেওয়া যায়। প্রথম থেকেই বলা যায়, না বাপু তোমার ন্যাজের ক্যারেকটর ভালো নয়। তুমি আজ আছ কাল থাকবে না।

ভবিষ্যতে এই ন্যাজ হবে শাপে বর যুবকরা এখন চুল নিয়েই ব্যস্ত তখন চুল আর ন্যাজ দু'টোরই কেয়ারি চলবে। বুরুশ মারা, ড্রেসিং, শ্যাম্পু। ওষুধ কোম্পানি ন্যাজের ভিটামিন বের করে বিজ্ঞাপন দেবে

ন্যাজের শোভা মানুষের শোভা
শেয়ালের মত ন্যাজ চাই।
ন্যাজাট্যামিন খান
এক মাসের মধ্যেই খ্যাঁক শেয়ালের
মত ন্যাজ হবে।

pathagar.net

দেশ জুড়ে ন্যাজের সাধনা চলেছে। দেবী এবার যাবার আগে মধ্যরাতে, মধ্য কলকাতার এক প্যাণ্ডেলে জনৈক জেনুইন ভক্তকে দর্শন দিয়ে বলেছেন, আর একটু কোঁত পাড় তোরা, প্রায় হয়ে এসেছে। ঝড়াস করে বেরলো বলে। সাধনার জোরে ন্যাজ মার্কা স্বভাব এসে গেছে। এইবার হাত দুয়েক লম্বা একটি বেরলেই জয় তারা। রামলীলার হনুমানকে আর খড়ের ন্যাজ পরে নাচতে হবে না।

চুকচুক

বাবা গঙ্গাজীবন,

তোমার পিতৃদেব মৃত্যুশয্যায় হাতে ধরে বলেছিলেন, 'নগা, ছেলেটা রইল, মাঝেমধ্যে একটু খবরটবর নিস। আমাকে তো কান ধরে টেনে নিয়ে চলল। অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল। তুই ভাই ছেলেটাকে দেখিস। পেছন দিকে আলাদা একটা রান্নাঘর করার ইচ্ছে ছিল। ধোঁয়ায় বাড়ি নষ্ট হচ্ছে। তা পেছনের প্রতিবেশী পটলা ব্যাটার অবজেকসানে কাজটা দরকচা মেরে রয়ে গেল। দেখি ওপরে উঠে নিচে নামা যায় কি না! বুঝতে পারছ কি বলতে চাইছি। আজকালকার মাস্তান হলে পটলাকে পেটো মেরে চমকে দিতুম। আমরা ভাই সেকেলে বুড়ো। যৌবনে লাশটি মন্দ ছিল না ; কিন্তু কথায় কথায় লাশ ফেলে দেবার রেওয়াজ ছিল না। একটু অশরীরী কেরামতি দেখিয়ে পটলার 'না'কে 'হ্যাঁ' করানো যায় কি না দেখি।' আমার হাত থেকে এক ঢোঁক গঙ্গাজল খেয়ে তোমার পিতৃদেব গপগপ করতে করতে ওপরে চলে গেল।

তা বাবাজীবন শেষ-শয্যায় কথা দিয়েছিলুম বলেই মাঝেমধ্যে খবরাখবর নেবার জন্যে তোমার ওখানে যাই। গত রবিবার তোমাদের বাড়িতে গিয়ে বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলুম। বিশ বাইশবার কড়া নাড়ার পর তোমাদের বাড়ির বাচ্চা কাজের মেয়েটা ঘ্যাড়াং করে দরজা খুলে দিয়ে চলে গেল। তোমাদের বেশ সাজানোগোছানো বৈঠকখানায় উজবুকের মত বসেই আছি, বসেই আছি। তোমাদের সেই লোমশলা উৎপাতটি, একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গালগলা চেটে চেটে দিচ্ছে। খেঁই খেঁই করে মেমসায়েবের গলায় ধমক ধামক ছাড়ছে। জামার পকেট ধরে, পাঞ্জাবির হাতা ধরে টানাটানি করছে। সে যেন জেলখানার থার্ড ডিগ্রি। আসামী হলে দোষ কবুল করে ফেলত। বাবাজীবন আমার কোনও অপরাধ ছিল না। পরে বুঝেছি, মর্ডান এজে হুট বলতে কারুর বাড়িতে

যাওয়াটাই বড় অপরাধ। ক্যাপিটেল পানিশমেণ্ট হওয়া উচিত।

বউমা বোধহয় মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কে রে ?

মেয়েটি বললে, সেই বুড়োটা।

বউমা ব্যাখ্যা চাইলেন, কোন বুড়ো ?

তোমাদের বাড়িতে বোধহয় একাধিক বুড়োর উৎপাত আছে ! মেয়েটি বলল, সেই কেশো বুড়োটা নয়, এ সেই জ্ঞান দেওয়া বুড়ো।

বউমা অমনি তোমাকে বললেন, যাও তোমার জ্ঞানদাস এসেছে।

তুমি অমনি চাপাস্বরে বললে, সেরেছে, এই সন্ধের সময় ভ্যাজোর ভ্যাজোর।

আয়নার সামনে না দাঁড়ালে মানুষ নিজের মুখ নিজে দেখতে পায় না। তুমি যখন 'কাকাবাবু' বলে ঘরে এসে দাঁড়ালে, তোমার মুখ দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। রাগ রাগ, বিরক্তি বিরক্তি। ঝোলে ঝালে অম্বলে চাটনিতে একাকার।

তুমি যখন বললে, 'কি বলুন ?' ঘরে যেন বোমা পড়ল।

আমি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললুম, 'কিছু চাই না বাবা। এসেছিলুম, তোমার খবর নিতে। কেমন সব আচোটাচো ? শীত চলে যাচ্ছে !'

তোমার উত্তরটি ভারি ভালো লেগেছিল, 'কাল যে রকম ছিলুম, আজও সেই রকম আছি, পরশুও সেই রকম থাকবো। আপনি কি আমাদের থ্রম্বসিসের রুগি ভাবলেন, যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুলেটিন ছাড়তে হবে !'

তোমার পিতৃদেবের ছবির দিকে একবার তাকালুম, একবার তাকালুম তোমার দিকে। সেকাল আর একাল ! আমার বোঝার ভুল হয়েছিল বাবা, একালে সব একঘরে। আগেকার কালে সামাজিক অপরাধে মানুষ একঘরে হতো, মুখিয়ার বিচারে। এখনকার কালে নিজেরাই নিজেদের সাজা দিয়ে বসে আছি। স্বেচ্ছার দীপান্তর। দীপান্তরে সুখে থাকো বাবা। এ পাখি আর কোনও দিন তোমাদের ডালে শিস দিতে যাবে না। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী নগেন।

গঙ্গাজীবন চিঠিটি স্ত্রীকে দেখালেন, আধুনিকা বললেন, 'বাঁচা গেছে।'

দিন তিনেক পরেই পটলবাবুর তিন ছেলের সঙ্গে গঙ্গাজীবনের হাতাহাতি হয়ে গেল, সেই রান্নাঘর নিয়ে। গঙ্গাজীবন ফ্ল্যাট। তিন ছেলে খাবলে খুবলে দিয়ে গেছে। মানুষের ভাষা আর নেকড়ের ভাষায় ইদানীং খুব একটা পার্থক্য নেই।

গঙ্গাজীবনের স্ত্রী একালের প্রতিবেশীদের কাছে ছুটলেন। আপনারা সবই দেখেছেন, একটা কিছু করুন। অন্যায়ের প্রতিকার।

আমরা আবার কি করব। আমরা দেখব, আমরা শুনবো, আমরা তাইতেই মজা পাবো। আমরা হয় ঘুঁটে, না হয় গোবর। ঘুঁটে পুড়লে গোবর হাসবে যদিও দুটোই এক জাতের। জগৎ-রঙ্গমঞ্চের গ্যালারিতে আমরা দন্ত বিমোচন করে বসে থাকব। শোনো বউঠান, ও হল একান্তই তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে শাস্ত্রের নিষেধ আছে। আমরা যা পারি সেটি বলে রাখি, সহকর্মী কেউ মারা গেলে হাফ ছুটির জন্যে বড় কর্তার কাছে আরজি পাঠাতে পারি। দুঃখে নয় ছুটির আনন্দে। একটা কনডোলেনস মিটিং ডাকতে পারি। শোকসন্তপ্ত প্রস্তাব নিতে পারি। আত্মার শান্তি কামনা করে মৃতের স্ত্রীর কাছে একটি চোতা পাঠাতে পারি। তারপর দুপুরের শোতে একটি ইংরিজী ছবি দেখতে পারি। বিশ্বাস না হয় গঙ্গাজীবনেক মরে দেখতে বলো। সত্য যাচাই করে নেওয়াই ভালো। আমরা বাছা 'মেড-ইজি-প্রতিবেশী'।

এই দুর্দিনে কিন্তু সেই বৃদ্ধই অগতির গতি। তখন তিনি আর জ্ঞানদাস নন। পরম প্রিয় কাকাবাবু। অমন মানুষ আর হয় না। তিনি জুনিয়ার পটলদের দাবড়াবার সাহস রাখেন, কারণ প্রাচীনদের অভিধানে প্রতিবাদ বলে একটি শব্দ ছিল, পরোপকার বলে একটি শব্দ ছিল।

এ কালের কণ্ঠে আছে ভাষাহীন একটি শব্দ, চুকচুক। অনেকটা; তরলপদার্থে চতুষ্পদের জিহ্বা-লেহনের মত।

ন্যাজের ধর্ম

থাকুক আমার বিয়া,
হায়রে পোড়াবাঙলা দেশ
মেয়ের বাপ যেন দুম্বা মেষ,
নিতি নিতি খাচ্ছে তাহার
মাংস কেটে নিয়া
কি কুক্ষণে আদিশূর
আনলে দেশে এ অসুর
মাল্লে না কেন বল্লালেরে
চোখেতে নুন দিয়া।

BanglaBook.org

গোবিন্দ দাস যে সময় এক বঙ্গললনার মুখে এই সব ক্ষোভের কথা বসাচ্ছিলেন, থাকুক আমার বিয়া, বাঙ্গালা দেশের সবাই পশু, কিসের ঘোষ কিসের বসু, মুখুয্যা চাটুয্যা কিসের, সবাই পশুর হিয়া ! সে সময় চলে গেছে। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। শিক্ষার প্রসার হয়েছে। সংবাদপত্রের সাময়িকপত্রের কাটতি বেড়েছে। আমরা ধুতি ছেড়ে প্যান্ট ধরেছি, অঙ্গে সুবাস ছেটাতে শিখেছি, রাজনীতি সচেতন হয়েছি, ঈশ্বর নামক কুসংস্কারকে বিদায় করেছি, যৌথপরিবার ফ্ল্যাট করে দিয়ে টিং টিং-এ সংসার নিয়ে ফ্ল্যাটে এসে ফ্ল্যাট

হয়ে পড়েছি। মেয়েরা জীবিকায় এসেছেন। শাড়ি ছেড়ে জিনস্ ধরেছেন। অফিসযাত্রীর ভিড়ে নারী আর পুরুষ এখন প্রায় ফিফটি ফিফটি। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেমের বৈঠকখানা সরগরম। মাঝে মাঝে ঝিলের জল থেকে ছেঁচে তুলতে হয় একক অথবা জোড়া লাশ, হৃদয়ের শিকার। মৃত কিংবা মৃতার মুখে লেখা, আমি আর সইতে পারলাম না।

সংসার বা ফ্যামিলি বলতে আমরা যা বুঝি, যার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ দিনের পরিচয় তা হল একজন নারী ও একজন পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টা ! বলা চলে ঘোষ বোস অ্যাণ্ড কোম্পানী বা মুখার্জি ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ স্ত্রী পুরুষের কীর্তিকাহিনীই হল সমাজ। প্রথাটা এতই প্রাচীন যে আমরা এর তাৎপর্যই ভুলে গেছি। পিতা এবং মাতা বিবাহবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে পুত্র কন্যা রূপ কিছু আধুনিক প্রাণীকে যে পৃথিবীতে আসার পথ করে দিয়েছিলেন আর তাই যে আমাদের এত বোলচাল এ-কথা অধিকাংশ সময়েই আমাদের মনে থাকে না। পিতার পিতা তস্য পিতা, মাতার মাতা তস্য মাতাকে তখনই মনে পড়ে যদি কখনও শ্রাদ্ধে বসা হয়। সে সব নাম আবার নিজের মেমারিতে নেই। প্রবীণ কোনও মানুষ একটুকরো কাগজে পরপর দুসার নাম লিখে দিয়েছেন। দিবাকর ? হু ওয়াজ দিবাকর ? বাছা, দিবাকর তোমার পিতার নাম। আই সি আই সি। হু ওয়াজ সুধাকর ? পিতার পিতা। মধুকর ? তস্য পিতা। মাই গড হাও ফানি ! জ্যাঠামশাই, এ ভাবে কতদূর যাওয়া যাবে ? যতদূর তুমি যেতে চাও। এই সারিতে তোমার মাতার নাম, মাতার মাতা, তস্য মাতা, তস্য মাতা ! দেন আই মাস্ট বি ভেরি ওলড।

বাছা তুমি ওল্ড নও, তোমার ফ্যামিলি ওল্ড। ওপর থেকে নামতে নামতে তোমাতে এসে ঠেকেছে।

একটা অরাজক বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সমাজপতিরা সেই বেদের কাল থেকেই সুন্দর এক বাঁধনে বেঁধে ফেলে ছোটো ছোটো পরিবারে ভাগ করে দিলেন। মেল ফিমেল ইউনিট। এখনকার কালের ইলেকট্রিক সুইচের মত, ফেস আর টপ। অরাজক অবস্থায় যে বস্তু চলত, সেটিকেও বিধিসম্মত করে নিলেন, পৈশাচ বিবাহ। পৈশাচ, রাক্ষস আর অসুর বিবাহ আমাদের প্রাচীন সামাজিক অবস্থার পরিচয় তুলে ধরছে। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর অবস্থা। চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলো।

অসহায় নারীর মুখ চেয়ে স্মৃতি 'পৈশাচ' পদ্ধতিকে মেনে নিলেন, যদিও পদ্ধতিটি ধিক্কারজনক। ব্যভিচারীকে বিবাহে বাধ্য করে নারীর সম্মান রক্ষা। ব্যভিচার ফলোড বাই বিবাহ। একটি মেয়েকে ভুলিয়ে, মদে চুর করে অথবা বলপ্রয়োগে চেপে ধরে দেহ দানে বাধ্য করা হল। সর্বকালেই যা হামেশা হয়ে

pathagar.net

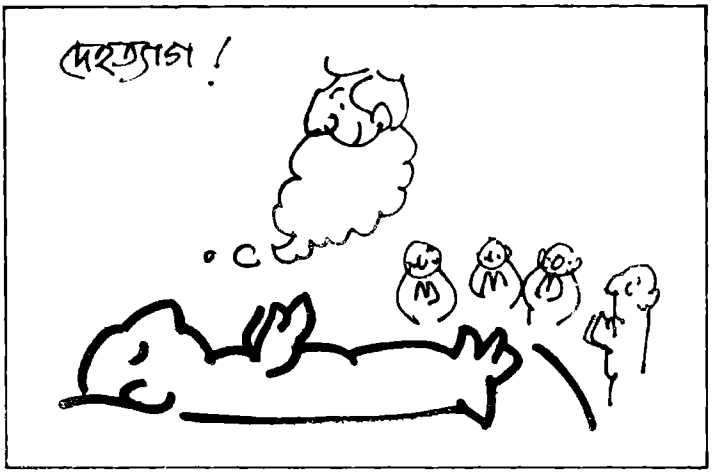

থাকে। স্মৃতি করলেন কি, মানুষের এই জৈব প্রবণতাকে এক জাতীয় বিবাহবন্ধনের চেহারা দিলেন। নিন্দনীয় হলেও আটটি পদ্ধতির মধ্যে একটি। যে নারীকে তুমি এইভাবে ভোগ করলে তাকে ফেলে পালালে চলবে না। এইবার তাকে ঘরে স্ত্রী হিসেবে তুলে নিয়ে যাও অমৃতস্য পুত্রাদের অমৃত যে কোন মুহূর্তেই ফার্মেন্ট করে চোলাই মদ হয়ে যেতে পারে।

এর পরেই স্মৃতিকাররা মেনে নিয়েছিলেন, রাক্ষস আর আসুরিক বিবাহ পদ্ধতি। রাজ্যপাট লুট করে, জয় করে ফেরার সময়, টুকটুকে সুন্দরী রাজকন্যা কিংবা রাজরানীকে 'ট্রফি' হিসেবে নিয়ে আসাটাই ছিল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মহাভারতেই আছে ভীষ্ম কাশীরাজকে পরাজিত করে রাজকন্যা অম্বাকে ধরে এনে বিচিত্রবীর্যের হাতে তুলে দিলেন।

পৃথিবীর ভায়োলেন্ট ভাব যখন কমে এল, ভারতে যখন বৈদিক সভ্যতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল, তখন ঋষিরা স্ত্রী পুরুষের পশ্যাচারকে ধর্মের বাঁধনে ফেলে, ব্রাহ্ম এবং প্রাজাপত্য বিবাহবিধি ছাড়া অন্যান্য বিধিকে অচল, অপাঙক্তেয়, ঘৃণিত করে দিলেন। বিবাহ পবিত্র দৈব বিধান, সংসার তিনটি আশ্রমের ধারক, রক্ষক। মানুষকে তুলতে তুলতে প্রায় দেবতার পর্যায়ে তুলে দিলেন চতুর্দিকে মধুবাতা ঋতায়তে, সিন্ধব, মধুক্ষরন্তি। অমৃতস্য পুত্রারা দেবতার প্রতিবিম্ব হয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরছেন।

এই ধারণাই আমাদের কাল হয়েছে। মানুষ মানুষ। কুকুরের ন্যাজকে সোজা

pathagar.net

করে যদি বলা হয়—এই হল ভগবান, বিপদ আছে। ছেড়ে দিলেই বেঁকে যাবে। মানুষ একটা জটিল ব্যাপার। হাজার হাজার বছরের সংস্কার, জীবনধারা, শিক্ষাধারা, সামাজিক বিবর্তন মানুষের মনের, মানুষের প্রবণতার ধারা নিয়ন্ত্রণ করছে। ধর্ম এতকাল বাঁকা ন্যাজ টেনে সোজা করে রেখেছিল। ধর্মের হাত ফসকে ন্যাজ বেরিয়ে গেছে। বাঁকা ন্যাজের খেল শুরু হয়েছে।

ব্রাহ্মমতে সংসার পেতে পৈশাচিক নৃত্য। রেপ থ্রু ম্যারেজ। তখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত। এখন হবে পাড়ায় পাড়ায়। আর ট্রফির মত এ পাড়ার অম্বা যাবেন ও পাড়ার বিচিত্রবীর্যের কাছে। আর ঘরে ঘরে শর্মিষ্ঠারা মহাভারতের শর্মিষ্ঠার মত বলবেন নিজের স্বামী আর বন্ধুর স্বামীতে আমি কোনও তফাৎ দেখি না।

দেশদ্রোহী

গ্যেটে একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন,

'আমরা প্রায়ই বলি দিনকাল আর আগের মত নেই, সবই কেমন যেন বদলে গেছে, তখন কিন্তু একটা বিষয় প্রায়ই ভুল হয়ে যায়, যিনি বলছেন তিনিও ত বদলে গেছেন।'

একালের সকলের মুখে প্রায়ই একটি কথা শোনা যাবে, ওঃ কি দিনই পড়ল রে ভাই, আর টেকা যায় না। সকলের সমবেত চেষ্টাতেই ত পরিস্থিতি এমন ঘোরাল হয়েছে! যা হচ্ছে হোক, আমি ভাই ও সব সাতেও নেই পাঁচেও নেই। ছাপোষা মানুষ, নিজেরটা নিয়েই পড়ে আছি। ওই যা হচ্ছে হোক হতে দিয়ে এখন এমন সব হচ্ছে যা আর সহ্য করা যায় না। আগুন ক্রমশই ছড়িয়ে পড়তে পড়তে নিজের ঘরে এসে লেগেছে। এখন আর জল জল বলে চিৎকার করলে কি হবে!

তোমার ব্যাপারে আমি নেই, আমার ব্যাপারে তুমি নেই, কেউ কারুর ব্যাপারে নেই। সেই লাইন কটা মনে পড়ছে, তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই, কেউ নেই, ওড়ে শুধু একঝাঁক পায়রা। এই পায়রা এখন এমন ওড়া উড়ছে, লক্কা উড়ছে, নোটন উড়ছে, ঝোঁটন উড়ছে, গেরোবাজ উড়ছে। প্রশ্ন, ডিম পেড়েছিল কে? কেউ ত আর স্বয়ম্ভু নয়। একটা কথা খুব চালু হয়েছে, পারমিসিভ সোসাইটি, যার যা খুশি করার স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতায় আচার বিচার সব ভেসে গেছে।

কেন এমন হয়েছে?

উত্তর আমাদের জানা। আমাদের উদাসীনতায় যদুবংশ ধ্বংসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। চাল নেই, ডাল নেই, আলু নেই, আলো নেই, এই সব না থাকা দৈহিক জগতের ব্যাপার। এতে মানুষ কষ্ট পেতে পারে, প্রাণে মারা যায় না। কিন্তু নৈতিক দুর্ভিক্ষে মানুষ প্রাণে মরে দেহে বেঁচে থাকে। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। সিংহচর্মাবৃত গর্দভের মত মনুষ্যচর্মাবৃত পশু। আমরা বলি, দুধে দুধ নেই, ঘি-এ ঘি নেই, ওষুধে ওষুধ নেই, তেলে তেল নেই। আর একটা সাংঘাতিক নেই-এর কথা আমরা বলি না, বলতে ভয় পাই যেমন ছাত্রে ছাত্র নেই, শিক্ষকে শিক্ষক নেই, প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান নেই, রক্ষকে রক্ষক নেই, পিতায় পিতা নেই, মাতায় মাতা নেই, এক কথায় মানুষে মানুষ নেই। শুধু কিছু ধারণা, আর প্রত্যাশা বেঁচে আছে। বেঁচে আছে কোথায় ? বিদায় নিতে চলেছে এমন কিছু মানুষের মনে। এঁদের হতাশাই এখন সবচেয়ে বেশি। এই প্রায়-প্রবীণ মানুষরাই বেশি হায় হায় করছেন। যার জানা আছে সামনে গভীর খাদ, গাড়িতে বসে সেই বেশি হায় হায়, গেল গেল করে। না জানলে কোনও ঝামেলাই নেই। আমরা বাঁধন ছেঁড়ার জয়গানে, হোহো, হাহা, সোজা, গাড্ডা।

ভাল সম্পর্কে আমাদের একটা প্রাচীন ধারণা আছে। তাতে একটু বেদবেদান্ত, হিন্দুধর্ম, ইংরিজী শিক্ষা, আধুনিক রাজনীতি, সমাজনীতি, গীতা, বাইবেল, সব রকমই আছে। অনেকটা ককটেলের মত। আমাদের ধারণা, শিশুরা হবে শিশুর মত, কাঁদবে কম, হাসবে বেশি। পুষ্টি জোগাতে পারি না পারি, স্বাস্থ্যবান হবে, অসুখে একেবারেই ভুগবে না। দিনে আপন মনে খেলবে, রাতে এমন শান্তিতে ঘুমবে, যেন মহানিদ্রা। এমনটি না হলেই জীবন দুর্বিষহ। কাহিল করে ছেড়ে দিলে মশাই। বারো মাসে তের পার্বণ যেন লেগেই আছে। আজ হাম, কাল ঘুংরি কাশি, পরশু তড়কা। রাত যেই দুটো বাজল অমনি বংশ তিলক সানাইয়ের পোঁ ধরলেন। অরণ্যে রাত্রিবাসের মত, স্বামী-স্ত্রীতে প্রহর ভাগাভাগি। অর্ধযাম তুমি বন্দুক কাঁধে, বাকি অর্ধযাম আমি বন্দুক কাঁধে। অয়েল ক্লথে খুঁতখুঁতে খ্যাঁত খ্যাঁতে শিশু ভোলানাথ। বংশ তিলক যেন বংশখণ্ড।

আমাদের প্রাচীন ধারণা, ছাত্রের ধর্ম অধ্যায়নং তপ। শাস্ত্র-নির্দেশ, হিন্দুর চারটি আশ্রম, ব্রাহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বলছেন, ষোল বছর বয়সকাল পর্যন্ত, ছাত্র ব্রহ্মচারীর আদর্শে বিদ্যাশিক্ষা করবে, বহুমুখী সাধনা, তার মধ্যে শরীরচর্চা এবং সহবত শিক্ষাও পড়ছে। দিনের বেশ কিছুক্ষণ তাকে কাটাতে হবে প্রবীণ সঙ্গে। বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে সে ফলিত জীবনের জ্ঞান আহরণ করবে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করবে, শিখবে ম্যানারস্। এখন যেমন প্রবীণ মানেই ওল্ড ফুলস, তখনকার কালে তা ছিল না, বলা হত ত্রিকালজ্ঞ। পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার, তিনটেই যাঁর চোখের সামনে ভাসছে, সমাজে তিনি

pathagar.net

কেতাবের চেয়েও প্রয়োজনীয়। প্রবাদই ছিল তিন হাঁটু যার বুদ্ধি নেবে তার।

এই সব বিদঘুটে ধারণা যেকালে জন্মেছিল, সেকালে ফুটবল ছিল না, ক্রিকেট ছিল না, ফিলম্ ছিল না, টিভি ছিল না, ভিডিও ছিল না, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ছিল না। একালে মূর্খে পড়ে, বুদ্ধিমানে পাশ করে। সদ্য পাশ করা কোনও ডাক্তার যদি বুকের ডানদিকে স্টেথিসকোপ চেপে ধরে, গম্ভীর গলায় বলেন, কমপ্লিট রেস্ট, আপনার হার্ট খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইন্‌জিনিয়ার যদি বলেন, ভেঙে যায় বারে বারে, ড্যাম ভাঙে, ব্রিজ ভাঙে, বহুতল বাড়ি হেলে যায়, অবাক হবার কিছু নেই।

সেপাই বলেছিল, আমি কি করব হুজুর, আমার একহাতে ঢাল, একহাতে তরোয়াল, কোন হাতে চোর ধরব ! ব্যাটা ভাগলবা। ছাত্র বলবে, আমার মাথায়, পলিটিক্স, স্পোর্টস, ফ্রাসট্রেসান, অ্যামবিশান, সেক্স, ড্রাগস, আমার চোখের সামনে রুপোলী পর্দায় কারা সব কিভাবে নাচছে, মোড়ের রকে দোস্তরা বসে আছে, বর্তমানের মজা লুটছে, ইয়ার ! কেতাবে কি আছে ! ওয়ার্লড ইজ এ বুক, লড়াই লড়াই লড়াই চাই। এমন একটা জীবন চাই, যার বেশ কিক আছে। সামনে ফেরান চুল, ভালোমানুষের মত মুখ, সাদামাটা সাজপোশাক, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, বিনয়ী, শ্রদ্ধাশীল, ছাত্র বলতে এক সময় আমাদের চোখের সামনে এই রকমই একটি ছবি ফুটে উঠত। তারা এখন ডাইনাসর কিম্বা টেরোড্যাকটিলের মতই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী।

প্রাগৈতিহাসিক সমাজ সচেতন এক প্রবীণ প্রাণী, যিনি বাঙালীর মধ্যে এখনও সুভাষকে খোঁজেন, নরেন্দ্রনাথকে খোঁজেন, বাঘা যতীন, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথকে খোঁজেন, তিনি একদিন থাকতে না পেরে ফিউচার বেঙ্গলের রকে তা-মারা একটি জটলার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু দুটি শব্দ করেছিলেন, ছি ছি। তাঁকে দেশত্যাগী হতে হয়েছে। তিনি রাস্তায় বেরলে একপাল শৃগাল যেন সমস্বরে সুর তুলত ছিই ছি ছিই ছি। দেশদ্রোহী সেই প্রবীণ অতঃপর দেশত্যাগী।

pathagar.net

গদাই লস্কর

গদাই লস্করকে আমরা সবাই চনি। বরাতক্রমে কোনও কোনও মহিলাকে এমন মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়। সারা জীবন মুখ বুজে ঘর করে যেতে হয়। বাঙলায় একটি প্রবাদ আছে, হাঁড়ির কখনও সরার অভাব হয় না। বাঙালী হাঁড়ির ত হয়ই না, যে কিছুই করে না যার কোনও মুরোদই নেই সে একটা বিয়ে করে। ও দিদি, জামাই কেমন হল গো ! দেখি ! জামাইয়ের রূপ দেখে আর

বোলচাল শুনে প্রতিবেশিনীর নাড়ি ছেড়ে যাবার মত অবস্থা। বাসর আলো নয় অন্ধকার করে বসে আছেন। মাথায় ঘাগরা চুল, কপালে ঝুমকো, গাল ভেঙে গটাপার্চারের পুতুলের মত, টর্চ ফেলে কুয়োর মধ্যে সাবান খোঁজার মত চোখের কোটরে অক্ষিগোলক খুঁজতে হয়। শনির বলয়ের মত চারপাশে তিমির রেখা। যৌবনের জ্ঞানসঞ্চয়। পরিধানে আর্টসিল্কের পাঞ্জাবি। বুকের কাছটা খোলা, সেখানে পাউডার নামক বিভূতি ফাংগাসের মত গলা বেয়ে উঠছে। তিনি দিশি ধুতির পেখম মেলে, স্বর্গত উত্তমকুমারের 'হাজার টাকার ঝাড় বাতিটার'-র স্টাইলে, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ফুসুর ফুসুর বার্ডসাই ফুঁকছেন চারপাশে বরযাত্রী নামক নন্দী ভৃঙ্গীরা দেব ভাষায় বাক্যালাপ করছেন। গুরুর ছড়াছড়ি। স-এর দোষও আছে। গুরুর মুখে লবঙ্গ দিয়ে চন্দনের স্ট্যামপ মারা হয়েছে। একপাল পাহাড়ী মেষ যেন চড়াই উৎরাই বেয়ে চলেছে। কপাল বেয়ে নামতে নামতে দুগালের গভীর খাদে অদৃশ্য হয়ে, লম্বাটে চিবুক বেয়ে আবার দুপাশ থেকে উঠে এসেছে। আছে, তারা আছে, গাল ফোলালে দেখা যাবে।

এইবার সেই সুপ্রাচীন কাহিনীটি মনে পড়ছে।

ঘটক পরিচয় দিচ্ছেন পাত্রের। আজ্ঞে, ছেলে খুবই ভাল, পরম বৈষ্ণব। কোনও বেচাল পাবেন না, তবে মাঝে মধ্যে একটু আধটু পেঁয়াজ খায়।

অ্যাঁ, বলেন কি ?

আহা, ঘাবড়াবেন না। পেঁয়াজ খায় কোন দিন ? যেদিন একটু মাংসটাংস খায়।

অ্যাঁ, মাংস খায় ?

আহা, রোজ খায় না কি ? মাংস সেইদিনই খায় যেদিন পেটে একটু তরল পদার্থ পড়ে।

সে কি ঠাকুর ! মদ্যপান করে ?

ধুর মশাই ! রোজ করে না কি ? করে সেই দিন যেদিন কোনও বারাঙ্গনার বাড়ি যায়।

সে কি ?

আহা ! রোজ যায় না কি ! যেদিন রেসের মাঠে যায় সেইদিন বন্ধুবান্ধবরা ধরে নিয়ে যায়। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পাত্র পাবেন কোথায় !

চাকরি খুঁজতে গিয়ে কর্মপ্রার্থী বলেন, আমার এ লাইনে স্যার টেন ইয়ারস একসপিরিয়েনস। পাণিপ্রার্থীরাও ইদানীংকালে বলতে পারেন, ফাদার-ইন-ল, আমি একজন একসপিরিয়েনসড হাজব্যাণ্ড। ইডেনের গাছতলায় শীত নেই গ্রীষ্ম নেই ঝাড়া তিন বছর, লেকে অ্যানাদার থ্রি ইয়ারস, দীঘায় বার দশেক। ওয়ান আফ্টার অ্যানাদার।

এখন ত ঘটকের পাঠ উঠে গেছে, থাকলে পাত্রের বর্ণনা হত এইভাবে,

একেবারে সেল্‌ফ মেড মশাই। শুম্ভনিশুম্ভের মত তাল ঠুকে মাটি থেকে উঠেছে। গোঁফ গজাবার আগেই সাবালক। বাপ-মাকে ভাগাড়ে, 'মোস্ট ডিসটার্বিং' এলিমেণ্ট বলে পাচার করে দিয়ে এসেছে। বড় বোনটাকে চুলের মুঠি ধরে সেই যে মাঝরাতে একদিন বের করে দিলে, সেই থেকে সে বেপাত্তা। মনে হয় আর ফিরবে না। ছোটটাকে এখনও রেখেছে। আরে না না ভালবেসে নয়, ফাইফরমাশ খাটাবার জন্যে। সেই পনের ষোল থেকেই সিসটেমটাকে এমন করে ফেলেছে, পেটে প্লেন ওয়াটার একেবারে সহ্য হয় না, তেষ্টা পেলেই লাল জল। আর নার্ভ! মানুষের গলা দেখলেই ছুরি চালাবার জন্যে হাত একেবারে নিসপিস করে। কিন্তু কি সংযম! মাসে একটা কি দুটো তার বেশি নয়। বার্থ কনট্রোলের মত ডেথ কনট্রোল, তা না হলে পাড়া ত এদ্দিনে ফাঁকা হয়ে যেত মশাই। এই ত সেদিন, পায়ে একটা বুলেট ঢুকেছিল, হাসপাতালে 'অ্যানেসথেসিয়া দিয়েই চলেছে, দিয়েই চলেছে। অজ্ঞান আর হয় না। হবে কি করে? সব রকমই চলে যে!

গুলি লেগেছিল? কেন গুলি খেলছিল না কি?

আহা, সে গুলি নয়, নেশার গুলিও নয়, বন্দুকের গুলি। সব দিন কি আর লাগে, যেদিন 'অ্যাকসানে' যায় সেইদিন একটা আধটা লেগে যেতে পারে।

অ্যাকসান মানে?

আজ্ঞে, প্রোফেসনাল চামচাদের মাঝে মাঝে অ্যাকসানে যেতে হয়। পাড়ায় পাড়ায় রাইভ্যাল গ্রুপের সঙ্গে দু চার রাউণ্ড বোমা চালাচালি হয়। ওদের একটাকে এনে এরা মারে, এদের একটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওরা মারে। 'ডেনের' দেয়ালে রক্তের দাগ মেরে হিসেব রাখা হয়। ফুটবল খেলার মত, খুব সোজা হিসেব, ওয়ান অল, টু ইজ টু ওয়ান, টু অল। পাঁচ বছর বাদে বাদে হালখাতা হয়।

পাঁচ বছর কেন?

আহা, নির্বাচন ত পাঁচ বছর অন্তর অন্তর হয় না! সব ভুলে গেলেন। মেয়ে আপনার ভাল হাতেই পড়ল মশাই। ওয়াগন ভাঙা মাল আর লুটের টাকায় একেবারে পুতলী বাঈয়ের মত থাকবে। তবে একটা কথা, গলা টিপে যদি শেষ করে দেয়, কাণ্ট হেল্‌প। তবে সে সম্ভাবনা ত সব হাতেই। এ তবু বাইরে মারে, ভেতরে মনে হয় হাত চালাবে না

শান্তশিষ্ট, ল্যাজ বিশিষ্ট বাইরে অমায়িক। জীবনে প্রতিষ্ঠিত। ভাবা গেল নির্ভরশীল সংসারী হবে। অশিক্ষিত নয়। ফ্লেয়ারঅলা ট্রাউজার, মুখে সিগার। ইংরেজী ছবি দেখে। মিহি মিহি বোলচাল। বইপাড়ার রঙচঙে বইয়ের মত। মলাট ওলটালেই আতঙ্ক। তিনি কুটোটি নাড়েন না, তমোগুণী। সংসার উদাসীন। মিটমিটে স্বভাব। টাকাপয়সা ওড়ান। নিজের সুখেই সুখী, পরদার

pathagar.net

সেবী। অতি উপাদেয় একটি গদাই লস্কর। স্ত্রীকে একবার শ্বশুরালয়ে পাঠালে আর আনার নামটি করেন না। পারলে নিজেই ঘর জামাই হতে চান। এমন জামাই আছেন, যাঁর ভয়ে স্বয়ং শ্বশুর গৃহহারা। শ্বশ্রুমাতা সেবাদাসীর মত জামাতার ফাইফরমাশ খাটেন। সান-ইন-ল ভুঁড়ি ফুলিয়ে রকে বসে বাঘও মারেন, বউও মারেন।

প্লেগ

মশাই, আজকাল মৃত্যুর কি চটক বেড়েছে টেবিফিক। আগে মানুষের মরণে এত বৈচিত্র্য ছিল না। এক ছিল ম্যালেরিয়া, আর ছিল কলেরা। মাঝে একবার প্লেগ এসেছিল। ভেলকি দেখিয়ে সরে পড়েছে। ও সব মৃত্যুর কোনও গ্ল্যামার ছিল না। পাইকিরি হারে মানুষ লাটে উঠত। ম্যালেরিয়া মারত তিলে তিলে, দগ্ধে দগ্ধে। কোঁ কোঁ করে জ্বর এলো, ছেড়ে গেল, আবার এলো। পেটজোড়া পিলে। হলদে রক্তশূন্য শরীর। মরা মাছের মত চোখ। ভূতের মত কণ্ঠস্বর—আর ভাই, আমায় ম্যালোরি ধরেছে। ওষুধও যেমন, পথ্যও তেমন। কুইনিনের বড়ি আর সাবু। কানে ঝাঁ ঝাঁ পরলোকের খত্তাল। যমরাজের সিজ্‌লারে পাপী ভাজা হচ্ছে। সেই শব্দ।

কলেরা অতি তৃতীয় শ্রেণীর ভালগার ব্যাপার। ম্যালেরিয়া-রুগীর তবু একটা মঙ্গলগ্রহের জীবের মত মজার চেহারা হয়। দু'দণ্ড তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। মাথাটা বড়, চোখ দুটো ড্যাবা ড্যাবা। পেট জয়ঢাক, হাত পা ন্যাংলা ন্যাংলা। অসাধারণ একটা ইনটেলেকচুয়্যাল লুক।

কলেরার কনট্রিবিউশান! সে আর বলে কাজ নেই। একেবারে ন্যাজে গোবরে অবস্থা। ওষুধও তেমনি, নুনজল।

প্লেগে অবশ্য একটু ভ্যারাইটি ছিল। আঙুল ফুলে কলাগাছ না হয়ে, গলা ফুলে মাস্তান। এখনকার কালে মাস্তান দেখে মানুষ যেমন চম্পট দেয়, প্লেগাক্রান্ত মানুষ দেখেও লোকে সেই সময় বাবারে বলে ঘরবাড়ি, গ্রাম, শহর ছেড়ে পালাত। এমনই বরাত দেশে এখন প্লেগ নেই কিন্তু মাস্তানে ছেয়ে গেছে। প্লেগের কোনও রকম ছিল না। মাস্তানের কত রকম? কুঁচো মাস্তান, জিবেগজা মাস্তান, খাজা মাস্তান। কেউ কানপুরিয়া একসপার্ট, কেউ ব্লেড একসপার্ট, কেউ বেল্ট একসপার্ট, কেউ চেন!

মা দুর্গাকে দেবতারা অসুর নিধনের জন্যে নানা দিব্যাস্ত্রে সুসজ্জিত করেছিলেন। দিনকতক পরে প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে মাস্তান দেবতার পুজো হবে।

দিব্যমাস্তান। মূর্তিটা কেমন হবে? কোমরটুলির কারিগর অবশ্যই স্পেসিফিকেসান চাইবেন।

হাত দশটাই হোক। দশভুজ দেবতা। মাথা একটা। আকৃতিতে ছোট। রাবণের ইনফ্লুয়েনস না পড়ে। কাঁথাকাটা চুল। সেটা আবার কি! বলছি। পুরো চেহারাটা ফিল্ম ডিরেক্টারের মত ভিসুয়ালাইজ করা যাক। মাথার পেছন দিকে ঘাড় পর্যন্ত চুল লেবড়ে থাকবে কাঁথার মত। দু কানের উপর দিয়ে পাতা কেটে চলে আসবে কপালে। এপাশে ওপাশে লাট খাবে মাচা থেকে ঝুলে পড়া পুঁই ডাঁটার মত। মুখে একটা বোকা বদমাইশ, বোকা বদমাইশ ভাব বজায় থাকবে।

দেবদেবীর চোখ সাধারণত টানা টানা হয়। এ দেবতার চোখ হবে প্যাঁচার মত, গুলি গুলি। কোটরে ঢোকা। ওস্তাদকে বলতে হবে, ভাই, চোখের জায়গায় তুমি দুটো গর্ত রেখে দাও। আমরা ডেকরেশানের সময় ফিল আপ দি ব্ল্যাঙ্ক করে নেবো। দুটো লাল টুনি ফিটকরে দেবো। একটা ছোটো, একটা বড়ো। একটু ট্যারা চাহুনি। ছোটো চোখটা জ্বলবে নিভবে। যার অর্থ, আয়, রেপ করি, ওয়াগন ভাঙি, লাশ ফেলি, অ্যাক্সান করি। আর একটা চোখ স্থির ছানাবড়া। যার অর্থ, ল অ্যাণ্ড অর্ডার স্ট্যাণ্ড স্টিল। সব অচল। একপ্রকার দাপট-মুগ্ধ অবস্থা। স্তম্ভিত।

ঠোঁটে একটি বাঁকা সিগারেট। কৃষ্ণের মুখে ছিল আড় বাঁশি। এনার মুখে কিংসাইজ। এইবার দেবতার ভূষণ। জিন ছাড়া মানাবে না। চারপাশে চামড়ার পটি। জমিদার বাড়ির দরজার মত গুল কলকা বসানো। চওড়া বেল্ট। বগলসে মড়ার মাথা। টি শার্ট। গলায় রুমাল। পায়ে ট্যাঙ্গো নাচিয়েদের জুতো। ইয়া তার উঁচু হিল।

এইবার দশ হাতে ধরাতে হবে দশটি অস্ত্র। পাইপ, পেটো, ক্ষুর, দাড়ি কামাবার বুরুশ, হিন্দি ছবির ভিলেনদের হাতে যে রকম ভাঙা বোতোল থাকে সেই রকম একটি খ্যাচাখাঁই বস্তু। সাইকেলের চেন, ফ্যানবেল্ট, শাবল, মিটচপার।

এইবার বাহন কে হবে? বাহন ছাড়া দেবদেবীর কথা ভাবা যায় না। বিশ্বকর্মার বাহন হাতি। এনার বাহন কে হবে! আছে, সে আমরা পটুয়ার কানে কানে কয়ে দেবো। একটি হাতে ঝুলবে ভেড়ার মাথা। পেছনের চালচিত্রে লেখা থাকবে, লাশ ফেলে দোবো, রিপিট, রিপিট থোবনা উড়িয়ে দেব, রিপিট, রিপিট। কৌন বে, রিপিট রিপিট। নামাবলির মত দেবতার সৃষ্টিপালনকারী ব্রতসমূহ চক্রাকারে লেখা থাকবে।

পুজো প্রথামত চারদিনই বিধেয়। সন্ধি-পুজোর দিন নরবলি প্রদান। তাকেই বলি দেওয়া হবে যে নরাধম জ্ঞানের কথা, শিক্ষার কথা, মানুষ হবার কথা,

pathagar.net

দেবতা হবার কথা, বোস-পুরোনো ধর্মের কথা বলে। বলিটা হবে প্যাণ্ডেলে। পুজোটা হবে প্যাণ্ডেলের বাইরে। বাইশ পল্লীর সঙ্গে তেইশের, কাঁসারী পাড়ার সঙ্গে কসাই পাড়ার। আসল ফুটবল খেলা যেমন মাঠের বাইরে হয়। আসল পুজো হবে প্যাণ্ডেলের বাইরে। পাড়াকে পাড়া শেষ।একাদশীর দিন শুধু ধোঁয়া আর ছাই। মুরগী ঘুরছে ক্যাঁক ক্যাঁক করে। ধ্বংসস্তূপের ওপর গোটা দুয়েক প্রাণী ভূতের মত বসে ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে—আসছে বছর আবার হবে বে, আসছে বছর আবার।

তারপর, সেই এক দৃশ্য, বর্ধমান ফিভারের সময়, কি প্লেগের সময় যে রকম হয়েছিল, স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। গ্রেট এক্সোডাস। সেই রকম পল্লী ছেড়ে পালাচ্ছে আধুনিক মানুষ কাতারে কাতারে। কেয়া হুয়া ভাই ? দেওতা আয়া জি। ফাঁকা মাঠে লাখ লাখ বিধর্মী মানুষ। যে যা পেরেছে, ঘাড়ে করে এনেছে। ফ্রিজ, টিভি, রেকর্ড প্লেয়ার। হাইফাই।

বিদায়ী প্রলাপ

ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রার্থনা করেছিলেন, মা, আমাকে শুকনো সন্নিসী করিসনি, রসেবশে রাখিস মা। এ প্রার্থনা আমাদের সকলের। সংসার-সমরাঙ্গনে আমরা সকলেই কিঞ্চিৎ রসেবশে থাকতে চাই। রসের আধিক্য যেমন ভালো নয়, রসের স্বল্পতাও তেমনি ভালো নয়। কি নিয়ে বাঁচবো আমরা। আমরা নিউটন নই, আইনস্টাইন নই, রাসেল নই। আমাদের জীবনে গবেষণা নেই। আছে শোনা। সারা জীবন শুধু শুনেই যেতে হবে। এমন কোনও আবিষ্কার নেই যে জগৎবাসীর হাতে যাবার সময় তুলে দিয়ে বলে যেতে পারব সগর্বে, দিয়ে গেলুম আমার জীবনের সাধনার ধন মানবজাতির কল্যাণে বিজ্ঞানকে এক কদম এগিয়ে দিয়ে গেলুম। চিকিৎসা-বিদ্যায় জুড়ে গেলুম একটি অধ্যায়, কি চিন্তার জগতে ফেলে গেলুম একটি বীজ। আমরা আসি, সংখ্যায় বাড়ি, পেটের অসুখে ভুগি, দেনার দায়ে মরি, টাক পড়ে, ভুঁড়ি হয়, ঢেউ ঢেউ ঢেঁকুর ওঠে সন্ধের দিকে, চোখ-মুখ ফোলে, মুখের হাসি মিলিয়ে আসে। হৃৎপিণ্ডের চলন পালটায়। অবশেষে একদিন বলো হরিতে চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যায়।

তা হলেও আমাদের রসের কমতি নেই। শামলা-পরা আইনজীবী উচ্চ আদালত থেকে বেরিয়ে বাবুঘাটের সামনে এসে দেখলেন, তিনটি ইলিশ ডোঙ্গা মেরে শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়লেন। প্রশ্ন হল, কি গঙ্গার ! বিক্রেতা

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বললেন, পাশেই তো গঙ্গা বাবু, এই মাত্র টেনে তুলে আনলুম।

রূপনারায়ণের ইলিশ অ্যালুমিনিয়াম পেন্ট মেখে, মেকআপের গুণে গঙ্গার হয়ে বসে আছে। এক দাম। পঞ্চাশ টাকা কেজি। সেই গোপাল ভাঁড়ের কাল থেকেই ইলিশ দেখলেই বাঙালীর নোলায় জল আসে। ঠকার সম্ভাবনা থাকলেও কাগজ মোড়া ইলিশ, যৌবন হারানো লদ্‌লদে ফোলিও ব্যাগে ঢুকে পড়ল। ওপাশে মামলার ব্রিফ, এপাশে ইলিশ। চিমনলাল ভার্সাস মগনলাল, ইলিশ আর ইষ্টদেবীর পায়ের ফুল সব একসঙ্গে চলল মদন মিত্তির লেনের দিকে। মিছিল, বোমাবাজি, যানবাহনে চটকা-চটকি সবই ভুল হয়ে গেল। মনে ইলিশের রকমারি চলেছে। ভাজা, সরষে বাটা দিয়ে কাঁচা ঝাল, মুড়োটাকে পুঁইশাকে ফেলে ঘামতে ঘামতে, দুলতে দুলতে বাঙালী বাসায় চলেছে।

অষ্টমীর দুপুরে লুচি ছোলার ডাল। সঙ্গে বছরের প্রথম ফুলকপি। আমাদা দিয়ে পেঁপের চাটনি। যত বেলা বাড়ছে, বাবুর পেট ফুলছে সন্ধের দিকে জয়ঢাক। আটটার সময় চারজন চারদিকে ছুটল, ডাক্তার ধরতে। বড়দার লুচি খেয়ে এখন তখন অবস্থা। মানুষ চিনতে পারছে না। জীবন সংশয় হলেও অষ্টমীতে লুচি ছোলার ডাল যুগ যুগ জিও।

রবিবার বাঙালীর বিশিষ্ট বার। স্যাবাথ ডে। সেদিন ঘড়ি উল্টে রাখতে হয়। রবিবার মাংস চাই। দাম বাড়ছে, ওজনও কমছে। আলু দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ। বিশাল লাইনে ভ্যাবা-চ্যাকা বাঙালী। সামনে লাকলাইন দড়ির মত পাঁঠা ঝুলছে। তারস্বরে চিৎকার, আগলি রাং, পিছলি রাং, শিনা, গরদানা। হাড়ের ওপর কাতুড়ি পড়ছে। ইনিয়ে বিনিয়ে চর্বি ঝুলছে ভেতর থেকে বলির পাঁঠা ভ্যাভাককার ছাড়ছে। দুর্বল ক্রেতার করুণায় বুক কেঁপে উঠছে। মন কেমন করছে। হায় হায় করে উঠছেন। তবু লাইন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন না। রবিবার আর মাংস অবিচ্ছেদ্য। হয় তো প্রতিজ্ঞাও হল না,. নাঃ, আর মাংস নয়। বাঙালীর প্রতিজ্ঞা, ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। সিগারেট কি নস্যি ছাড়ার মত। নর্দমায় ডিবে বিসর্জন দিলেন। চোখে-মুখে কঠোর সংকল্প—ছেড়ে দিলুম হে নস্যি। তারপরই বন্ধুর ডিবে থেকে একটিপ। এতো হামেসাই দেখা যায়, সিগারেট ছাড়ার জন্যে নস্যি ধরলেন, নস্যি ছাড়ার জন্যে পান। অবশেষে তিনটিতেই স্থিতি।

বাঙালীর প্রতিজ্ঞা! স্ত্রীর সঙ্গে জীবনে আর বাক্যালাপ করবেন না। ভদ্রলোকের এক কথা। ঘণ্টাখানেকও গেল না। করুণ সুরে আর্তনাদ—হ্যাঁ গাঁ, আমার মানিব্যাগ কোথায় গেল?

এ দেশে নানারকমের সিজন আছে, আমের সিজন, আনারসের সিজন,

সেইরকম বোমবাজির সিজন। ছলে, বলে কৌশলে যে কোনও রকমের একটা ফেস্তাকল বের করতে পারলেই আমরা সুখী। পুজোর মাস তিনেক আগে থেকে বেরতে থাকবে মিছিল। বড় মিছিল, ছোট মিছিল। বিকেলে বাড়ি ফেরার বারোটা। সব অচল। কাতারে কাতারে মানুষ যানজটের রসেবশে, ঘেমে, দম আটকে, আধমরা হয়ে শুধু শুনতে থাকবে, চলছে, চলবে। অথচ কিছুই চলছে না, কিছু চলবেও না। দেশ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। এক যদি আকুপাংচারে কিছু হয়। মিছিলের সিজন আর খেলার সিজন একসঙ্গে যেন সাঁড়াশি আক্রমণ। এমন দেশটি কোথাও তুমি পাবে না কো খুঁজে। ওদিকে এসপ্লানেড ইস্টে লাঠি, গুলি আর কাঁদানে গ্যাস চলেছে, এদিকে গ্যালারিতে হাজার পনের লোক গাল-গলা ফুলিয়ে চেল্লাচ্ছে—গোওল, গোওল। খেলা শেষে যে পথে সাপোর্টাররা চলবেন সে যেন ঘূর্ণির পথ। ভেঙে, চুরে সব ভূমিসাৎ। কচাকচ ক্ষুর চলছে, ডাণ্ডা পড়ছে গাড়ির উইণ্ডশিল্ডে। কি হল ? না, খেলা হল। কি রকম খেলা ? যে খেলা কোনও দিনই আমাদের খেলোয়াড় করতে পারল না। সাপোর্টারই করে রেখে গেল।

বিসর্জনের সিজন, সেও এক মারাত্মক ব্যাপার। কোদলান, আবর্জনাময় কলকাতা। দরিদ্র গ্রাম। গ্রামের দারিদ্র আজ যে সীমায় পৌঁছেছে, শোষক ইংরেজও লজ্জা পেত। স্বদেশী শোষণ হল স্বামীর হাতে স্ত্রীর পিটুনি। ভালবাসার লোক মারতেও পারে, আদরও করতে পারে। সেই দেশের রাজপথে যুবসমাজের সে কি অসাধারণ পশ্চাৎ নৃত্য। হিন্দি গানের ফুলঝুরি—চাটনি ক্যায়সে বনি ! সুন্দরী ! চাটনি ক্যায়সে বনি শুনবে ? সংসারে হরেক মানুষের ঠোকাঠুকিতে সম্পর্কের ঝাল, নুন, টক চাটনি অনবরতই তৈরি হচ্ছে। শিল-নোড়াও মজুত আছে।

জগজ্জননী বেশ ভালই রসে-বশে রেখেছ মা। কেরোসিনের লাইনে রস, রেশানের সারিতে রস, দুধের বোতলে রস, সন্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রস, বিদ্যুৎ-নেবা জনপদের খুপরিতে খুপরিতে রসের বন্যা। ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ। মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ও ভাবছে ওর মাথা কামিয়ে ছেড়ে দি, ও ভাবছে এর মাথা। আর মা ! তাঁর অবস্থা অতি করুণ। গর্ভধারিণী আর দেশ-মাতা দুজনেই ভাগের মা। গঙ্গা পাবেন কি-না সন্দেহ।

দীর্ঘ বৎসরাধিক কাল ধরে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ এই অবাচীনের আক্ষরিক উৎপাত সহ্য করলেন। এবার বিদায় জানাবার পালা। শুভায় ভবতু। বিদায়। আবার কোনও দিন দেখা হলে প্রাণের কথা হবে বিরস মুখে। নমস্কার।